প্রবীর ঘোষ

যৌবনের বজ্রনির্ঘোষ

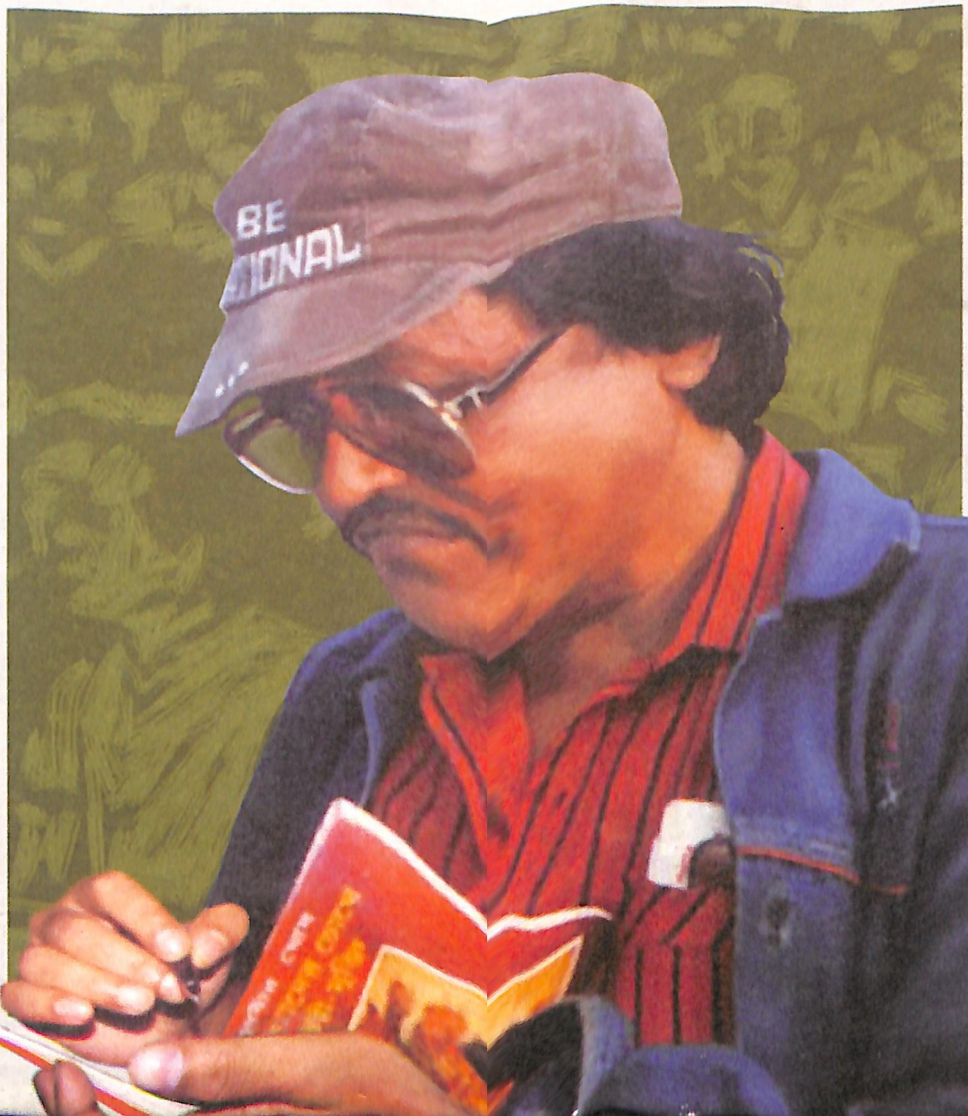

যৌবনে রাজনীতির সংস্পর্শে আসা। আত্মপরিচয় গোপন করে কত বিভিন্ন শ্রেণির বন্ধুদের সঙ্গে মিশেছি। নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে নকশালদের তাত্ত্বিক ক্লাস নিয়েছি। নকশাল আন্দোলনে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোনো ভূমিকা না থাকায় সরে এসেছি। নিজেই যুক্তিবাদী সমিতি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে স্বয়ম্ভর গ্রাম তৈরিতে হাত দিয়েছি। বর্তমানে ভারতের ৬০০টি জেলার মধ্যে প্রায় ২৫০টা জেলায় এই স্বয়ম্ভর গ্রাম গড়ে উঠেছে। তাঁদেরকে কেউ কেউ বলে মাওবাদী। নামে কিবা এসে যায়।

ISBN : 978-81-295-2324-2

যৌবনের বজ্রনির্ঘোষ

যৌবনের বজ্রনির্ঘোষ

প্রবীর ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

JAUBANER BAJRANIRGHOSH
by PRABIR GHOSH
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
email : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 250.00

ISBN 978-81-295-2324-2

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৫, মাঘ ১৪২১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : রঞ্জন দত্ত

২৫০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

কানু সান্যাল, শৈবাল মিত্র ও অরিজিৎ মিত্র

তিন সাম্যবাদী বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস
বারেবারে ঘুরে ফিরে তুমি
আমার ছেলেবেলা
যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা
গোলটেবিলে সাফ জবাব
সম্মোহনের A to Z
কাশ্মীরে আজাদির লড়াই একটি ঐতিহাসিক দলিল
রাজনীতির ম্যানেজমেন্ট এবং আরও কিছু
গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি
মেমারিম্যান থেকে মোবাইল বাবা
মনের নিয়ন্ত্রণ-যোগ-মেডিটেশন
জ্যোতিষীর কফিনে শেষ পেরেক
যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা (১ম, ২য়)
আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না
অলৌকিক নয়, লৌকিক (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম)
সংস্কৃতি ঃ সংঘর্ষ ও নির্মাণ
যুক্তিবাদের চোখে নারী-মুক্তি
ধর্ম-সেবা-সম্মোহন
প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...
স্বাধীনতার পরে ভারতের জ্বলন্ত সমস্যা
প্রবাদ-সংস্কার-কুসংস্কার
পিংকি ও অলৌকিক বাবা
অলৌকিক রহস্যজালে পিংকি
অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি
অলৌকিক দৃষ্টি রহস্য
বিশ্ব ক্যুইজ
The Mystery of Mother Teresa and Sainthood.
প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রা
সেরা যুক্তিবাদী সংকলন
প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা সম্পাদিত
দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম
সুমিত্রা পদ্মনাভন সম্পাদিত
প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ

© PRABIR GHOSH, DEBI COMPLEX, FLAT No.-104, BLOCK-C, KOLKATA-74, INDIA.
All rights reserved throughout the World. Reproduction in any manner in whole or part, in Bengali or other languages, probihibited.

e-mail : prabir_rationalist@hotmail.com
websites : www.srai.org & www. humanistassociation.org

কিছু কথা

স্কুল ফাইনাল দেওয়ার পর চলে আসি দমদমে। এখান থেকেই কলেজ জীবন শুরু। যৌবনকালের সূচনা। এখানেই অনেক পথ পরিক্রমার পরে বার্ধক্যে পা দিলাম।

যৌবনের অনেক উত্থানপতন, বহু অভিজ্ঞতা বয়ে নিয়ে গেছি। রাজনীতির সংস্পর্শে এসেছি। আত্মপরিচয় গোপন করে বিভিন্ন শ্রেণির বন্ধুদের সঙ্গে মিশেছি। অফিসজীবনে খারাপ-ভাল অনেক কিছু দেখেছি। নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। আবার, নকশাল আন্দোলনের নেতৃত্ব সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে গুরুত্ব দেয়নি—এটাও দেখেছি। বুঝেছি, 'বিপ্লবের আগে বিপ্লবের সময় বিপ্লবের পরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই।' তাই ওদের বিরোধিতা না করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছি। বিরোধিতা করিনি কারণ, ব্যক্তিহত্যার শিকার হতে চাইনি।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ার চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছি। ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি স্বয়ম্ভর গ্রাম-সমবায় ব্যবস্থার চিন্তাকে।

এখানে যৌবনের বহু ঘটনাই টুকরো টুকরো কোলাজ হয়ে উঠে এসেছে। না, কোনওটাই কল্পনা নয়। এসবই বিশুদ্ধ সত্য। স্মৃতি কোথাও ভুল করে থাকলে, আমাকে জানালে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

অনেকেই আমার যৌবন কাহিনি জানতে চেয়েছেন। তাই বার্ধক্যে এসে কলম ধরলাম।

১ জানুয়ারি, ২০১৫

প্রবীর ঘোষ
দেবী কমপ্লেক্স
ব্লক 'সি', ফ্ল্যাট : '১০৪', দমদম
কলকাতা ৭০০০৭৪
Email: prabir_rationalist@hotmail.com
Website: www.srai.org

বিষয় সূচি

কিছু কথা ৭

অধ্যায় : এক

যৌবনে পা ১৩

এলাম কলকাতায় ১৪

অধ্যায় : দুই

আমার প্রথম কলেজ ১৭

কলোনির জলছবি ১৯

অধ্যায় : তিন

শীতের আগমন ২২

অধ্যায় : চার

কলোনির বাজারহাট ২৯

অধ্যায় : পাঁচ

প্রেম অত সোজা নয় ৩২

অধ্যায় : ছয়

পাড়ার উন্নয়নের ছবি ৩৮

অধ্যায় : সাত

পাড়ার চিকিৎসকরা ৪৫

অধ্যায় : আট

আমাদের এনজয়মেন্ট ৪৮

বিয়ে ৫২

ঘরের কথা ৫৪

অধ্যায় : নয়

মায়ের মৃত্যু ৫৭

বাবার মৃত্যু ৫৮

আবার দেশ হারালাম, এলাম দেবীনিবাস ৫৮

অধ্যায় : দশ
গড়ের মাঠে খেলা ৬১
অধ্যায় : এগারো
নতুন কলেজ জীবন ৬৫
সাধুদের সন্ধানে
ঘাটের কথা
অধ্যায় : বারো
চাকরি জীবন ও রাজনীতি ৭৯
রবির বিয়ে
অধ্যায় : তেরো
আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংগঠনের রূপরেখা ৮৯
অধ্যায় : চোদ্দো
আমার সহযোদ্ধারা ৯৭
আমার বান্ধবীরা ১১৫
একটি আত্মার অভিশাপ ও ক্যারাটে মাস্টার ১১৬
ক্যারাটে Vs. বক্সিং ১২৭
অধ্যায় : পনেরো
একাধিক চ্যালেঞ্জ ১২৮
মেঠাই বাবার রহস্যভেদ
বিষাক্ত চ্যালেঞ্জ
অধ্যায় : ষোলো
বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ১৯৬৭ পর্যন্ত ১৩৫
চারু মজুমদারের আটটি দলিল ১৩৮
প্রথম দলিল
দ্বিতীয় দলিল
তৃতীয় দলিল
চতুর্থ দলিল
পঞ্চম দলিল
ষষ্ঠ দলিল
সপ্তম দলিল
অষ্টম দলিল
গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োগ-পদ্ধতি ১৪৭
গেরিলাবাহিনী গড়ে তোলা
গেরিলার আবশ্যিক গুণ

অধ্যায় : সতেরো
যৌবনের নকশাল আন্দোলন ১৫৭
আমার দেখা নকশাল আন্দোলন ১৫৮
নকশালবাড়ির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৬৪

অধ্যায় : আঠারো
কফিহাউজের আড্ডা ১৬৭

অধ্যায় : উনিশ
আমার বইমেলা ১৭১

অধ্যায় : কুড়ি
পূর্ব-পাকিস্তানে নকশাল আন্দোলন ১৭৫
নকশালনীতির ভ্রান্তি ১৭৭
এই নিধন যজ্ঞের অন্যতম তান্ত্রিক জ্যোতি বসুর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করছি ১৭৮

অধ্যায় : একুশ
আমার জীবনের সাত-এর দশক ১৮১
চারু মজুমদার ও দল বিভাজন ১৮৩

অধ্যায় : বাইশ
লেখার জগৎ-যা ফুরোয় না ১৮৮
যুগান্তরের আড্ডা
যষ্ঠীমধুর আড্ডা
আনন্দবাজারের আড্ডা
আজকালের কথা
পরিবর্তনের আড্ডা
দে'জ পাবলিশিং
মিডিয়া-নাটক-চলচ্ছবি ২০৫

অধ্যায় : তেইশ
সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০৮

অধ্যায় : চব্বিশ

বাংলাদেশের জাতীয় উৎসব দেখতে যাওয়া ২১২

বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ
তিনদিনের কর্মশালা
মুক্ত আলোচনা
মহাজাতকের ভান্ডাফোড়
'স্যার'-এর আড্ডায়
'লক্ষ্মী-সরস্বতী'র বিবাদ নেই
বই 'শিক্ষিত'দের নিত্যসঙ্গী

অধ্যায় : পঁচিশ

স্মরণীয় স্টাডি ক্লাস ২২৯

অধ্যায় : ছাব্বিশ

আমার দেখা অসাধারণ কিছু আইনজীবী ২৩৬

অধ্যায় : সাতাশ

প্রতিরোধ চাই-ই ২৩৮
গেরিলা পদ্ধতিতেই বন্দিমুক্তি ২৪০
জয় সুনিশ্চিত করতে শক্তিশালী 'নেপথ্য বাহিনী' জরুরি ২৪১

অধ্যায় আঠাশ

একটু ফিরে দেখি ২৪২
সাম্যপন্থীদের ভাঙা-গড়া ২৪৪

অধ্যায় : উনত্রিশ

অসমে ২৪৭
ত্রিপুরায় ২৫০
মণিপুরে ২৫১

অধ্যায় : ত্রিশ

'প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ' বই থেকে আমার কয়েকজন সহযোদ্ধার কিছু কথা তুলে দিচ্ছি ২৫৪

মানসীর কথায়
রানা হাজরার কথায়
অজয় বৈরাগীর কথায়
পিনাকী ঘোষের কথায়
অঞ্জন চক্রবর্তীর কথায়
বিপত্তারণ পরামানিকের কথায়

অধ্যায় : এক

যৌবনে পা

আমার শৈশব কেটেছিল পুরুলিয়া জেলার আদ্রাতে। সেখানে লেখাপড়ার কোনও প্রচলন ছিল না। মেয়েদের স্কুলে পড়ানো হত ক্লাস সেভেন পর্যন্ত। ছেলেদের স্কুল থেকে 'স্কুল ফাইনাল' দেওয়া যেত।

এ হল গত শতকের পাঁচ-এর দশকের ছবি। ২০১৪-তে এসেও আদ্রার সাংস্কৃতিক মান একটুও বাড়েনি। ছেলে বা মেয়েদের পড়ার কোনও সুযোগই নেই। কারণ, কলেজই নেই।

এখন সাধারণের এন্টারটেইনমেন্ট বলতে মুরগি লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, মোষের লড়াই, জুয়া, নাচনির নাচ, হাঁড়িয়া, তাড়ি ইত্যাদি।

সাধারণ মানুষের জীবিকা বলতে, স্টেশনের পাশে, রাস্তার ফুটপাত দখল করে টিন দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট দোকান। চাষের জমি অফুরন্ত নয়। তবে কিছু জমিতে চাষ হয়। আদ্রার বহু মানুষ রেলে কাজ করেন। কিন্তু ওয়াগন ব্রেকার পেশার মানুষও আছে। হিজড়ে সম্প্রদায়ের আধিপত্য আছে। ওদের জীবিকা বলতে দোকানদারদের থেকে তোলাবাজি। হিজড়েদের দুটো দল আছে। ওদের মধ্যে খুন-খারাপিও লেগে থাকে। হিজড়ে মানে অবশ্য প্রায় সবই মেয়েলি পুরুষ।

এখনও শহর থেকে আদ্রায় এলে একটাও হোটেল পাওয়া যায় না থাকার জন্য। কারণ, হোটেল নেই।

ওখানে হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের একটি শাখা নানারকম অনুষ্ঠান করে। একটি উদাহরণ, বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালনে 'বিদ্যাসাগর' নিয়ে আলোচনা গুরুত্ব পায় না। লোক আসে ম্যাজিক, গান ইত্যাদি দেখতে ও শুনতে।

আদ্রায় এখন নাচ-গানের সংস্কৃতি হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন অন্তত তৈরি করে চলেছে। ওদের নেতা সত্যজিৎ চ্যাটার্জি। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, মেদহীন, স্বাস্থ্যবান বছর পঁয়তাল্লিশের সিংহপুরুষ তরুণ। খুব ভাল অর্গানাইজার। খুব ভালোভাবে সংগঠনকে পরিচালনা করতে পারেন।

আদ্রা থেকে একটিও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় না, যাতে সাহিত্য রস পাওয়া যায়। এখনও তাই-ই আছে।

আমি আদ্রাতে বড় হলে, এরকমই যে কোনও একটি পেশায় আমাকে ঢুকে

যেতে হত। কোনও দিনই লেখক হওয়ার সুযোগ পেতাম না।

এরপর '৫৫ তে চলে আসি খড়্গপুরে। রেলশহর। রেলওয়ে কর্মচারীর সংখ্যা হাজার হাজার। নাটক করার কয়েকটি ক্লাব ছিল। কেউ কেউ নিজের চেষ্টায় মাঝারি মাপের গায়কও হয়েছিলেন।

খড়্গপুর থেকে কলকাতায় না এলে আমিও আমার লেখাকে একটুও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম না।

ব্যতিক্রমী কয়েকজন লেখক মফস্‌সল থেকে উঠে এসেছেন, সেটা ব্যতিক্রম ছাড়া কিছু নয়। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হল রমাপদ চৌধুরী।

যেখানে যে সংস্কৃতি চালু আছে, সেখানের সেই সংস্কৃতির প্রভাব মানুষের ওপর পড়বেই।

আগে আমি গল্প লিখতাম। কিন্তু, আমার রাজনৈতিক সচেতনতা গল্প লেখার থেকে সমাজ সচেতন প্রবন্ধ লেখার দিকে টেনে নিয়ে এল। রাজনীতির বীজটা পুঁতেছিলেন স্কুলের শিক্ষক শুভেন্দুকুমার রায়। সেই বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হল ১৯৬০ সালে কলকাতায় এসে।

এলাম কলকাতায়

বাবা অবসর নিলেন। আমারও স্কুলের পাঠ শেষ হল। আমরা এলাম কলকাতার এক রিফিউজি কলোনিতে।

এসেই মন খারাপ। কলোনির ধু ধু প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা বাড়ি। এখানেই শেষ জীবনটা কাটাতে হবে।

জায়গাটার নাম কৃষ্ণপুর কো-অপারেটিভ রিফিউজি কলোনি, যার বর্তমান নাম দমদম পার্ক।

এখানে বাবা একতলা বাড়ি বানালেন। গাছগাছালি পুঁতলেন। দুটো নারকেল গাছ। দুটো হিমসাগর আমের গাছ। একটা কাঁঠাল গাছ। পেয়ারা, করমচা ইত্যাদি গাছে ভরে গেল বাগান।

আড়াইখানা বেডরুম। খুদে ডাইনিংরুম একটা। একটা ছোট্ট রান্নাঘর। দুটো পায়খানা, একটা বাথরুম। সামনে একটা খোলা বারান্দা। এখানেই সাতজনের বসবাস শুরু হল।

এই বাড়িটা তৈরি করার আগে ভাড়া থাকতাম এ'পাড়াতেই। বাগজোলা খালের দিকে কলোনির শেষ প্রান্তে ধীরেন ব্যানার্জির বাড়িতে। ব্যানার্জিকাকু লম্বা, গায়ের রং টকটকে ফর্সা। তিনি একটা গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভাল অভিনয় করতেন। রেলে চাকরি করতেন। তাঁর ছোটভাই ময়নাকাকুর কাছেই আমি সাঁতার শিখলাম।

আমাদের বাড়ি তৈরি হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকলাম।

অঞ্চলটি ফাঁকা ফাঁকা। ঘর-বাড়ি হচ্ছে। অনেকে আসছে। বর্ষায় জলভাসি রাস্তা। মাছ, কাঁকড়া মিলত সেই জলে। প্রচুর কই, ভ্যাদা মাছ পাওয়া যেত। আমরা পাড়ার ছেলেরা সেগুলো ধরতাম।

দক্ষিণে বাগজোলা খাল, পূর্বে একটি সরুখাল, উত্তরে শ্যামনগর রোড এবং পশ্চিমে যশোর রোড দিয়ে অঞ্চলটি ঘেরা। বাগজোলা খালের দক্ষিণে বাঙ্গুর কলোনি। তারও দক্ষিণে লেডি বোস্টন কলোনি বা লেকটাউন।

বাঙ্গুর কলোনি আর লেডি বোস্টন কলোনির মাঝখানে যশোর রোড ঘেঁষে একটি ছোট্ট পাড়া। নাম বরাট কলোনি। কয়েকটা বাড়ি দিয়েই পাড়া শেষ।

পুবদিকের সরু খালটা পেরোলে দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমি, সল্টলেক। সেখানে নৌকো করে মাছ ধরা হয়। ওই জলাভূমিগুলো ভরাট করা চলছে গঙ্গার পলি দিয়ে। পলি আসছে বিশাল বিশাল পাইপের মধ্য দিয়ে জলের সঙ্গে। উপনগর গড়া হবে। কাজে হাত দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়।

আর, উত্তরে শ্যামনগর অঞ্চল। শ্যামনগর রোড দিয়ে যশোর রোডে যাওয়া যায়। অঞ্চলটি মস্তান অধ্যুষিত। প্রচুর কাপড়ের কল আছে।

যশোর রোডটা বাংলাদেশের যশোর থেকে উত্তরের নাগেরবাজার দিয়ে দক্ষিণ দিকে এসে আর জি কর—এই শেষ। রাস্তাটা আর জি কর রোড নাম নিয়ে খাল পেরিয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে শ্যামবাজার চলে গেছে। এই রাস্তায় বাস চলে। আমাদের বাসস্ট্যান্ডটা ছিল বাগজোলা খালের কাছেই।

এ'পাড়ায় প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত। তার মধ্যে একটু অবস্থাপন্ন শচীন রায়। বড় দোতলা বাড়ি। অবশ্য তিনতলা বাড়ি একটাও নেই। শচীনবাবুর বাড়িতে আছে একটা ফ্রিজ। সেটাকে বলা হত রেফ্রিজারেটর। সেটা যখন চলে তখন সারা তল্লাটে জানান দেয় ঘট্‌ঘট্‌ আওয়াজে।

আরেকজন পাড়ার এক ডাকাবুকো কন্ট্রাক্টর সুশীল মুখার্জি। তাঁর বাড়ির উল্টোদিকে উঁচু টিনের দেওয়াল তোলা একটা বড় বাগান।

এটা বাঙাল পাড়া। তাই, আমার দাদুকে পাড়ার অনেকেই চেনেন। প্রবীণরা প্রায়ই সকলেই চেনেন।

ছিমছাম পরিবেশ, গ্রাম্য, শান্ত। এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে শুরু হল আমাদের বসবাস। শুরু হল আমার যৌবনের পথ চলা।

অধ্যায় : দুই

আমার প্রথম কলেজ

বাবার সঙ্গে রেজাল্ট হাতে মতিঝিল কলেজে গেলাম ভর্তি হতে। ভর্তি হবার জন্য ফর্ম ফিল-আপ করে টাকা জমা দেবো, হেডক্লার্ক টাকা জমা না নিয়ে আমার রেজাল্ট হাতে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। তারপর ফিরে এসে তিনি বাবাকে বললেন, আপনি ছেলেকে নিয়ে প্রিন্সিপালের ঘরে যান। প্রিন্সিপাল ডেকেছেন।

তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন ডি পি আচার্য। তিনি বাবাকে বসতে বললেন। বাবা বসলেন, আমি দাঁড়িয়ে। এরপর বললেন, এই রেজাল্ট নিয়ে তো ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে পারেন, এখানে কেন ভর্তি করতে চাইছেন? (তখন জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হতে হত না। রেজাল্ট দেখেই ভর্তি নিয়ে নিত।)

বাবা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। আমি তাঁর উৎসাহে জল ঢেলে দিলাম। বললাম, বাবা রিটায়ার করেছেন। আমরা চার বোন এক ভাই। এখন ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবার সামর্থ্য বাবার নেই। আমি এখানেই পড়ব।

প্রিন্সিপাল বললেন, তুমি বাড়ি যাও। ভাবো। সাতদিন পরে এলেও তোমাকে ভর্তি নিয়ে নেব। বরঞ্চ ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে তোমার কেরিয়ার তৈরি হয়ে যাবে। তার সঙ্গে স্কলারশিপ তো পাবেই।

দমদম মতিঝিল কলেজেই ভর্তি হলাম। দোতলা কলেজ। বড় গেট দিয়ে কলেজ কম্পাউন্ডে ঢুকলেই বাঁদিকে একটা বড় মাঠ। ডানদিকে 'এল' প্যাটার্নের দোতলা বড় বিল্ডিং। বিল্ডিং-এর রং হলুদ। এখনও হলুদ রং-ই আছে।

সারি সারি বড় বড় ঘর। একতলায় মাঠের পাশে ইউনিয়ন রুম। দোতলায় প্রিন্সিপালের ঘরের পাশে প্রফেসরদের কমনরুম। ল্যাবরেটরিটা একতলায়। একটা ক্যান্টিন ছিল। সেখানে রুটি, ঘুগনি, ওমলেট, চা, বিস্কুট ইত্যাদি পাওয়া যেত।

এই বাড়িতেই সকালে মতিঝিল গার্লস কলেজ হত।

আমরাই 'প্রি-ইউনিভার্সিটি'র ফার্স্ট ব্যাচ। আমাদের ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা প্রায় শ'খানেক হবে।

তখন আমার ক্লাসে লেখাপড়ায় ভাল দুটি ছেলে ছিল। একজন শিবু মুখার্জি, আরেকজন ভূপাল ভৌমিক। এরা দু'জনেই আমার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। কলেজে আমার আর দুই নিকট বন্ধু ছিল সমীর ঘটক ও নিশীথ গুহ। ওরা পড়াশুনায় সাধারণমানের। কিন্তু বন্ধু হতে তো আর মানের দরকার হয় না। নিশীথ গুহর বাবা তখন কেন্দ্রের মন্ত্রী। ওর ঠাকুরদার নামেই দমদমের আর এন গুহ রোড। ওরা বনেদি পরিবার। কিন্তু সেসব নিয়ে কখনওই হামবড়াই ভাব করত না।

শিবু আসত ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। আমাদের ক্লাসে ও-ই একমাত্র ছাত্র, যে ধুতি-পাঞ্জাবি পরত। তখন ধুতি-পাঞ্জাবির চল ছিল খুব কম। শিবু খুব চটপটে ছেলে। আর, ভূপাল আদর্শে কট্টর; খুব স্বাস্থ্যবান।

একজন সহপাঠী হাফপ্যান্ট পরে আসত। তার নাম অমিত সেন। ওর পিছনে কেউ কেউ লাগত। তারা বলত, 'আমাদের দাদু বলে ডাকবি'। অমিতের কোনও বৈশিষ্ট্য না থাকলেও ওর হাফপ্যান্টের জন্যই ও বিখ্যাত হয়ে গেল।

আর এক সহপাঠী উৎপল মিত্র ওরফে চিনু মিত্র। শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোট ছেলে। ও গরমকালেও শার্টের তলায় সোয়েটার পরে আসত, যাতে একটু মোটা দেখায়।

আমার এক সহপাঠী শ্যামল চক্রবর্তী। ও পরে মন্ত্রী হয়। শ্যামল খুব ভাল বক্তৃতা দিত। ওর এক ক্লাস ওপরে পড়তেন সুভাষ চক্রবর্তী। তিনিও মন্ত্রী হন পরে। ওরা দু'জনেই সিপিআই ও পরে সিপিএম করতেন। তখন দু'জনেই সিপিআই-এর ছাত্র সংগঠন করতেন আমাদের কলেজে।

আর একজন ছিলেন মিহির সেনগুপ্ত। আরএসপি করতেন এবং সুবক্তা।

শ্যামল চক্রবর্তী টিপিক্যাল কমিউনিস্ট পোশাক পরে আসত। পাজামা-পাঞ্জাবি ও কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। চোখে-মুখে তীক্ষ্ণতা। দাপুটে বক্তা।

সুভাষ চক্রবর্তী ও মিহির সেনগুপ্ত দু'জনেই একই ক্লাসে পড়তেন। চেহারায় রোগা। সুভাষদাও ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন। শ্যামল ও সুভাষদা দু'জনেই দুটো উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকতেন। ওঁরা স্বপ্ন দেখতেন ও দেখাতেন কংগ্রেসকে তাড়ালেই বিপ্লবটা সম্পূর্ণ হবে। গরিবরা ধনী হবে।

কিন্তু গরিবরা ধনী হোক-বা-না-হোক; শ্যামল ও সুভাষদা ধনী হয়েছিলেন মন্ত্রী হয়ে।

কলেজে যাই। ক্লাস হয়। আড্ডাও হয়।

একদিন খবর শুনলাম, ইউরি গ্যাগারিন মহাকাশে গেছেন। চাঁদেও নাকি মানুষ পাঠানো হবে। আগেই চাঁদে রাশিয়ান মহাকাশযান লুনা২ পাঠানো হয়েছে। এই নিয়ে চারিদিকে হইহই। তেমনই হইহই কাণ্ড ঘটল ক্লাস-এ।

আমাদের ক্লাসে একজন প্রফেসর ছিলেন পি আর ডিজি। বেশ মোটাসোটা

ঝলসানো জাঁদরেল চেহারার প্রফেসর। পড়ানোর থেকে অন্য বিষয়ে তাঁর নজর বেশি। মহাকাশ ও চন্দ্রাভিযানের খবরে হাতে চাঁদ পেলেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না যে, মহাকাশে মানুষ গেছে, চাঁদে মহাকাশযান গেছে এবং মানুষও যাবে। বলতেন, এটা অবাস্তব। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। মহাকাশে কেউ যেতেই পারে না। চাঁদেও কিছু যেতে পারে না। এসব মিথ্যা খবর। আর এটা নিয়েই একতরফা বকবক চলত। এটা নিয়েই ক্লাস শেষ। পড়াশোনা লাটে উঠল। প্রায়ই হত এরকম ঘটনা। আমরা ওনার কাণ্ড দেখে পরে হাসতাম।

তখন আমাদের কলেজে পড়াশুনা হত। রাজনৈতিক ছাত্র ইউনিয়নগুলো পড়াশুনা ডকে তোলেনি। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে সর্বশক্তিমান করতে একটা দারুণ পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। উদ্বাস্তু কলোনি থেকে বিভিন্ন ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি করে দিলেন। সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, অনিল বিশ্বাস, দীনেশ মজুমদার, বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য—এদের দিয়ে বিভিন্ন কলেজের ইউনিয়ন দখলের জন্য এদেরকে কলেজে ভর্তি করালেন।

সে বছরই কলেজের ইউনিয়ন দখলের লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিপিএম এবং আরএসপি। আমাদের ক্লাসের ক্যান্ডিডেট হল তরুণ কমিউনিস্ট শ্যামল চক্রবর্তী। আর আরএসপি-র ছাত্র সংগঠনের থেকে আমাকে অনুরোধ করা হল ক্যান্ডিডেট হওয়ার জন্য।

চার বোন, মা-বাবা ও আমি এই সাতজনের সংসার চলে বাবার পেনশনের টাকায়। সুতরাং ওদের অনুরোধ কোনওভাবেই রক্ষা করতে পারলাম না। ক্যান্ডিডেট দাঁড় করালাম সমীর ঘটককে। জবরদস্ত লড়াই হয়েছিল। শ্যামল এক ভোটে জিতেছিল।

এই কলেজেই 'প্রি-ইউনিভার্সিটি' শেষ করলাম।

কলোনির জলছবি

তখন থাকি কেষ্টপুর কলোনিতে। জোর বৃষ্টি হলেই মাঠঘাট ডুবে যায়। রাস্তায় গোড়ালি জল। পথে-ঘাটে খলবল করে কৈ, ল্যাটা, ভ্যাদা, খলসে মাছের ঝাঁক, লাল ছোট কাঁকড়া। সেইগুলো ধরার ধুম পড়ে। হইহই আনন্দ। মুঠো মুঠো হাতে ধরেই পকেটে বা ব্যাগে চালান করে বাড়ি ফিরি। তাই দিয়ে দিব্বি একবেলা মাছ খাওয়া যায়।

আর দেখা মেলে প্রচুর সাপের। তবে সেসব বেশিরভাগই ঢোঁড়া সাপ। পাখি দেখা যায় প্রচুর। নানান রকম পাখি আসে দিনভর। পেয়ারা, পেঁপে, আম গাছে পাকা ফল খায়। কলকাকলিতে মেতে থাকে চারিপাশ।

সবে নিচুজমি ভরাট করে নতুন পাড়া হল। নতুন গাছগাছালিও হচ্ছে। বড় গাছের খুব অভাব। অনেকের বাড়িতেই নারকেল গাছ রয়েছে। প্রত্যেক বাড়ির সামনেই দেওয়াল ঘেরা বাগান। দেওয়ালে উঠেই ডাব, নারকেল পাড়া যায়। বাগানে ফুলের গাছ; টগর, জবা, গাঁদা ইত্যাদি ফুল। সেই ফুলেই গৃহদেবতার পুজো করে সবাই। অনেকের বাগানে লাউ, কুমড়ো, উচ্ছে ইত্যাদি ফলে।

পুবদিকে একটু এগোলেই প্রকাণ্ড আকাশ। দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমি, যেন আকাশ চুম্বন করছে সীমানায়। যার নাম সল্টলেক। ছোট ছোট নৌকা ভেসে বেড়ায় সে জলায়। আকাশে খেলা করে মেঘ। এসব দেখি ঘুরে ঘুরে।

গ্রীষ্মের নির্জন দুপুরে তপ্ত রোদ। আকাশটা খাঁ খাঁ করে। দু একটা চিল উড়ছে। চিঁই— করে ডাকছে। শুনশান রাস্তাঘাট। দু'একজন ফেরিওয়ালা হাঁক পাড়ছে—বাসন নেবে নাকি গো...। সঙ্গে হাতের কাঠিতে চাপ কাঁসরের 'টং ঠঠক্, টং ঠঠক্...' আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় চিলের ডাকের সঙ্গে। নীরবতা যেন অর্থবহ হয়ে ওঠে বুকের গভীরে।

ভিআইপি রোড তখনও তৈরি হয়নি। যশোর রোড দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। হেঁটে দশ মিনিটের পথ। যাওয়া যায় শ্যামবাজার থেকে বসিরহাট, বনগাঁ যেকোনও জায়গাতে। মফস্সলের বাস কলকাতায় ঢোকে না। আর জি কর-এর পাশে এসেই ওদের যাত্রাবিরতি। যশোর রোড দিয়ে বাসগুলো শ্যামবাজার খালপাড়ে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকে কলকাতার ভিতরে যেতে হয় স্টেটবাসে, ডবল ডেকারে, ট্রামে, টানা রিক্শায় বা হেঁটে। ট্রাম ডিপো বেলগাছিয়ায়। কেউ কেউ বেলগাছিয়াতেও নেমে যেত।

নাগেরবাজার যেতেও বাস। রিকশা নেই। ওটা বিরল প্রজাতির যান। সাইকেলেরই চল বেশি। না থাকলে, হাঁটা। হেঁটেই কত জায়গায় ঘুরলাম এই সময়ে।

আমাদের পাড়ায় গাড়ির মালিক সাকুল্যে জনা আটেক। কনট্রাক্টর সুশীল মুখার্জি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট রায়চৌধুরি, শচীন রায়, কনট্রাক্টর গণেশ দাস, ডাঃ হিমাংশু চক্রবর্তী, ডাঃ নীলকৃষ্ণ চৌধুরি, জাজ কৃষ্ণ মিত্র ও ডাঃ দীপক চন্দ্র এই আটজনের গাড়ি ছিল। পরে অনেকেরই গাড়ি হয়।

ইট, ঝামা ফেলে রোলার চালিয়ে সমান করা হয় রাস্তা। কাঁচা রাস্তা নেই। চওড়া চওড়া রাস্তা। বাড়ির একপ্রান্ত থেকে উল্টোদিকের বাড়ির প্রান্তটি ষাটফুট। এটাই রাস্তা। পাশে কাঁচা নর্দমা। তবে পরিষ্কার। এই নর্দমার জলে নানারকম কুচো মাছ পাওয়া যায়।

যশোর রোডের কাছাকাছি তিন নম্বর ট্যাঙ্ক। সেখানে বিশাল বাগান দিয়ে

ঘেরা 'পালবাড়ি'। এই বাড়ির একটা ছেলে সমর পাল ছিল আমার বন্ধু। লেখাপড়ায় ভাল। সুঠাম, দীর্ঘ চেহারা। গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার। পরে টেলিফোন ভবনে অফিসার পদে চাকরি পেল।

পাঁচ নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে থাকতেন ডাঃ পবিত্র রায়। স্বাধীনতা সংগ্রামী। নেতাজির আজাদহিন্দ বাহিনীর সিক্রেট সার্ভিসের প্রধান ছিলেন। উনি জেলে থাকাকালীন কয়েকটা ডায়েরি লিখেছিলেন।

একদিন তিনি ডায়েরিগুলো আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, দেখো না যদি এডিট করে একটা বই ছাপানো যায়। আমি ছাপাবার ব্যবস্থা করে দেই। 'নেতাজি সিক্রেট সার্ভিস' নামে তা প্রকাশিত হয়। বইটাতে প্রচুর তথ্য আছে।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই তিনি দমদমের এমএলএ হন।

চার নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে থাকতেন ভানুদা। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারার মানুষ। খুব রসিক লোক। কাজ করতেন স্টেট ব্যাঙ্কের নেতাজি সুভাষ রোড প্রান্তে। বাস টার্মিনালে হাজির হতেন বাস ছাড়ার আধঘন্টা আগে। ওখানে শানবাঁধানো গাছতলায় বসে আড্ডা দিতেন।

অধ্যায় : তিন

শীতের আগমন

হেমন্ত আসে কুয়াশা নিয়ে। যায় শীতের সঙ্গে মিশে।

শীতে পাওয়া যায় গুড়। খেজুর রসওয়ালারা হাঁড়িতে করে আনে। নানা আকৃতির হাঁড়িতে করে আসে খেজুরের রস, খেজুর গুড়, নলেন গুড়, ঝোলা গুড়, নলেন গুড়ের রসগোল্লা ইত্যাদি। ফেরিওয়ালারা হাঁক পাড়ে 'গুড় চাই, গুড়...'।

জয়নগরের মোয়াও আসত। সেটা আমি একদমই খেতে ভালবাসতাম না। তবে ঝোলাগুড় রুটিতে মাখিয়ে রোল করে খেতে দারুণ লাগত। পিঠের সঙ্গে গুড়ও জমত।

শীত মানেই পিঠেপুলি উৎসব। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকত শীত। তবে মার্চে দোল হলে তখনও অল্প অল্প ঠান্ডা থাকত। শীতের কুয়াশা ঢাকা আবছায়া সকাল, ঠান্ডা হাওয়া, পিঠেপুলি, খেজুর গুড়ের গন্ধ...ওয়াহ। দারুণ জমত। গন্ধে 'ম ম' করত পাড়া।

চাল গুঁড়ো করে আনতাম গম ভাঙানোর দোকান থেকে। একটু গরম জলে ময়দা ও চালের গুঁড়ো মিশিয়ে মন্ড করা হত। সেখান থেকে চিমটি কেটে একটু একটু করে নিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালুতে ঘষা হত। তৈরি হত চালের মতো ছোট ছোট দানা। দুধ দিয়ে জাল দিলে হত 'সরুচাকুলি পায়েস', 'চষি পিঠে'। ঘন পায়েসে পুলি ছেড়ে হত 'পুলি পিঠে'।

পুলি হত কোরানো নারকেল, গুড়, ক্ষীর মিলিয়ে। 'ছোট পটলে'র আকারে তৈরি হয় পুলি পিঠে। ঘন দুধে চষি ছেড়ে জাল দিয়েও পুলি তৈরি হয়।

গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে পায়েসও হতো। ঘন পায়েস। চেটেপুটে খেতাম। আহা! কী স্বাদ!

আমাদের বাড়িতে পিঠে তৈরি করতেন মা। পিঠে পরবে মাসি-পিসিরা এলে তাঁরাও অংশ নিতেন। দিদি-বোনেরা জোগাড় দিতেন।

পোড়া মাটির সরায় পাঁচটা গাব্বু গর্ত। সরাটা উনুনে চাপিয়ে গরম হলেই বেগুনের বোঁটা অংশটুকু তেলের বাটিতে চুবিয়ে সরার গাব্বু গর্তে ছ্যাঁক ছুঁক। অমনি তেল পোড়া গন্ধ-ধোঁয়া উঠল। তারপর চালের গুঁড়ো, ময়দা তার সঙ্গে

দুধ মিশিয়ে ওই গোলাটা হাতা দিয়ে ওই সরার গাব্বু গর্তে ভর্তি করা হত। ঢেকে দেওয়া হত আর একটা 'ঢাকনা সরা' দিয়ে। কয়েক মিনিট পর একটু সিদ্ধ-ভাজা-পোড়া মিশেলের গন্ধ উঠত। তৈরি হত 'চিতই পিঠে'।

কোরানো নারকেল আর ঝোলাগুড় মাখিয়ে সেই চিতই পিঠে, মুখে পুরলেই, আহা!

গরম তাওয়ায় হাতা দিয়ে ঘন গোলা ঢালা হত। এবং হাতার পিছনটা দিয়ে গোলাটা আস্তে ছড়িয়ে রুটির আকৃতি দেওয়া হত। তার মধ্যে পাক দেওয়া নারকেল এবং গুড়ের মণ্ড অথবা ক্ষীরের মণ্ড 'পুর' হিসেবে দেওয়া হত। তারপর রোল করে খুন্তি দিয়ে সযত্নে তুলে পাত্রে রাখা হত। তৈরি হত 'পাটিসাপটা'। গন্ধে 'ম ম' বাড়ি। নরম গরম মুখে পুরলেই চোখ বন্ধ। অপূর্ব স্বাদ!

সারাদিনই পিঠে খাওয়া। ভাতের পাট নেই। প্রায়ই এরকম হত শীতকাল জুড়ে। বিয়ের পর বউ পিঠে বানাত। তার স্বাদও অপূর্ব!

বন্ধুদের বাড়ি গেলেই পিঠে খেতে দিত। পেটে পিঠে বোঝাই হতাম শীতকাল জুড়ে। খেজুর রস খেতাম গ্লাস গ্লাস। কী স্বাদ!

স্নানের ক্ষেত্রে দুটো সংকট চলত শীতকাল জুড়ে, বিশেষত বাচ্চাদের। খালি গায়ে খাঁটি সরষের তেল মাখা। একে তো ঝাঁঝে চোখ বন্ধ। নাক গুরগুর, হাঁচি। চামড়ার কাটাতে লাগলে চিরচিরে জ্বলুনি।

অপরটি হল, শীতের হাওয়ায় শীত লাগা এবং তেল মাখার পর স্নান করা। স্নানের পর গা মোছা হাওয়াকে উপেক্ষা করে। এ নিয়ে প্রায় বাড়িতে বাচ্চাদের সঙ্গে দক্ষযজ্ঞ চলত।

আমি অনেকক্ষণ ধরে তেল মেখে দৌড়ে গিয়ে পাঁচ নম্বর ট্যাঙ্কে ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম। কুড়ি মিনিট থেকে আধঘণ্টা জলে সাঁতার, ঝুপঝাপ, ঝাঁপাঝাঁপি করতাম। গা মুছতাম ঘাটে। তারপর বাড়ি ফিরতাম।

শীতকাল মানেই পরীক্ষা শেষ। পড়ার চিন্তা নেই। ছুটি ছুটি হালকা জীবন, প্রাণোচ্ছল সময়, ঠান্ডা হাওয়া। অতএব বেড়াতে যাওয়া চাই-ই। পাড়ায় অনেকে চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, গড়ের মাঠ-এ যেতেন। দূর ভ্রমণেও যেতেন অনেকে।

আমি কাছে-দূরে ভ্রমণটাই পছন্দ করতাম। আর সঙ্গীও জুটত অনেক। পুরী, রাঁচি ইত্যাদি জায়গায় গেলে আশপাশটাও ঘুরতাম। বিয়ের পর আমি ও আমার বউ গিয়েছি মামার বাড়ি, চিত্তরঞ্জনে। ওখান থেকে ম্যাসাঞ্জোর, মাইথন, পাঞ্চেত ও আশপাশটা ঘুরেছি। গেছি পিসতুতো দাদার বাড়ি ধানবাদে, টাটার মালকেরা কোলিয়ারিতে। বিকেল হতে না হতেই দূর দূর থেকে ছেলেরা-মেয়েরা, বাচ্চারা পিলপিল করে হাজির হত পিসতুতো দাদার বাড়িতে। কিনা আমার বউকে নাকি হেব্বি সুন্দর দেখতে।

কোলিয়ারিতে প্রত্যেক ঘরেই সবসময় উনুন জ্বলত। সেগুলো কোনও দিনই নিভত না। কারণ, ওখানে কয়লার জোগান ছিল অফুরন্ত ও ফ্রি।

ধানবাদ স্টেশন থেকে ধানবাদ কোলিয়ারিতে যাওয়া খুব দুষ্কর। একটা ট্যাক্সিতে জনা ১৫-১৬ জন ঠেসেঠুসে ঢুকলে তবে ট্যাক্সি যেত।

শীতকালে ঘুরতে আরাম, খেতেও মজা। কতরকম ফল, কতরকম সবজি পাওয়া যায়। বিট, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, কড়াইশুঁটি, পালং সবই তরতাজা। রান্না হলে এ বাড়ির গন্ধ ও-বাড়িতে চলে যেত সীমানা অতিক্রম করে। এখন যায় না। এ-ঘরের রান্নার গন্ধ ও-ঘরে যায় না এখন। তখন মোম পালিশের, রং পালিশের সবজি পাওয়া যেত না। ডালের সম্বরের গন্ধে অন্য ঘরে হাঁচি আসত। এখন পেঁয়াজ কাটলেও চোখে জল আসে না। এখন তো তৈরি খাবার থেকে কাঁচা সবজি, সবেতেই ভেজাল।

শীতে চড়ুইভাতি, পিকনিক হত অনেক। দল বেঁধে সপরিবার বা বন্ধুরা মিলে পিকনিক, কাছেপিঠে বা পাড়ায়। সকালে ডিম পাউরুটি। দুপুরে বেগুন ভাজা দিয়ে ডাল, বাঁধাকপি বা ফুলকপির তরকারি আর মাংসের ঝোল। শেষে টম্যাটোর চাটনি। রান্নাতে কাঠের ধোঁয়া ও পোড়া গন্ধ। কলাপাতায় হাপুস হুপুস। দুপুরের খাওয়া বিকাল তিনটে-চারটেয়। আর রাত্রে বারোটা-একটায় খাওয়া হত। সঙ্গে খালি গলায় গান, নাচ, বাচ্চাদের দুষ্টুমি। হুল্লোড় করে খেলি আমরা পাড়াতে। শীতের খেলা বলতে ব্যাডমিন্টন, ভলিবল।

ঝুপ করে সন্ধ্যা নামে এখানে। ঘরে ফেরা পাখিদের ডানার শব্দে মুখরিত নির্জনতা। পরিষ্কার আকাশে তারাদের ঝাড়বাতি।

শীত শেষে বসন্ত আসে কোকিলের কণ্ঠে। পাতা ঝরা শুরু। কত কত কোকিলের ডাক শুনলাম এখানে এসে। ঠান্ডা-গরম মিশিয়ে বসন্ত হাওয়া দুলিয়ে দিয়ে যায় গাছের পাতা থেকে কিশোরের মনে।

রং খেলার পরব দোল। আমাদের পাড়ায় ভালই হয়। আবির মাখানো থেকে শুরু করে নানারকম রং মাখানো হয়। চলে হইহই আনন্দ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রং মাখে, মাখায়। তবে অশ্লীলতা অনুপস্থিত। দুপুরে ও বিকেলে ভোজও হত। আমিও শামিল হতাম এই রং-এর উৎসবে, খাঁটি আবির নিয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে হইহই করে আবির মাখাতাম, মাখতাম। খেলা শেষে পাঁচ নম্বর পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি। গা মুছে বাড়ি।

ছ'খানা ঋতুই স্পষ্ট বোঝা যেত। শরতের কাশফুলের স্রোত দেখা যেত পুবদিকের দিগন্তে। সল্টলেক ও তার আশপাশে জানান দিত শরতের স্পর্শ। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। পুকুরগুলোতে সেই মেঘের জলছবি কেষ্টপুর কলোনির মধ্যে মিশে যেত।

কেষ্টপুর কলোনির পাঁচটা পুকুরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পুকুরটি হল চার নম্বর

ট্যাঙ্ক। মেজো তিন নম্বর। এক ও দুই নম্বর ট্যাঙ্ক সমান আয়তনের। পাঁচ নম্বরটি সবচেয়ে ছোট।

এই পাঁচ নম্বর পুকুরের পাশেই আমাদের বাড়ি। স্নান করি এই পাঁচ নম্বরেই।

এই পুকুরগুলোতে টিকিট কেটে মাছ ধরার ব্যবস্থা আছে। প্রতি রবিবার কো-অপারেটিভ এটা করে। আগে থাকতে টিকিট দেওয়া হয়। আধঘণ্টায় টিকিট শেষ। প্রচুর লোক এই মাছ ধরা দেখতে আসে। পাড়ার অনেকেই মাছ ধরে এখানে।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অনন্ত মালাকার থাকেন দু'নম্বর পুকুরের কাছে। মাছ ধরতে বসেন রাজকীয় ভাবে। বসেন মোড়া পেতে। মাথার উপর থাকে একটা বিশাল রঙিন ছাতা। তাঁর ছিপটাও বিশাল! এত বড় ছিপ হয় জানতাম না আগে।

আর এক মাছ শিকারি, পাড়ার পল্টুদা। তিনি বড় শিকারি। টিকিট কেটে তিনিও নিয়মিত বসেন মাছ ধরতে।

মাছের টোপ ও 'চার'-এর গন্ধে 'ম ম' করে পুকুর পাড়টা। ছিপ ফেললেই মাছ ওঠে। অমনি একটু গুঞ্জন ছড়িয়ে আবার চুপ। সবার চোখ জলের দিকে। মাঝে-মাঝে মাছের 'ঘাই' দেখা যায়। অমনি শিকারিদের তীক্ষ্ণ নজর পড়ে। ভিড়ের নীরবতা এই প্রথম বুঝলাম।

জাল টেনেও মাছ ধরা হয়, 'চাপলে মাছ'। এক বিঘতের চেয়ে ছোট সাইজের হয় মাছগুলো, তিন-চার ইঞ্চি লম্বা। এই চাপলে মাছের স্বাদই আলাদা প্রায় ইলিশের মতো। ইলিশ মাছের মতো গন্ধ। গায়ের রং ইলিশের মতোই রুপোলি। যেদিন চাপলে মাছ ধরা হয়, তার আগেরদিন একজন লোক ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে অঞ্চল ঘুরে জানান দেয়—কাল সকালে চাপলে মাছ ধরা হবে (এত) নম্বর পুকুরে। সকলে আধসের করে পাবে।

জালে আটকানো পোনা মাছের বাচ্চাদের জলেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই মাছ কিনতে পারে শুধু কলোনিবাসীরাই। আধসের সেই মাছের দাম একটাকা।

মাছ ধরার দিন ভোরবেলা হাজির হই পুকুর পাড়ে। ওই ভোরেও ভিড় জমে যায়। মাছ ধরা দেখার ও মাছ কেনার ভিড়। শীতকালে তো দারুণ লাগে। হালকা কুয়াশা ঢাকা পুকুরে জেলেদের হাঁক পাড়াপাড়ি।

অনেক জেলে আসে। ওরা দলবদ্ধভাবে দু-দিক থেকে জাল টানতে টানতে দুপ্রান্ত এক জায়গায় জড়ো করে। সমুদ্রে যেভাবে জাল ফেলে মাছ ধরা হয়, সেভাবে। তবে নৌকো লাগে না। কেউ পাড়ে থাকে, কেউ জলে নামে। তারপর জাল টানাটানি করে। এই নিয়েই হাঁক পাড়াপাড়ি, হইহই। জাল টানার সময়ে বড় বড় মাছগুলো ফরাৎ ফরাৎ করে জাল ডিঙিয়ে গভীর জলে চলে যায়। শব্দ ওঠে খলবল খলবল, ফরাৎ ফরাৎ। মুখর হয় পুকুর পাড়। ছোট মাছগুলো ধরা

পড়ে। পোনা মাছগুলো জলেই ছেড়ে দেওয়া হয়। আস্তে আস্তে জাল টেনে গুটানো হয়। বেছে বেছে 'চাপলে' মাছ ফেলা হয় পাড়ের ঘাসেই। সেখানেই সদ্যোমৃত বা ছটফট করা জ্যান্ত মাছ ওজন করে বিক্রি হয়।

আমি সেই মাছ কিনে ফিরে আসি বাড়ি।

যারা মাছ তোলে তারা পায় অর্ধেক মাছ। বাকি অর্ধেকটা কলোনিবাসীর কাছে বিক্রি হয়। বিক্রির টাকাটা পায় কো-অপারেটিভ। পুকুরগুলো সবই কো-অপারেটিভের।

মাঝে মাঝে পুকুরগুলো পরিষ্কার করা হয়। লম্বা বাঁশের ডগায় বাঁশের ছোট ছোট শাখাগুলো হয় আঁকশি। বাঁশটাকে ঘুরিয়ে মোচড় দিয়ে টানলেই ঝাঁঝি উঠে আসে।

ঝাঁঝি তুললেই তার মধ্যে পাওয়া যায় প্রচুর কুচো চিংড়ি। ছোট বাচ্চারা সেগুলো কুড়িয়ে নেয় হইহই করে। মুঠো মুঠো আনন্দে পুকুর পরিষ্কার।

এই পুকুরগুলোতেই ছেলেরা স্নান করে। অল্প কয়েকজন মেয়ে পুকুরে স্নান করে। বাদবাকি মেয়েরা এবং খুব বয়স্করা টিউবওয়েলেই স্নান করেন। থালা-বাসন মাজা ও কাপড় কাচা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র স্নান করা চলে পুকুরগুলোতে।

পুকুরগুলোর বাঁধানো ঘাটে বসে বিকেল থেকে ছেলেদের আড্ডা। তখন টিভি নেই। রেডিও আছে। গল্পদাদুর আসর, মহিলা মহল, অনুরোধের আসর, নাটক শোনা হয় রেডিওতে। এই নিয়েই জমে থাকেন প্রধানত মহিলারা।

ছেলেরা রেডিওতে শোনে রিলে। ফুটবল ও ক্রিকেটের রিলে। মাঠ এবং খেলাটা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে অসাধারণ ধারাভাষ্যে। এ যেন শব্দ-ছবি!

সন্ধ্যা হলেই বাড়িতে বাড়িতে শঙ্খ-ফুঁ। কিছু বাড়িতে বসে তাসের আড্ডা।

ঘরের কাজের অবসরে মেয়েরাও বাড়িতে বাড়িতে আড্ডা জমায়। চলে পরস্পরের খোঁজখবর, সুখ দুঃখের ভাগাভাগি।

সন্ধ্যা হলে আমিও আড্ডা দিতাম পুকুর ঘাটে। না, অশ্লীল আড্ডার কোনও স্থান ছিল না। বিষয়—খেলা থেকে রাজনীতি সব। ধীরে ধীরে বন্ধুদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাতে চেষ্টা করতাম। কে কী ভাবছে এসব নিয়েও জমত আমাদের ঘাটের কথা।

পরে নাইট কলেজে পড়ার সময়ে সন্ধ্যার বদলে আমার আড্ডা শুরু হত কলেজ থেকে ফিরে। আড্ডা শেষে বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে পড়তাম গভীর রাত পর্যন্ত।

পাড়ায় প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে। সবাই সবার বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সকলেই খুব আন্তরিক। ঝগড়া নেই। যেন একটা বড় পরিবার। সবাই সবার খোঁজখবর নেয় নিয়মিত। ফুটবল খেলা নিয়েই যা একটু আধটু মারামারি হয়, তা-ও অন্য পাড়ার সঙ্গে। বড়রা ছোটদের শাসন করে। ছোটরাও সেই শাসন

মান্য করে। মুখে মুখে তর্ক বা উপেক্ষা করে না বড়দেরকে।

আমাদের যুবক-যুবতীদের পাড়ার গার্জিয়ান ছিলেন—সুধীর সেনগুপ্ত, বিনয় নন্দী মজুমদার, সুনীল মুখার্জি ও হৃদয় ব্যানার্জি। শাসন করার অধিকার আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। তাঁদের শাসনকে মান্যও করতাম। এখন তা হয় না।

বড়দের সামনে ছোটরা কখনওই বিড়ি-সিগারেট খেত না। মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের সম্পর্কটা বন্ধুত্বের ছিল না। মেয়েরা একটা ছেলেকে পটিয়ে পাটিয়ে বিয়ে করতে পারলেই যেন তাদের জীবন ধন্য হয়ে যেত। আর পটানো ও জোড়ায় ঘোরাটা হত গোপনে। বড়রা যেন টের না পায়, সেজন্য তারা সতর্ক থাকত। তবে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেঁরো হত।

যারা খেলাধুলায় মেতে থাকত তারা ওই সমস্ত মেয়ে পটানোর ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহী ছিল না। একটি ব্যতিক্রম—সুনীল সেনগুপ্ত।

খুব ভাল সেন্টার ফরোয়ার্ড। আর আমার দেখা খুব ভাল প্রেমিক। খেলার সূত্রে ইস্টার্ন রেলে চাকরি করত। আর 'প্রেমিকা কল্পনা'র এক চিলতে শাড়ি কখন দেখা যাবে, সেজন্যে মেয়েটির বাড়ির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করত। এমনই ছিল গভীর প্রেম! শেষ পর্যন্ত দু'জনের বিয়েও হয়।

চার নম্বর ট্যাঙ্কটি ছিল একটা ছোট বৃন্দাবন। পাড়ার কিশোরী ও সদ্য তরুণীরা বিকেল হলেই প্রজাপতির মতো উড়ত। আর, ওই পুকুরের চারপাশে চক্কর কাটত। সদ্য তরুণরাও উল্টোদিক দিয়ে তখন চক্কর দিত। দু-দলের সঙ্গেই মুখোমুখি হতো এক-একটা চক্কর শেষে।

তখন আমি ডানপিটে ছিলাম এবং লিখতাম। কিছু মেয়েদের নজর ছিল আমার ওপর। রাজনৈতিক সচেতনতার কারণে ওই সমস্ত বিয়েপাগলি মেয়েদের একটুও ভাল লাগত না।

অধ্যায় : চার

কলোনির বাজারহাট

আমাদের বাড়িতে তোলা উনুনে রান্না হয়। সব বাড়িতেই উনুন। গ্যাসের প্রচলন হয়নি। রান্না করেন বাড়ির গৃহিণীরা। রান্না হত কয়লাতে। পরে অবশ্য কয়লার বিকল্প এল গুল। কয়লা জ্বালাতে ঘুঁটে লাগে। ঘুঁটেওয়ালিরা শ'হিসেবে ঘুঁটে বিক্রি করে যায়। বস্তায় ভরে সেগুলো তুলে রাখি।

যশোর রোডের কাছেই বাঁ দিকে একটা কয়লার আড়ত ছিল। বড়বড় দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা। দাম দিয়ে দেওয়ার পর ওরাই কর্মচারী দিয়ে কয়লা পাঠিয়ে দিত। 'মণ' হিসেবে কয়লা বিক্রি হত। আর বাজার ছিল আলাদা জায়গায়।

তখন বাজারে কয়েকটা দোকান। সবচেয়ে পুরনো মুদির দোকান আশু পালের। পরে খুব বড় একটা দোকান করে বঙ্কিম কর। এরপর ছানাদা মুদির দোকান করলেন।

প্রথম একমাত্র মিষ্টির দোকান করেন আমাদের পাশের বাড়ির পালকাকু। ওনার মিষ্টির কোয়ালিটি খুবই ভাল।

আর, একমাত্র পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান ছিল ধ্রুবদার। চায়ের দোকান ছিল পাড়ার শেষ প্রান্তে শ্যামনগর রোডের পাশে। টিনের চাল, বাঁশের খুঁটি। বেশ কয়েকটা বেঞ্চি পাতা। পাওয়া যায় চা, বিস্কুট, পাউরুটি, ওমলেট। দোকানটির পরিচিতি 'ম্যানেজারের দোকান' নামে।

তিনি সাদা ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরে খালি গায়ে চা বানান। গ্লাসে চামচ ঠক্‌ঠক্ ঠক্‌ঠক্ করে নেড়ে চিনি গোলেন। ছোট ছোট গ্লাসে চা দেন। দোকানে থাকে তিনটে জনপ্রিয় কাগজ— আনন্দবাজার পত্রিকা, বসুমতী ও যুগান্তর। সকাল থেকে রাত প্রচুর ভিড় হয়। একদম জমজমাট। এখানে আমিও যাই মাঝে-মধ্যে।

এরপর বাজারে দোকান বাড়ল। কো-অপারেটিভের অফিস হল বাজারের দোতলায়। আগে ছিল পাড়ার শেষ প্রান্তে শ্যামনগর রোডের ধারে এখনকার পোস্ট অফিসের কাছে।

আর, একতলায় রেশন দোকান চালায় কো-অপারেটিভ। আমি রেশন ধরি। চাল, গম, চিনি আনি। গম এনে ঝেড়ে বেছে গম ভাঙানোর দোকানে ভাঙিয়ে আটা করাই। দোকানে আটা পাওয়া যায় না।

বাজার প্রতিদিন বসে। ধীরে ধীরে সরগরম হয়। সামনের দিকে মুদি ইত্যাদির দোকান। পিছনের দিকে সবজি ও মাছের বাজার। ভিড়ও হয় বাজারে।

মাছের দোকানের মধ্যে কালীর বেজায় নাম। বড় মাছওয়ালা। বড় দোকান। ছোট পোনা মাছের দর একটাকা বারো আনা থেকে দু'টাকা সের।

সব সবজিই পাওয়া যায়। আসে আশপাশের ধাপা-রাজারহাট প্রভৃতি গ্রাম থেকে। আয়ের তুলনায় বাজারদর সস্তা। আর, সবই তাজা সবজি। মাছও জ্যান্ত।

খাদ্য আন্দোলনের খবর পত্রিকায় পড়েছিলাম। সেসময়ে এবং তার পরবর্তীকালেও আমার ছোটবেলার জীবনে তা স্পর্শ করেনি।

তবে প্রফুল্ল সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় একটা কাণ্ড ঘটল। বাজারদর একটু বেড়েছিল। খোলাবাজারে চাল, গম পাওয়া যেত না। লুকিয়ে-চুরিয়ে চাল কিনতে হত। খাওয়ার জন্য বাগুইআটি বাজার থেকে চাল কিনে পুলিশকে ঘুষ দিয়ে ছাড়া পেতাম। কারণ, আমাদের এলাকায় খোলাবাজারে চাল, গম পাওয়া যেত না।

আমার পাড়ার নেতারা তখন বামপন্থী। পাড়ায় দড়িতে কাঁচকলা ঝুলিয়ে রেখে প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতেন তাঁরা। কারণ, বাজারের অবস্থার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী 'কাঁচকলা' খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন জনগণকে। অবশ্য এই অবস্থাটা বেশিকাল স্থায়ী হয়নি।

আমিই বাড়ির বাজার করি। পাঁঠার মাংস ছ'টাকা সের। মুরগি মেলে না। মুরগি খাওয়ার ইচ্ছে হলে মুরগি চুরি করতে হয়। পাড়ার সলিলরা দেশি মুরগি পোষে। রাতদুপুরে সেই মুরগি চুরি করি, সঙ্গী দীপক ঘোষ। আর, সকালে চুরি করা মুরগিটা হাতে ঝুলিয়ে বাগুইআটি বাজার থেকে ফিরি। মুরগি সবই দেশি। ডিমও দেশি। হালকা লালচে রং-এর খোলা। তখন পোলট্রি হয়নি।

দীপকদের বাড়িটা ফাঁকাই থাকে। ওর মা থাকেন ওর বাবার কর্মক্ষেত্রে। ওদের বাড়িতেই আমি, দীপক আর বাবলু চুরি করা মুরগিটা কেটেকুটে রান্না করে খাই। সেই মুরগি রান্নার গন্ধ ও স্বাদই অপূর্ব! আর যে বাড়িতেই ডাব গাছ, সেই বাড়িতেই আমরা হানা দিয়ে ডাব পাড়ি রাত্তিরে।

একবার স্কুলের কাছে জীবনদের বাড়িতে নারকেল গাছ থেকে গোটা চারেক ডাব চুরি করলাম। তিন বন্ধুতে ডাব পেড়ে যে যার বাড়ি ফিরলাম। সকাল বেলায় পাঁচ নম্বর পুকুরে স্নান করতে গেছি। জীবনের মা ঘাটের কয়েকজনকে বলছেন, কালকে আমার বাড়ি থেকে অন্তত পঁচিশ-তিরিশটা ডাব চুরি করে নিয়েছে। চাইলে হাতে ধরে দিয়েও শান্তি পেতাম।

চারটে ডাবকে একলাফে পঁচিশ-তিরিশ বানিয়ে দিল!

সুন্দরমামা মাঝে-মাঝেই চিত্তরঞ্জন থেকে হাজির হন। এসেই আমাকে ধরে নিয়ে বলেন, চল্ নাগেরবাজারে নিয়ে চল্। বাসস্ট্যান্ডে এসে নাগেরবাজারের

বাস ধরি। রিকশা তো নেই-ই। আর পায়ে হেঁটে যাওয়া কঠিন।

বাজারে গিয়েই মা-এর জন্য একটা শাড়ি কেনেন তিনি। আর, মাছের বাজার থেকে ইলিশ পেলে ইলিশ কেনেন, না হলে রুই। শেষে বাড়ি ফেরা। জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া, গল্পগুজব। সুন্দরমামা আসা মানেই হইহই হুল্লোড় আনন্দ।

হইহই হুল্লোড় হয় পাড়াতেও। পাড়ার ছেলেরা মেতে থাকে ফুটবল খেলায়। হাইস্কুলের পাশের মাঠে ফুটবল খেলা হয়। সেই সময়ে কেষ্টপুর কলোনির ফুটবল টিম থেকে প্রচুর খেলোয়াড় উঠেছে, যারা কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশনে বা সেকেন্ড ডিভিশনে খেলেছে। এদের কোচ কলকাতার প্রথম ডিভিশনের ফুটবলার সুনীল সেনগুপ্ত। তিনি নিজেও কেষ্টপুর কল্যাণ সমিতির কোচ-কাম-সেন্টার ফরোয়ার্ড। তেকাঠিটা দারুণ চিনতেন। কলোনির ফুটবল টিমের নাম কল্যাণ সমিতি।

ধীরে ধীরে পাড়ায় বাড়ি হচ্ছে। দু-একজন করে আসছেন। রাস্তাঘাট উন্নত হচ্ছে। চারিপাশটা উন্নত হচ্ছে।

অধ্যায় : পাঁচ

প্রেম অত সোজা নয়

আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে ছিলেন এক গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার। পাড়ার কোনও লোকের সঙ্গেই মিশতেন না। ওনার বউ খুব সুন্দরী। আমি বারান্দায় থাকলে উনি ওনার দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বুকের কাপড় সরিয়ে দেখাতেন।

এক ভাই ছিল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার। কাজ নিয়ে সে চলে গেছে দুর্গাপুরে। ওদের দু'জনকেই দেখতে খুব সুন্দর। ওদের বোন দেখতে সুন্দরী। কলেজে পড়তে এত ছেলের মাথা খেয়েছিল যে, তার বিয়ে দিয়ে মা-বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

আমাদের বাঁ পাশের দোতলা বাড়িতে থাকতেন পালকাকু। তাঁর তিন মেয়ে, এক ছেলে। বাজারে তিনি মিষ্টির দোকান করার আগে আমাদের মিষ্টি কিনতে যেতে হত সেই-ই শ্যামনগর রোড ধরে যশোর রোডের কাছে। এই পালকাকু কাজ করতেন কে সি দাসের মিষ্টির দোকানে। ওখান থেকে কারিগর নিয়ে এসে মিষ্টি বানাতেন। সে মিষ্টির স্বাদ অপূর্ব।

পালকাকুদের একতলায় ভাড়া থাকতেন যতীন বারুই। ইন্‌কামট্যাক্স ইন্সপেক্টর। মাঝারি উচ্চতার, কালো, দোহারা গড়ন। মাছ ধরার পোকা ছিলেন। বর্ষাকালে বেতের খাঁচা বাগিয়ে ফাঁদ পেতে চুনো মাছ ধরতেন নালিতে।

যতীন বারুইয়ের বউয়ের গায়ের রং ফর্সা, লাল টুকটুকে, বেঁটেখাটো, গোলগাল চেহারা। এদের এক মেয়ে, এক ছেলে। বাপি ও বাবলু। এই যতীন বারুইয়ের কাছে একটি ছেলে আসত ইন্‌কামট্যাক্সেই কাজ করে। বারুই বউদি তাঁদের বাড়িতে জাঁদরেল সুনীলদার মেয়ে শেলীকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেটির সঙ্গে।

'শেলী' পাড়ার অন্যতম সুন্দরী। একদিন দুপুরে দেখি, দ্রুত খালপাড় ধরে বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছে শেলী। আর হরিদা খালিগায়ে হেঁটো ধুতি পরে খালপাড় দিয়ে পাঁইপাঁই করে দৌড়তে লাগলেন শেলীর পিছুপিছু। হরিদা ছিলেন সুনীলদার বাড়ির কর্মচারী। অবাক হয়ে দেখলাম। হরিদা শেলীকে চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে নিয়ে এলেন বাড়িতে।

হরিদা ছিলেন সুনীলদার পরিবারের একজন। সুনীলদার বউ ছিলেন অতি সুন্দর স্বভাবের এক মহিলা। সুনীলদার এই দ্বিতীয়পক্ষের বউ-এর ব্যবহার দেখে কোনও দিনই কেউ বুঝবে না যে, তিনি শেলীর বিমাতা।

যাই-হোক, সুনীলদা সব শুনে ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন কথা বলতে। ছেলেটি এল। সুনীলদা জিজ্ঞাসা করলেন—নাম কী? কোথায় কাজ করো? কী পোস্টে কাজ করো? তুমি শেলীকে বিয়ে করতে চাও?

ওমনি ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে সুনীলদার পায়ে আছড়ে পড়ল। না, আমি বিয়ে করব না।

একমাসের মধ্যেই সুনীলদা শেলীর বিয়ে দিয়ে দিলেন। এই কলোনিতে এত জাঁকজমকের বিয়ে কেউ কোনও দিনই দেখেনি।

আমাদের বাড়ির ডানদিকে থাকতেন তিন ভাই। বড়ভাই বিপুল চক্রবর্তী, মেজো বকুল, ছোট আন্টু। বকুলদা অবিবাহিত ছিলেন। আর আন্টুদা বিয়ে করেছিলেন। তাঁর দুই মেয়ে ছিল।

এই বিপুলদার বাড়ির ডানপাশে মাঠের মুখোমুখি একটা টিনের ছোট্ট দোচালা ছিল। মাথা গোঁজার ঠাঁই। শ্যামাদারা থাকতেন।

শ্যামাদার বাবা বেঁটেখাটো, অতি ক্ষীণকায় চেহারার। তিনি একটা ছোটখাটো চাকরি করতেন।

শ্যামাদার মাকে জেঠিমা বলে ডাকতাম। তাঁর সুন্দর স্বভাবের জন্য তাঁকে ভাল-না বেসে থাকাই যায় না।

আমি পাড়ায় পরিচিত ছিলাম 'পুলক' নামে। শ্যামাদার মা আমাকে ডাকতেন 'আনন্দ' বলে। সেটা নাকি আমার 'আনন্দোজ্জ্বল' স্বভাবের জন্য।

শ্যামাদা শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শিখে ইএমসি ফ্যাক্টরিতে স্টেনোর কাজ পেলেন। তিনি কুঁজো হয়ে চলেন। আর খুব বারফাট্টাই ছিলেন।

শ্যামাদার ভাই তপন। সেও ছিল দাদার স্বভাবের ডিটো কপি।

আমার প্রিয় বন্ধু বাবলুর মেজদি ছিলেন খুব সুন্দরী। শ্যামাদার সঙ্গে কীভাবে যেন তাঁর 'প্রেম-ট্রেম' জাতীয় কী একটা ঘটে গেল। বাবলুর বাবা শ্যামাদার টিনের দোচালাকে পাকা বাড়ি করে দিলেন এবং দুজনের বিয়ে দিলেন।

এ'পাড়ায় এসেই আমার বন্ধু হল বাবলু ও দীপক। অবশ্য ওদেরকেও একটা খোপে রেখেছিলাম। ওরা আমার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানত না। আমার রাজনৈতিক পরিচয় ছিল ওদের কাছে অজানা। ওরা পাড়ার বন্ধু।

বাবলু ব্যানার্জির খুব পেটানো চেহারা, রং ফর্সা। ফুটবল খেলত। হয় বল ওড়াত, নয় পা ওড়াত।

সায়েন্স স্ট্রিমে পড়াশুনা করেছিল। তারপর জাহাজে জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি জীবন শুরু।

ওর মা-বাবা থাকতেন বাংলাদেশে। তাঁরা বাড়িতে এলে, বাবলু আমাদের বাড়িতে চলে আসত। আমরা দু'জন এক বিছানায় শুতাম।

বাবলুরা তিন ভাই, চার বোন। ওদের বাড়িটা ছিল মন্দিরের গায়েই। একতলা বাড়ি।

এই বাবলুর বড়দির বিয়েতেই এক অদ্ভুত জিনিস খেয়েছিলাম, পায়েস ও দুটো পাকা আম। এটা নেমন্তন্ন বাড়ির স্মরণীয় ঘটনা। বাবলু তার মেজদির বান্ধবী ঝন্টুকে বিয়ে করেছিল। দু'জনে দু'জনকে খুব ভালবাসত।

আমার আরেক বন্ধু দীপক ঘোষ। স্বাস্থ্যবান, কালো। ও সায়েন্স স্ট্রিমেই পড়ত। কর্মজীবন শুরু করে ফ্লাইং অফিসার হিসেবে। পদটা কমিশন্ড অফিসার।

ওরা ছিল চারভাই, একবোন। দীপক বড়। ওদের বাড়ি একতলা। সেটা মন্দিরের কাছে।

এদের পরেই দমদম পার্কের আর তিন বন্ধুর নাম বলতে গেলেই বলতে হয়—প্রদীপ দত্ত, সমীর ঘোষ ডাকনাম খুকু এবং বিমল দেবনাথ।

প্রদীপ আর আমি দুজনে আশপাশের অঞ্চলগুলো পায়ে হেঁটে ঘুরতাম। সল্টলেকের জলাভূমি অঞ্চলটা প্রচুর ঘুরেছি। নৌকোতে চড়তাম। দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমি তখন ভরাট করা চলছে। জলাভূমি অঞ্চলগুলোতে দাঁড় বাইতাম আমরা। প্রকাণ্ড আকাশ। ইতিউতি ঝোপ। শরতে কাশফুলের ঝোপ। আর জলে নৌকোতে আমরা। যেন জীবনের ডিঙাতে ভেসে চলেছি...।

পড়াশুনা ও রাজনীতির চাপে এস ও পিসি-তে বক্সিং প্র্যাকটিসে যেতে পারতাম না। বদলে বাগুইআটির যোগীপাড়ায় মনোহর আইচের আখড়ায় যেতাম ব্যায়াম করতে। সঙ্গে থাকত এই প্রদীপ দত্ত। আর, বাড়িতে স্কিপিং ও বালির বস্তায় পাঞ্চিং প্র্যাকটিস করতাম। দৌড়তাম খেলার মাঠে।

প্রদীপের চাকরি জীবন শুরু কলকাতা পুলিশের অফিসার হিসেবে। ওরা এক ভাই, দুই বোন। থাকত মন্দিরের কাছেই। ওদের বাড়িটা দোতলা।

খুকুর সাংঘাতিক পেটানো স্বাস্থ্য। ভাল অভিনয় করত। গম্ভীর গলা ছিল। ও রাজ্যসরকারের পুলিশ অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে। থাকত এক এবং দুই নম্বর ট্যাঙ্কের মাঝে। ওর দাদা ভালই গান গাইতেন।

ওই দাদাকে নিয়ে একটা ঘটনা মনে পড়ল—একদিন একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল খুকুদের বাড়ির দরজায়। মেয়েটি সুন্দরী, সুসজ্জিতা ও সালংকারা। সে খুকুর দাদাকে ডেকে দিতে বলল। কেউ একজন খুকুর দাদাকে ডেকে দিল। ছোট জটলা। মেয়েটি খুকুর দাদাকে বলল, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। তুমিই তো

বলেছিলে আমি এক কাপড়ে বেরিয়ে এলে তুমি আমার ব্যবস্থা করবে। আমি আর বাড়িতে ফিরতে পারব না।

বুঝলাম খুকুর দাদার সঙ্গে মেয়েটির একটা সম্পর্ক ছিল ও আছে। খুকুর দাদা সব শুনল। তারপর মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে গেল। জটলাটা ফাঁকা।

পরে খবর পেলাম। মেয়েটি বিয়ের রাতেই বরকে জানিয়েছিল, আমি একটা ছেলেকে ভালবাসি এবং সেও আমাকে ভালবাসে। আমি তোমার সঙ্গে সংসার করতে পারব না।

ভোর হতেই বিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। খুকুর দাদা মেয়েটিকে বাঙুরে এক পরিচিত বাড়িতে ভাড়া নিয়ে রেখেছিলেন। আর তিনি কেটে পড়েছেন। বেশ কিছুদিন পরে সেই বাড়ি থেকেও মালিকরা মেয়েটিকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। খুকুর দাদারও খোঁজ নেই। মেয়েটি শরীর ভাঙিয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হল।

তখন নকশালরা 'শ্রেণিশত্রু' খতমের লাইন নিয়েছে। আমি তখন স্টেটব্যাঙ্কে কাজ করি। অফিসে যাচ্ছি। আমার হাতে সবসময়েই গোটা দুয়েক বই থাকত। যশোর রোডে উঠে এল থ্রি সি বাসস্ট্যান্ডে যেতে গিয়েই দেখি—একটা বড়সড় হইচই হচ্ছে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ভয়ে। এক মুহূর্ত দেখলাম, খুকুকে কয়েকজন ঘিরে ধরে খুব পেটাচ্ছে। তার মধ্যে দু'জনের হাতে ছুরি। মনে হল খুকু একটু নার্ভাস হয়ে গেছে। আমি দ্রুত একজনকে বললাম, বইদুটো একটু ধর তো। তারপর গন্ডগোলে ঝাঁপালাম। দু'মিনিটেই চারজন তথাকথিত নকশাল রক্তাক্ত মুখে থুবড়ে পড়েছে রাস্তায়। ভিড়টা দাঁড়িয়ে দেখছে। চকিতে একটা ট্যাক্সিকে দাঁড় করালাম। প্যাসেঞ্জারদের নামালাম। খুকু আর ওই চার অপরাধীকে তুললাম ট্যাক্সিতে। ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে সোজা দমদম থানা।

তারপর খুকুর বাড়ির কে কে এসে যেন আমাকে জানিয়ে গেল কৃতজ্ঞতা। আর খুকু হয়ে গেল আমার আরও ঘনিষ্ঠ।

বিমল দেবনাথ ছিল সেই সময়কার আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মা-বাবা আর একমাত্র ছেলে বিমল থাকত বাজারের কাছে ছোট একতলা বাড়িতে। সুদর্শন, মিষ্টভাষী ছেলে। প্রায়শই দেখা হত আর আড্ডা দিতাম।

এই বিমল, প্রদীপ দত্তের পরের বোনকে নাকি ভালবাসত। দেখতাম, রোজ মেয়েটির পাশে পাশে হেঁটে হেঁটে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যায়। দু-তিন বছর রোজই এভাবেই গেল। কিন্তু ওই তিন বছরে মেয়েটির সঙ্গে একটাও কথা বলতে পারেনি বিমল। মেয়েটি অবশ্যই বুঝত, কেন বিমল ওর সঙ্গে হাঁটে। মেয়েটি বিমলকে হাঁটতে নিষেধও করেনি!

বিমল পরে টেক্সম্যাক্সোতে চাকরি পেল ইঞ্জিনিয়ার পদে। এরপর কেষ্টপুরে জমি কিনে বাড়ি বানিয়ে চলে গেল।

শেষে সম্বন্ধ করে বিয়ে করল। বউটি রোগা, লম্বা। আমি দমদম পার্কে থাকতে ওদের বাড়ি বেড়াতে যেতাম সীমাকে নিয়ে। তখন বিমলের মা হাউহাউ করে কাঁদতে থাকতেন। বলতেন, 'কী একখান জঙ্গলি বউ বিয়া করসে...দেয়ালে উইট্‌ঠা লাফ দিয়া ছাদেও উইট্‌ঠা পড়ে...। কী যে কমু...।'

আমিও '৭৮-এর বন্যার পরে পরেই দেবীনিবাসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে আসি।

দু'জনের দূরত্ব বাড়ল। আমরা এখন দুই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

অধ্যায় : ছয়

পাড়ার উন্নয়নের ছবি

সুনীল মুখার্জি কেষ্টপুর কলোনির কো-অপারেটিভ সেক্রেটারি হওয়ার পর পাড়ায় প্রচুর উন্নতি করেন। খেলার মাঠ মাটি ফেলে, লেভেল করে উঁচু করে দিলেন। রাস্তাগুলো পিচের করে দিলেন। বিশাল মন্দির কম্পাউন্ডটা সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন।

পাড়ায় তখন কল্যাণ সমিতির ক্লাব চলছে। কিন্তু কোনও ঘর নেই। আমি, বাবলু ব্যানার্জি, দীপক ঘোষ এই তিনজন সুনীলদার সঙ্গে দেখা করে বললাম, একটা ক্লাব চলছে, তার বিল্ডিং না হলেই চলে না। কল্যাণ সমিতির জন্য একটা জমি দিন। আমরা চাঁদা তুলে বিল্ডিং করে নেব। তিনি বললেন, জমি দিতে গেলে তো মিটিং করে দিতে হবে। কো-অপারেটিভের কাছে এটা প্রত্যাশা করিস না। বরঞ্চ দখল করে নে। চাঁদা তুলতে গেলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে। তার থেকে বরং কালই রাতে চার নম্বরে...যে বিশাল বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, তার ছাদে প্রচুর শাল কাঠ জমা আছে। রাত এগারোটা থেকে লেবার আর কাঠের মিস্ত্রি চলে আসবে। তারপর কাঠগুলো উপর থেকে ফেলবি। কাঠের মিস্ত্রিরা, লেবাররা সেগুলো জমিতে নিয়ে চলে আসবে। তোরা ওই কেজি ইস্কুলের পাশে যে জমিটা আছে, সেটা রাতারাতি দখল করে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে ফেল্। রেডিমেড দরজা লাগিয়ে দিবি, কল্যাণ সমিতির একটা বোর্ড লাগাবি আর দরজায় তালা লাগিয়ে দিবি।

ওখানেই রাতারাতি তৈরি হল কল্যাণ সমিতির ব্যায়ামাগার। তারপর পাশে একটা লাইব্রেরি গড়ে তুললাম আমরা। ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলাম এই লাইব্রেরির সঙ্গে। আমি ছিলাম সেক্রেটারি। মানিক চক্রবর্তী ছিলেন কিং মেকার। আমাদের সঙ্গে ছিল কুমার রায়, বিশু ও শম্ভু। বিশু ও শম্ভুদের কাকা ডাক্তার। ওরা লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল। বিশু-শম্ভুও বর্তমানে ডাক্তার।

এরপর এই লাইব্রেরি থেকেই ম্যাগাজিন বের করতাম। কয়েক বছর চলেছিল। সাহিত্যিকদের ডেকে আনা হত। আলোচনা হত।

চার নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে থাকত দিলীপ ব্যানার্জি। সে আমাদের পিছনে

সবসময়েই লেগে থাকত যাতে কীভাবে আমাদের বাঁশ দেওয়া যায়। সিপিএম করত। বড়ভাই কংগ্রেস। ছোটভাই প্রদীপ নকশাল।

সিপিএম-রা ক্ষমতায় এসেই লাইব্রেরিটা দখল করল। ধুরন্ধর দিলীপ হল সেক্রেটারি। লাইব্রেরিতে যেসমস্ত অনুষ্ঠানের ছবি টাঙানো ছিল, দিলীপ সেইসব ছবি বিদায় করল।

পাশেই গুপ্ত বাড়ির ছেলে প্রসূন ছিল তখন দিলীপের ডানহাত-বাঁহাত। প্রসূনের বাবাকে আমরা 'গুপ্তদা' বলতাম। গুপ্তদার বাবা ছিলেন কন্ট্রাক্টর। গুপ্তদাকে আমরা কেউ কোনও দিন চাকরি করতে দেখিনি। মদ্যপান আর দাঙ্গাবাজিতেই মেতে থাকতেন।

লাইব্রেরির চাবি থাকত ফণীদার বাড়িতে। গুপ্তদার পাশের বাড়ি হল ফণী রায়ের বাড়ি। সুন্দর সাজানো ফুলের বাগান। চাকরি করতেন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের রেডিও অপারেটর পদে।

তখন দমদম পার্কে স্কুল ছিল চারটে। ছেলেদের হাইস্কুলেই চলত মেয়েদের হাইস্কুলটা। সকাল ও দুপুরে পালা করে চলত। সরকারি প্রাইমারি স্কুল ছিল একটা। চেল্লামেল্লি, হইহই, গোলমালই চলত। পড়াশুনা কিছুই হত না। যেন একটা গোয়ালঘর। আর ছিল একটা কে জি স্কুল। নাম ছিল শিশু বিদ্যাবীথি। এখানে পড়তে আসত একটু অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে-মেয়েরা।

ছেলেদের হাইস্কুলের পাশেই খেলার মাঠ। একটি বলে নয়জন করে আঠারোজন-এর ফুটবল খেলা যায় এই মাঠে। তবে এগারো জনের টিম নিয়েও খেলা হত।

এই স্কুলমাঠেই সিনেমা, নাটক হত। উনিশ পয়সার টিকিটে ৩৫ মি.মি-র স্ক্রিনে সিনেমা দেখানো হত। হিন্দি, বাংলা নানান হিট ছবি দেখেছি এখানে। এখানেই প্রচুর নামী দলের নাটক দেখেছি। চাক ভাঙ্গা মধু, মারীচ সংবাদ, তিন পয়সার পালা ইত্যাদি অনেক নাটক।

আমাদের পাড়ায় একটি ভাল নাটকের দলও ছিল। নাম 'নবদর্পণ'। জোছন দস্তিদারের নেতৃত্বে বয়স্করা হইহই করে মহড়া দিতেন। নাটকগুলো অভিনীত হত 'রংমহল' 'বিশ্বরূপা'-তে। না, ওদের নাটক দেখিনি।

যাত্রা হত দুর্গাপুজোর সময়ে। মন্দিরের মাঠে প্যান্ডেল-মঞ্চ করে যাত্রা চলত। দুর্গাপুজো হত মন্দিরের ঘেরা প্রাঙ্গণে। দুর্গাপুজোর দিনকয়েক পরে যাত্রাদল নিয়ে আসতেন সুনীল মুখার্জি। প্রচুর প্রচুর বড় বড় দল যাত্রা করে গেছে এখানে। কম করে তিনদিন তো হতই। একটি করে পালা হত। যাত্রা দেখেছি এখানে।

পাড়ায় এসে দেখলাম একটাই দুর্গাপুজো হয়, মন্দির প্রাঙ্গণে। তারপর চার নম্বর পুকুরের কাছে শুরু হল আলাদা একটা। এরপর হল তিন নম্বর পুকুরের

কাছে, আরেকটা পুজো। এখন তরুণ সংঘ, ভারত চক্র, মন্দির প্রাঙ্গণে, পাঁচ নম্বরে, তিন নম্বর পুকুরের সামনে, চার নম্বর পুকুরের সামনে, আর পোস্ট অফিসের সামনে তরুণ দলের একটা পুজো অর্থাৎ মোট সাত-সাতটা পুজো হয়। দমদম পার্কের দুর্গাপুজো এই মুহূর্তে বিশাল রমরমা।

প্রায় সব বাড়িতেই লক্ষ্মীপুজো হত। তবে আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হত না। মা প্রতিদিন যেমন পুজোটুজো করেন, তেমনই পুজো করতেন। সরস্বতী পুজোও হতো না। কোনও ব্রত-পালনের ব্যাপারই ছিল না।

সন্ধে হলেই ঢং ঢং করে মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজত। অনেক বয়স্ক-বয়স্কারা মন্দিরে বসে সন্ধ্যারতি দেখতেন। এই কালচারটা কিন্তু এই কলোনিতে ছিল। আমার মা মাঝে-মধ্যে মন্দিরে যেতেন। দুর্গাপুজোতেও যেতেন। কিন্তু দিদি ও বোনেরা কেউই দুর্গাপুজোয় অঞ্জলি দিতে যেতেন না। দিদি ও বোনেদেরও পুজোপাঁজি, ব্রত-পালনের আকর্ষণটা প্রায় ছিল না। আমি নিরীশ্বরবাদী ছিলাম বলেই হয়তো ওদের ঈশ্বর বিশ্বাসটা প্রায় ছিল না।

আমি পাড়ার পুজোটুজো থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতাম। যেহেতু ঈশ্বরেই বিশ্বাস করতাম না, তাই কোনও পুজোর সঙ্গে কোনও দিনই যুক্ত থাকতাম না। কিন্তু পাড়ার সকলেই আমাকে ভালবাসতেন। আমার খোঁজখবর রাখতেন, আমায় স্নেহ করতেন। আমিও প্রত্যেকেরই খোঁজখবর নিতাম নিয়মিত। ভালভাবেই জনসংযোগ রক্ষা করতাম। ঈশ্বর বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়তাম না।

পুজো এলেই আমি ঘুরতে যেতাম। পুজো শেষে ফিরে আসতাম। এসেই পাড়ার যাত্রা দেখতাম। প্রতি বছর বন্ধুদের সঙ্গে বারদুয়েক বেড়াতে যেতাম সামনে-দূরে। পুজোর সময় জেনারেল কম্পার্টমেন্টে দস্তুরমতো লড়াই করে ঢুকে পড়তাম। উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যে ছুটে চলা। যেখানে-সেখানে নেমে পড়া। যেখানে-সেখানে খাওয়া শোওয়া। গ্রামগঞ্জ, আদিবাসীদের হাট। ওখানকার মানুষদের সঙ্গে আড্ডা। এই বন্ধুদের দলে ছিলাম আমরা ছ'জন। আমি তপন, গোরা, সিতু, দিলীপ ও বিলাস। পাড়ায় দস্যিপনার সঙ্গী ছিল পাড়ার বন্ধু বাবলু ও দীপক। আড্ডা দেওয়ার আরও একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছিল গত শতকের ছয় ও সাতের দশকে। ওরা সাম্যের স্বপ্ন দেখা তরুণ। এই আড্ডাটা ছিল একদম অন্যরকম।

একবারের ঘটনা। আমরা ছ'জন—আমি, তপন, গোরা, সিতু, দিলীপ ও বিলাস একটা ট্রেনে উঠে পড়লাম। দিলীপের মামা ওড়িশার রাজগ্রামপুরে কাজ করেন ও থাকেন। সেখানকার উদ্দেশেই 'চল' বলে চললাম।

থার্ড ক্লাসে প্রচণ্ড ভিড়ে গুঁতোগুতি করে উঠলাম। চেকার এসে টিকিট চাইতেই

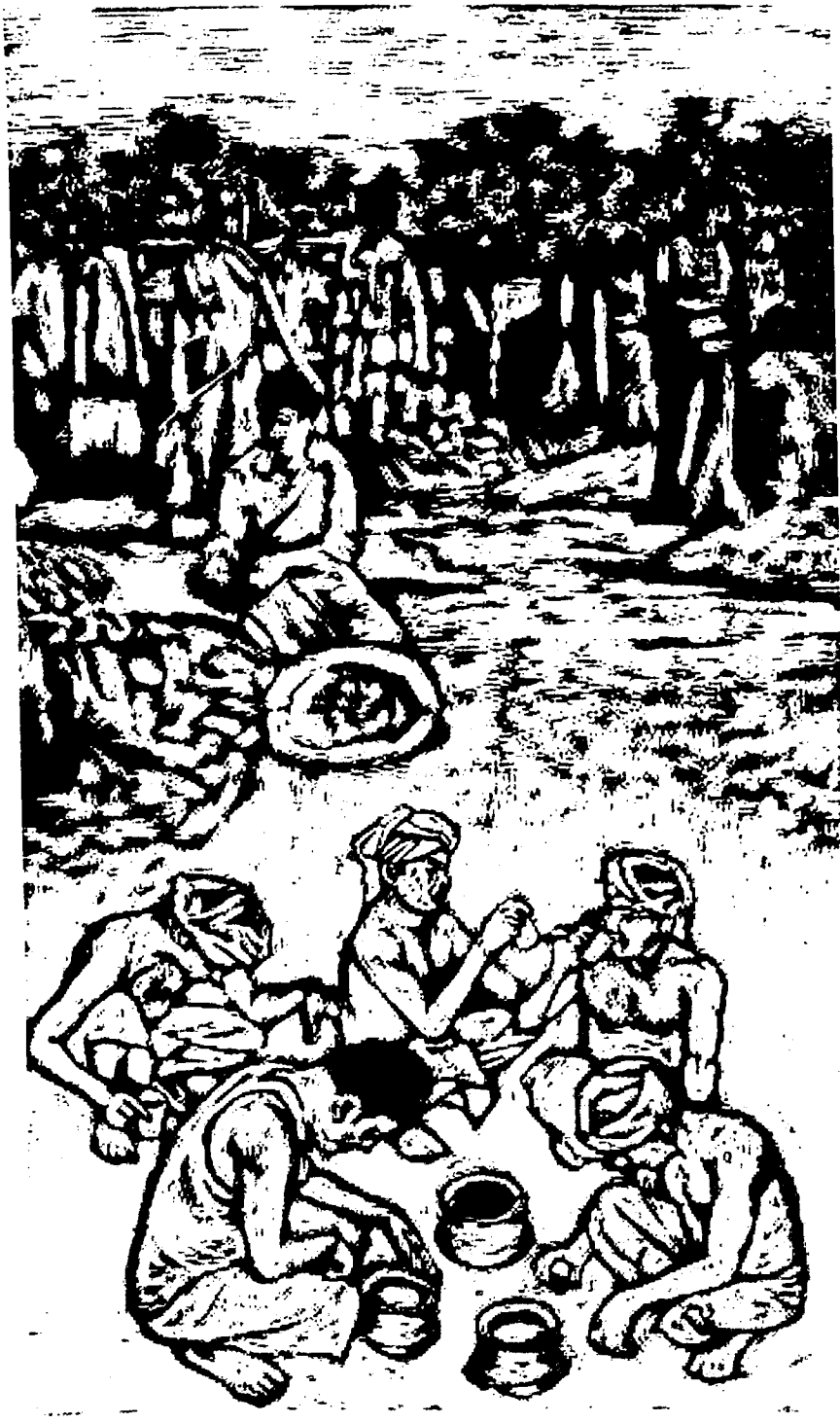

সবাই টিকিট দেখাল। আমার কাছে টিকিট চাইতে আমি পাস দেখালাম। চেকার বলল, থার্ড ক্লাসে কেন? আমি বললাম, এতে আপনার কি অসুবিধে? এই পাসটা আমার বাবা দিয়েছেন। ফার্স্ট ক্লাসের পাস-এ থার্ডক্লাসে যেতে আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছি। শুনে, চেকার চলে গেল।

সপ্তমী পুজোর দিন বিনা নোটিশে হাজির হলাম সেখানে। দিলীপের মামা-মামি বাড়িতেই ছিলেন, বাঁচোয়া। রাতে আশপাশের বাড়ি থেকে পাঁচটি খাটিয়া জোগাড় করে বাইরেই পেতে দিলেন। আমরা ছ'জন সেখানেই শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে লুচি-আলুর দম খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম হাট দেখতে। ভালুলতা হাট। ঘণ্টাখানেক হেঁটে ভালুলতায় পৌছলাম।

এখানে ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই আদিবাসী। তাড়ির আসর বসেছে। আনাজপাতি বলতে প্রায় কিছুই নেই। একটা লাউ, দুটো কুমড়ো এরকম। মুরগির খোঁজ করে মুরগিই পেলাম না। সস্তার শাড়ি, চুড়ি, মেটে সিঁদুর এসব নিয়ে বসেছে সবাই। কিন্তু মুরগির কোনও হদিশ নেই। ব্যর্থ মনোরথে ফিরছি। ফেরার পথে আশপাশের গ্রামে মুরগির হদিশ করলাম। একজন আদিবাসী বৃদ্ধা একটা বড়সড় মুরগি দিলেন। কিছুতেই দাম নিলেন না।

ফিরে এসে সেই মুরগিটাই কেটেকুটে আমরা আটজনে খেলাম।

আমাদের দমদম পার্কের বাজারের সামনের মাঠে বসত গাজনের মেলা। মেলায় বসত ছোট সার্কাস, মাকড়সা কন্যা, রাইফেল শুটিং-এ বেলুন ফাটানো, কাঠের নাগরদোলা, ছোট ঘূর্ণি ইত্যাদি খেলা ও মজা করার বিষয়। আর নানারকম খাবারের দোকান, খেলনার দোকান, ইমিটেশনের গহনার দোকান, টুকিটাকি বাসনপত্রের বা ঘরোয়া জিনিসপত্রের দোকানও বসত। প্রচুর ভিড়ও হত। মেলা চলত দিন পাঁচেক।

মেলায় চড়ক ঘোরানো হত। পিঠে বঁড়শি না ফুঁড়িয়ে পেটের সঙ্গে গামছা বেঁধে চড়কে ঘুরত।

অক্টোবরেই হত দুর্গাপুজো আর সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখ হত বিশ্বকর্মা পুজো। বছরের নির্দিষ্ট দিনে একটি মাত্র পুজোই হয়, তা হল বিশ্বকর্মা পুজো। বিয়ের পর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সীমা কলেজ থেকে ফিরে রাতের রান্নায় সাহায্য করে সেজেগুজে আমার সঙ্গে বেড়াত বিশ্বকর্মা ঠাকুর দেখতে। পরনে থাকত একটা সাড়ে দশ টাকার শাড়ি। আমরা শ্যামনগর রোড দিয়ে হাঁটতে থাকতাম যশোর রোডের দিকে। রাস্তার বাঁ পাশে সারি সারি ছোট ছোট কাপড়ের মিল। প্রতিটা মিলেই বিশ্বকর্মা পুজো হত। সেই ঠাকুর দেখতে রডকলের পুজোয় যেতাম। রডকলের পুজো বিরাট বাজেটের। এখন যেটাকে বলা হয় ডায়মন্ড প্লাজা, সেটা পুরোটা নিয়েই ছিল রডকল।

রডকলের লেবার-কনট্রাক্টর আমাদের দু'জনকে আপ্যায়ন করে বসিয়ে প্রচুর খাওয়াতেন। এই লেবার-কনট্রাক্টর মাঝে-মাঝেই আমাদের দমদম পার্কের বাড়িতে এসে হিন্দ সিনেমা হলের চার-পাঁচটা পাস দিয়ে যেতেন। কারণ তিনি ছিলেন হিন্দ সিনেমা হলের মালিক। আমার বিয়ের অনেক আগে থেকেই এই টিকিট দিতেন।

মিনি সার্কাসটা চলত দিন পনেরো। মানুষই নানা ধরনের খেলা দেখাত। ব্যালান্সের খেলা ও নানান জিমন্যাস্টিকের খেলা হত। আসতেন মনোহর আইচ। তিনি মাস্‌ল কন্ট্রোল দেখাতেন। দেহটা যেন খোদাই করে বানানো। সবকটা পেশি প্রস্ফুটিত হত ওনার কসরতে। ওনার এক শিষ্য রামদুলাল ব্যানার্জি ওয়েটলিফটিং করে দেখাতেন। ঘুরে ঘুরে এসব দেখতাম, আমরা বন্ধুরা।

অধ্যায় : সাত

পাড়ার চিকিৎসকেরা

আমাদের অসুখ-বিসুখ হলে ডাক্তার বলতে নাগেরবাজারের কল্যাণ সেনগুপ্ত। নাগেরবাজার মোড়ে ওনার চেম্বারের খুব নাম। 'কল' দিলে নিজেই গাড়ি চালিয়ে আসতেন।

বড় রোগের ক্ষেত্রে যেতে হত হিমাংশু ডাক্তারের কাছে। অবশ্য বড় রোগ হতই না।

কাছাকাছি ওষুধের দোকান বলতে একটি। যশোর রোডে দমদম পার্কের উল্টোদিকে লাহা মার্কেটে 'পার্ক মেডিকেল'। তিনভাই বসতেন দোকানে। মেজ ভাই আমার বয়সি, বরুণ কুণ্ডু। ওর বাবা ছিলেন এল এম এফ ডাক্তার। তিনি দোকানে প্রতিদিনই বসতেন। ওটাই ওনার চেম্বার।

পাঁচ নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে একটা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। সেখানে বিনে পয়সায় আয়রন, ভিটামিন ইত্যাদির ট্যাবলেট দেওয়া হত। একজন মহিলা ডাক্তার এবং তাঁর দু'জন অ্যাসিস্টান্ট ছিলেন সেখানে। অ্যাসিস্টান্ট ছিলেন জবাদি ও আরেকজন হল নারায়ণ চক্রবর্তী।

এই নারায়ণ চক্রবর্তী থাকত আমাদের দুটো বাড়ির পরে। আমার সমবয়সি। আমার কাছে প্রতিদিন কবিতা পড়ে শোনাতে আসত। সবই ওর লেখা কবিতা। প্রায় এক-দেড় ঘন্টা সময় নষ্ট। মাথা গরম হয়ে যেত। তারপর একদিন 'আমার লেখা' একটা কবিতা পড়ালাম ওকে। ও সেটা দেখে, কেটেছেঁটে বোঝাল কোথায় কোথায় আমার ভুল হয়েছে। বললাম, এটা বিষ্ণু দে-র জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাওয়া 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' নামের কবিতা।

এতে প্রতিদিনের উৎপাতটা বন্ধ হল কিন্তু বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়নি।

এই নারায়ণ, সুনীল মুখার্জির মেয়ে শেলীকে পড়াত। একদিন ও আমাদের বাড়িতে এল। আমাকে ডাকল। আমাদের বারান্দায় একটা বেঞ্চি থাকত, সেই বেঞ্চিতে দু'জনে বসলাম। নারায়ণ পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে দিল। চিঠিতে ভুরভুর করছে সুগন্ধ। বলল, শেলী আমাকে এই প্রেমপত্রটা দিয়েছে, পড়ে দেখ।

একগাদা ভুল বানানে ভরা একটা গদগদ প্রেমপত্র। চিঠিটা ফেরত দিয়ে বললাম, হ্যাঁ পড়লাম, তুই কী বলতে চাস?

—সেইজন্যই তো এলাম। কী করি বল তো?

বলেছিলাম, তুই কি স্থায়ী কোনও চাকরি করিস?

ও মলিন মুখে বলল, না।

—তাহলে শেলীর স্বপ্ন ভুলে যা। আর শেলীকে পড়াতে যাস না। সুনীলদা তোর হাত-পা ভেঙে শেষ করে দেবে।

শেলীর ভূত ছাড়তেই, ওর মাথায় কবিতার ভূত চাপল। তারপর নিজের লেখা কবিতা শোনানোর জন্য পাকড়াও করল স্বপনকে। সে থাকত হাইস্কুলের কাছে ভাড়া। সেও আরেক কবি।

এরপর, সেই স্বপন কবিতা শোনাত নারায়ণকে, নারায়ণও কবিতা শোনাত স্বপনকে।

শেষে নারায়ণ কাজ পেল ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে।

পাড়ার ডাক্তার বলতে বিশিষ্ট ডাঃ দীপক চন্দ্র। চার নম্বর পুকুরের শেষ প্রান্তে থাকতেন। এফ আর সি এস ছিলেন। বিশাল নাম। অস্থি বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাংলা-জোড়া নাম। পাড়ার ইয়ংদের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতেন। আমার সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল প্রায় বন্ধুর মতো। রাজনীতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হত আমাদের। ইন্দিরা গান্ধী '৭৭-এ যখন হারলেন তখন আমাদের সঙ্গে প্রচুর ঘুরেছেন এবং আমাদের জাল ভোট দেওয়া দেখে আনন্দ পেয়েছেন। আমাদের গাড়ি এক-একটা ভোট কেন্দ্রে পৌঁছত। গাড়ি থেকে নামতাম আমি, দীপকদা, আশু মুখুজ্যে, সুনীল মুখুজ্যে। আমরা যেতেই স-সম্মানে বুথে নিয়ে যেত আর গোছা গোছা কাগজে আমরা ঝপাঝপ ছাপ ফেলতাম। তারপর ব্যালট বক্সে ফেলে দিয়ে চলে যেতাম পরের বুথে।

দীপকদা, আমরা ইন্দিরা গান্ধীর ভোটের বিরুদ্ধে ঝপাঝপ ছাপ দিতাম।

এমন বেয়াড়া ভোটই বোধহয় ইন্দিরাকে হারিয়েছিল।

ডাঃ তরুণ পালচৌধুরি। এমবিবিএস গোল্ড মেডেলিস্ট। থাকতেন তিন নম্বর পুকুরের কাছে। পরে ওনার প্যারালাইসিস হয়ে যায়। প্রচুর রোগী যেত ওনার কাছে। দোতলা বাড়ির একতলাতে পেশেন্ট দেখতেন হুইল চেয়ারে করে। একবার আমার বউয়ের গালে একটা ঘা-এর মতো হল। সে আর সারে না। পার্ক মেডিকেলের বরুণের বাবাকে দেখালাম। ডাঃ নীলকৃষ্ণ চৌধুরিকেও দেখানো হল। কিছুতেই সারল না। এবার ডাঃ তরুণ পালচৌধুরিকে দেখালে তিনি ওষুধ দিলেন।

বললেন, কখনওই ডেটল লাগাবেন না! লাগলেই অ্যালার্জিটিক ঘা হবে। দিন সাতেকের মধ্যেই বউ-এর 'ঘা-মুক্তি' ঘটল।

একবার তখন আমি দমদম পার্ক ছেড়ে এসে দেবীনিবাসে ভাড়া থাকি। আমার ছেলে পিনাকী খুবই ছোট। বয়স বছর পাঁচ। ওর কোনও অসুখ-বিসুখ হলে যেতাম শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ তীর্থঙ্কর দত্তর কাছে। লেকটাউনে বসতেন।

পিনাকী অনবরত বমি করে যাচ্ছে। ডাঃ দত্ত ওকে দেখে প্রেসক্রিপশনের বারদুয়েক পরিবর্তন ঘটালেন। কিন্তু, অবস্থার কোনও উন্নতি হল না। আবার দৌড়লাম ডাঃ দত্তর কাছে। তিনি বললেন, দেখি প্রেসক্রিপশনটা। আমি দিলাম।

তিনি বললেন, অন্য কোনও ডাক্তার দেখান, আমার কিছু করার নেই।

আমি প্রেসক্রিপ্শনটা ওনার হাত থেকে নিতে যেতেই, উনি সেটা দলামোচা করে মুখে পুরেই খেয়ে ফেললেন।

আমি ওঁকে কয়েকটা বাছা বাছা খিস্তি দিয়ে ফেরার পথে এলাম ডাঃ হিমাংশু চক্রবর্তীর কাছে।

হিমাংশু চক্রবর্তী ছিলেন বাংলার বিখ্যাত মেডিসিনের ডাক্তার। কথায় কথায় হিমাংশু ডাক্তারের কাছে তো আর যাওয়া যায় না। কিন্তু এই অবস্থায় যেতে বাধ্য হলাম। সেদিন আবার হোলি।

তিনি সমস্ত শুনে, পায়জামার ওপর একটা ফুলপ্যান্ট পরলেন। আমাকে নিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে বেরোলেন।

আমার বাড়িতে এসে পিনাকীকে দেখে ওষুধ দিলেন। চারঘণ্টা ঠায় রোগীর পাশে বসে থেকে ওর অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করে ওষুধ পাল্টে দিতে থাকলেন।

শেষে একসময় বললেন, আর ভয় নেই। নরম আইসক্রিম খাওয়াতে পারো, কোনও চিন্তা নেই। বিপদ কেটে গেছে। দরকার হলে একটা ফোন কোরো।

ফিস্ কত দেবো জিজ্ঞাসা করাতে কিছু নিলেন না।

এত দরদি চিকিৎসক খুব কমই দেখেছি। খুব কম ওষুধ দিতেন।

আমাদের পাড়ায় আর একজন ডাক্তার থাকতেন দু'নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে। ডাঃ নীলকৃষ্ণ চৌধুরি। তিনি এমবিবিএস। ছোট্ট একটা চেম্বার ছিল গ্রে স্ট্রিটে।

কোনও ডাক্তার আমাদের পরিবারের কাউকে ইঞ্জেকশন নেবার কথা বললে, নীলকৃষ্ণ বাবুর স্ত্রীকে খবর দিতাম। তিনি এসে ইঞ্জেকশন দিয়ে যেতেন। ওই মহিলা প্রচুর বকবক করতেন।

ঘটনাচক্রে ওঁনার নাতনিই আমার পুত্রবধূ।

অধ্যায় : আট

আমাদের এনজয়মেন্ট

সুনীল মুখার্জির সময়েই কেষ্টপুর কলোনির নাম হয়ে গেল 'দমদম পার্ক'। এটা ছিল একটা জলা অঞ্চল। পাঁচটি পুকুর কেটে নিচু জমি ভরাট করে গড়ে উঠেছিল কেষ্টপুর কো-অপারেটিভ রিফিউজি কলোনি।

বিধানচন্দ্র রায়ের সময়ে বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস উদ্বাস্তু মধ্যবিত্তদের জন্য এই রিফিউজি কলোনির জমিটা অ্যালট করিয়েছিলেন। পুকুর কেটে নিচু জমি ভরাট হল। রাস্তা হল। ইট ভেঙে তার ওপর রোলার চালিয়ে সমান করা রাস্তা। পরে হল পিচের।

প্রত্যেকেই কাঠা পিছু নগদ দাম ধরে দিয়ে জমি কিনলেন। বাড়ি বানালেন।

'৬৬ সাল পর্যন্ত ভিআইপি রোড হয়নি। তাই সেদিকটা ফাঁকা রাজারহাট ও সল্টলেক অঞ্চল। এখন ভিআইপি রোডে যেখান দিয়ে উঠি সেখানে ছিল একটা লাল দোতলা বাড়ি। নাম লালকুঠি।

ভরাট হওয়া জমি বিক্রি হচ্ছে চারশো টাকা প্রতি কাঠা দরে। তা-ও অনেকে জমি কেনেনি, বালির ওপর বাড়ি বানালে বাড়ি ধসে যাবার আশঙ্কাতে।

এই জলাভূমি ভরাট হওয়া দেখতে যেতাম। নৌকো করে জলাভূমিটা ঘুরতাম। খুব সামান্য পয়সা নিত মাঝিরা। ছোট ছোট নৌকো ভাড়া নিতাম। আমরাই দাঁড় বাইতাম। মজা করতাম। জলের উপর ভাসমান ছোট নৌকাতে হারিয়ে যেতাম জল ও আকাশের বিশালত্বের ভিতর।

বাগজোলা খালের দক্ষিণ দিকে গড়ে উঠছে বাঙ্গুর কলোনি। এখনকার ভিআইপি রোডের কাছেই বাড়ি করেছিলেন বিখ্যাত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর বাড়ির উল্টোদিকে পূর্ণেন্দু পত্রীর বাড়ি। লেখকদের মধ্যে প্রাবন্ধিক ক্ষেত্র গুপ্ত বাড়ি করেছিলেন বাঙ্গুরে যশোর রোডের কাছাকাছি। আর বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ-এর মুখটাতে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতেন চিত্রকর গণেশ হালুই।

বাংলাদেশের গোলমালের সময়ে এখনকার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারা সপরিবার উঠেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রীর বাড়ির কাছে।

সময়টা ১৯৬৭-'৭০। বাঙ্গুরে সরকারি এল থ্রি সি বাসের প্রবর্তন করলাম আমরা ক'জন মিলে। টার্মিনাস হল খাল পাড়ে। দমদম পার্কে ও বাঙ্গুরে ঢুকতে হলে এই বাসস্ট্যান্ডেই নামতে হত। বাসে লাইন দিয়ে উঠতে হত। সিট ভর্তি হলে তখন দাঁড়িয়ে যাওয়ার লোক উঠত। প্রতিমাসে সেরা ড্রাইভারকে পুরস্কার দেওয়া হত ওই বাস টার্মিনাসেই অনুষ্ঠান করে। দমদম পার্ক ও বাঙ্গুরের লোকেদেরও সুবিধে হয়েছিল এর জন্যে।

বাঙ্গুরে একটা বাড়ির একতলায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে 'দমদম আর্ট ক্লাব' তৈরি করলাম আমরা। চিত্রকর গণেশ হালুই, এল পি শিকদার, দমদম পার্কের কল্যাণ সেন, সাধন সেন, গ্রিনপার্কের মাখন ব্যানার্জি-রা ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। আমি ছিলাম সম্পাদক। সপ্তাহে রবিবার ছবি আঁকা শেখানো হত। ছবি আঁকায় এগিয়ে থাকা মানুষরা যুক্ত হলেন।

শক্তি বর্মন থাকতেন ফ্রান্সে। তিনি 'খাদিম'-এর প্রতিষ্ঠাতা সত্য বর্মনের ভাই। পৃথিবী বিখ্যাত আর্টিস্ট হলেন শক্তি বর্মন। প্রতি বছর অন্তত একবার ভারতে আসতেন। শক্তিদার বাড়ি ছিল বাঙ্গুর অ্যাভিনিউতে। আমাদের আর্ট ক্লাবে আসতেন। জমিয়ে আড্ডা দিতেন আমাদের সঙ্গে। সত্য বর্মনও আমাদের আড্ডা, তর্ক-বিতর্কে যুক্ত হতেন।

আমাদের ক্লাবে জয়া বর্মনও ছবি আঁকা শিখত। বড় হয়ে সে অ্যাকাডেমি পুরস্কার পায়। পরে যুক্ত হলেন রামপ্রসাদ ঘটক।

আমরা আউটডোর করতে অনেক জায়গায় যেতামও। বছরে একবার এক্সিবিশন হত। নির্ভেজাল এক আনন্দময় ও সৃষ্টিশীল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

আমাদের আড্ডা বসত 'আর্ট ক্লাবে' কখনও বা গণেশ হালুইয়ের বাড়িতে। গণেশদা সল্টলেকে বাড়ি করে চলে গেলেন। সেখানেও আড্ডা হত। আমাদের আড্ডায় গণেশদার বউ ডলি বউদি চা জোগাতেন। আর, একমাত্র মেয়ে ছিল টুকটুকি।

গণেশ হালুই ছিলেন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের অধ্যাপক। পেইন্টার হিসেবে ভারত-জোড়া নাম। থাকতেন বাঙ্গুরে ঢুকেই ডানহাতের একটা বাড়িতে। টকটকে রং, নরম-সরম চেহারা, মাঝারি উচ্চতার। অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের। কিন্তু আদর্শের ব্যাপারে সাংঘাতিক কঠোর।

বউদি ডলিও খুব ফরসা, সুন্দরী; একটু মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখ। আমাকে খুব ভালবাসতেন।

গণেশদা ছিলেন আমাদের দমদম আর্ট ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ। 'অজন্তার গুহাচিত্র'গুলো নষ্ট হওয়ার পর, গণেশদা ওই চিত্রগুলোকে উদ্ধার করেন। আসল অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। চিত্রগুলোর রং হত ন্যাচারাল

কালারে অর্থাৎ সোনার রং সোনা দিয়ে, রুপোর রং রুপো দিয়ে। গণেশদার বাড়িতে আর্টিস্ট অমরেন্দ্রলাল চৌধুরি ও লালুপ্রসাদ সাউও আসতেন। ওদের সঙ্গেও প্রচুর আড্ডা দিতাম। আসতেন শক্তি বর্মনও।

একবার গণেশদার বাড়িতে ডাকাতি হল। তখন তিনি সল্টলেকে থাকেন। গিয়ে দেখলাম, অমরেন্দ্রলাল চৌধুরি হাজির। তিনি ডাকাতির ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ শুনলেন। শেষে বললেন, ওদের একজনকে ধরলে সব ফিরে পাওয়া যেত। ধরা উচিতও ছিল।

গণেশদা বললেন, ওদের হাতে বোমা ছিল। যাবার সময় বোমা ফাটিয়ে গেছে।

অমরেন্দ্রদা বললেন, বোমা ছুড়লেই এমনি করে ক্যাচটা টেনে নিতাম। লুফে নিয়ে পাল্টা ওদের দিকে ছুড়তাম।

অমরেন্দ্রদার ভাট গল্প শুনতে ভাল্লাগছিল না। টুকিটুকি আনন্দে হইহই করে নেচে বেড়াচ্ছে, ওদের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে—কী আনন্দের ব্যাপার!

এই দমদমে আর্ট কলেজেই প্রতি রবিবার ছবি আঁকা শেখাতেন মাখন ব্যানার্জি। চাকরি করতেন ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে। ড্রইং-এ হাত ছিল অসাধারণ। মাখন ব্যানার্জি প্রতিদিন ভোরবেলা হলে হাফপ্যান্ট পরে হাঁটতে বেরোতেন। কালিন্দী থেকে হেঁটে সল্টলেকে ডলি বউদির বাড়ির পাশ দিয়ে যেতেন রোজ। একবার অন্তত ডলি বউদিকে দেখা চাই-ই চাই। উনি বোধহয় ডলি বউদির প্রেমে পড়েছিলেন। এমনটাই মনে করতেন ডলি বউদি।

আমাদের পাড়াতেও বাড়ি তৈরি হচ্ছে। লোক আসছে। গাড়ি হচ্ছে অনেকের। রিকশা স্ট্যান্ডে রিকশা থাকছে। একটা সিনেমা হল হলো 'শেলী' আমাদের বাসস্ট্যান্ডের কাছেই।

তার আগে কাছাকাছি সিনেমা হল বলতে 'মৃণালিনী'। ভাল সিনেমা এলে ওই হলেই আমরা, বন্ধুরা মিলে দেখতে যেতাম। মিনিট পঁয়তাল্লিশের পথ। হেঁটেই যেতাম। কখনও বা আমরা পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে এসপ্ল্যানেডে সিনেমা দেখতে যেতাম। মেট্রো, লাইটহাউজ ও শ্যামবাজারের টকি শো হাউজ। ওইসব হলগুলোতে ইংরেজি সিনেমা হত। তখন সিনেমাকে বায়োস্কোপ বা বই বলা হত।

থিয়েটার দেখতে যেতাম স্টার, রংমহল, বিশ্বরূপা মিনার্ভা-তে। উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, ছবি বিশ্বাস নাট্যমঞ্চে অভিনয় করতেন। দেখতাম। ছবি বিশ্বাসের নাটক বেশিদিন দেখতে পারিনি। কারণ, '৬২-তেই তিনি মারা গেলেন। তবে, অন্য সকলের অভিনীত নাটক উপভোগ করতাম। গ্রুপ থিয়েটারের নাটক আরও ভাল লাগত।

পরে আমি একাও থিয়েটার দেখতে যেতাম মিনার্ভাতে। ওখানে অভিনীত প্রায় সব নাটকই দেখেছি। সেগুলো আর ভাল লাগত। অ্যাকাডেমিতেই অনেক নাটক দেখেছি। উৎপল দত্ত ও শম্ভু মিত্রের অনেক নাটক দেখার পরেও মনে হয়েছে, শম্ভু মিত্রের স্কুলিং-এর ছাত্রছাত্রীরা সবাই একটু 'নাকি' গলায় উচ্চারণ করতেন। আর, সমীর মজুমদার, ইন্দ্রজিৎ সেন-রা উৎপল দত্তের স্কুলিং-এ বড় হয়েছেন। এরা ছিলেন নকশাল মনোভাবাপন্ন। নকশাল আমলের প্রগতিশীল নাটকও এখানকার হল-এ দেখেছি। ব্যাঙ্কে চাকরি পাওয়ার পর একজন ম্যাগাজিন বিক্রি করতে আসতেন আমাদের অফিসে। ঘোষাল দা। মানসিকভাবে নকশাল। আমাকে প্রগতিশীল নাটকের পোস্টকার্ড দিয়ে যেতেন। ভালবেসেই দিতেন। কারণ, আমার বাচনভঙ্গি ও চরিত্রটা নাকি ওনাকে খুব টানত। এভাবে প্রচুর প্রগতিশীল নাটক দেখেছি।

বোনেদের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যেতাম উত্তর কলকাতার থিয়েটার হলগুলোতে। এই নাটক দেখে দারুণ এন্‌জয় করতাম। নকশাল আমলের নাটকগুলো দারুণ লাগত। বোনেদের সঙ্গেই স্টার, রংমহলে যেতাম। আর বন্ধুদের সঙ্গে যেতাম গ্রুপ থিয়েটারের নাটক দেখতে মিনার্ভাতে। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, ঊষা গাঙ্গুলি, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, চন্দন সেন, অশোক মুখোপাধ্যায় এঁদের প্রায় প্রতিটি নাটকই দেখেছি, এঁদেরই খোলা আমন্ত্রণে।

এন্‌জয় পাড়াতেও হত। পাড়ার কোনও বিয়ে হলেই আমার বয়সি আট-দশজন পাড়ার বন্ধুরা বিনা নেমন্তন্নে বিয়েবাড়িতে ঢুকতাম। রীতিমতো ধোপদুরস্ত পোশাক পরে যেতাম। নিজেদের জামাকাপড় নিজেরাই কাচতাম, নিজেরাই ইস্তিরি করতাম।

একবার, পল্টুদার বিয়েতে খুব মজা হয়েছিল। পল্টুদা বড় মাছ শিকারি। কাজ কী করতেন জানি না। তবে অবস্থা খুব ভাল ছিল তাঁর। থাকতেন দু'নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে। তাঁর বিয়েতে (বউভাত) এলাহি আয়োজন, সাজানো প্যান্ডেল। মাইকে সানাই বাজছে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি, গমগম করছে পরিবেশ। খাবারের গন্ধে 'ম ম' চারপাশ। লোকজন আসছে। ভিড় বাড়ছে। আমরাও যথারীতি গুটিগুটি পরপর ঢুকছি। আমাদের দেখেই পল্টুদা বললেন, যা খেতে বসে যা। তোদের নেমন্তন্ন করতে ভুলে গেছি বলে লজ্জা পাস না।

এই ঘটনার পর থেকে বিনা নেমন্তন্নে অনুষ্ঠান বাড়িতে খাওয়া আমার বন্ধ হল।

তখন বিয়েতে পরিবেশনের দায়িত্ব থাকত পাড়ার ছেলেদের উপর। কোমরে গামছা বেঁধে পাড়ার ছেলেরাই তা করত। খাবার টেবিল বলতে কাঠের লম্বা

তক্তা। পাতা হত কাঠের ফোল্ডিং করা স্ট্যান্ডে। এর ওপরে কলা পাতার পাত। চেয়ার হত কাঠের ফোল্ডিং চেয়ার, লগবগ করে। আর, রান্না করত ঠাকুররা। উনুন জ্বালিয়ে বিশাল বিশাল হাঁড়ি, কড়াই-এ রান্না চলত। বালতিতে করে পাতে পাতে পরিবেশন হত ভাত, ডাল, লাবড়া, ঘ্যাঁট, ভাজা, মাছ, মাংস, চাটনি, রসগোল্লা ইত্যাদি। বাসন-কোসনের আওয়াজ, হামানদিস্তার ঘটংঠং, শিলনোড়ার আওয়াজ, রান্নার শব্দ, হাঁকাহাঁকি—সে এক অদ্ভুত কনসার্ট। রান্নার গন্ধে 'ম ম' করত চারিপাশটা। মাইকে সানাই বাজত। কারও বা নহবৎ গেট হত। গেটে আট-দশ ফুট উপরে থাকত—সুসজ্জিত মাচা। ছাউনিটা মন্দির বা মসজিদের আকারে। ওই মাচায় বসে সানাই-এ নহবৎ বাজাতেন বাজিয়েরা। এছাড়াও বাংলা আধুনিক বা সিনেমার গান বাজত। তখনও হিন্দি গানের দাপট এসবে ছিল না। পাড়ার বিয়েতে সাহেবি কেতাও দেখিনি। ফুলে সুসজ্জিতা হতেন মহিলারা। পারফিউমের গন্ধ উড়ত বাতাসে। সবই ছিল সহজ সরল। জগঝম্প ব্যাপার অনুপস্থিত।

পাড়ায় কেউ মারা গেলে পোড়াতে যাওয়ার লোকের কোনও অভাব নেই। মৃতদেহ বহন করা হত সস্তার খাট কিনে। তাতে দুটো বাঁশ দু'ধারে বেঁধে লোকেরাই বহন করত। লরিতে মৃতদেহ বহনের প্রচলন ছিল না। খাটে মৃতদেহকে দড়ি দিয়ে ভাল করে বাঁধা হয় যাতে পড়ে না যায়। বাহকরা হেঁটে না বলে বলা ভালো প্রায় দৌড়ত মড়া কাঁধে নিয়ে। এতে ভারটা লাঘব হত। একটা কাগজের ঠোঙা থেকে খই এবং খুচরো পয়সা একসঙ্গে ছুড়তে ছুড়তে 'বলো হরি, হরি বোল' ধ্বনি দিতে দিতে শবযাত্রীরা চলে শ্মশানের পথে। উড়ে 'অগুরু' আতরের গন্ধ এবং ধূপকাঠির ধোঁয়া। ওই গন্ধটাই শবের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। পোড়ানো হত কাঠের চুল্লিতে। চুল্লি বানাত ডোমেরা।

যখন কলেজ ছাড়ি ছাড়ি করছি, তখন থেকে আমি মড়া পোড়াতে যেতাম না। শ্রাদ্ধ বাড়িতেও যেতাম না। কোনও পৈতের অনুষ্ঠানে যেতাম না। শালগ্রাম সাক্ষী রাখা বিয়েতেও যেতাম না। কারণ, এই জাতীয় কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করতাম না।

আমার বাবার মৃতদেহ নিয়ে সমস্ত আত্মীয়স্বজন শ্মশানে গেলেন। আমি যেতে বাধ্য হলাম। কিন্তু একমাত্র ছেলে হয়েও মুখাগ্নি করিনি। অশৌচ পালন করিনি। শ্রাদ্ধ করিনি। কারণ আমার প্রত্যয় ছিল—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ।

বিয়ে

১৯৬৮ সালের ২১ নভেম্বর সীমা ঘটকের সঙ্গে আমার রেজিস্ট্রি বিয়ে হল তাড়াহুড়ো করে দুই দিদির বিয়ের আগেই আমার বিয়েটা সারতে হল। আমার

উপর পার্টির নির্দেশ ছিল বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে স্টাডি ক্লাস করানোর। ডেব্‌রা, গোপীবল্লভপুর, কৃষ্ণনগর, দেওঘর, গিরিডি, দুমকা—এই সমস্ত জায়গায় আমাকে যাওয়ার নির্দেশ দিল। কিন্তু নিরস্ত্র অবস্থায় গেলেও পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারের ভয় ছিল। তাই সীমাকে নিয়ে এসমস্ত জায়গাগুলো ঘুরলে এবং বিয়ের সার্টিফিকেট দেখালে পুলিশি হ্যারাসমেন্ট এবং চিন্তাটা কমে যায়।

নির্দেশমতো বিনা অস্ত্রেই ঝাড়া হাত পায়েই বেড়াতাম, সঙ্গে থাকত সিগারেট আর দেশলাই। জ্বলন্ত সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে সিগারেটটা কোনও মানুষের চোখে বা গলাতে চেপে ধরলে কী হয় সেটা আমি জানতাম।

আমার শারীরিক ক্ষিপ্রতা ছিল অত্যন্ত ভাল। আর, বল ঝুলিয়ে ঝুলন্ত বলে পাঞ্চ করে করে লক্ষ্যভেদ করতে পারতাম বারবার।

আমার প্রয়োজন ছিল সাহসী, স্মার্ট মেয়ের। সীমার সেসব গুণ ভালই ছিল। সেটাই ছিল ওর প্রতি আমার আকর্ষিত হওয়ার কারণ।

ঘরের কথা

'৬৬-র পর ভিআইপি রোড গড়ে উঠতেই কলোনিটা শহুরে চেহারা নিতে শুরু করল। জমির দর চড়চড় করে বাড়তে শুরু করল। ৪০০ টাকা কাঠা জমি এখন তো ২৫/৩০ লাখে পৌঁছেছে।

এখানে বাবা তিনটি প্লট কিনেছিলেন। একটাতে আমরা থাকতাম। আর দুটো ছিল ফাঁকা। ফাঁকা জমি দুটো বাবা বিক্রি করে দিলেন মেয়েদের বিয়ের সময়ে, বিয়ের খরচ জোগাতে।

দোতলায় একটা ঘর ও বাথরুম তুলেছিলাম আমি। বিয়ের পর একতলার আধখানা ঘরে তিনজনের থাকতে অসুবিধা হচ্ছিল। ধার দেনা করে দোতলার ঘরটা তুললাম।

বিয়ের পর সীমা শ্যামনগরের সারদা মিশন কলেজে ভর্তি হল। এগারোটায় ওর ক্লাস শুরু হয়। ন'টায় আমি অফিস বেরোই। সীমা তার মধ্যেই আমাদের জন্য রান্না করে ফেলে। সন্ধেবেলায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে রেওয়াজ করে। পল্লিগীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। সুরেলা গলা। ভালই গায়। রেডিওতেও গান গায়। ওর গান পরে কাজে লেগেছিল যুক্তিবাদী আন্দোলন শুরুর সময়ে।

তখন অনুষ্ঠানের শুরুতে ও গান করত। একটু জনসমাগম হলে আমি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান শুরু করতাম। ছেলে পিনাকী থাকত আমার সহকারী হয়ে। পরে সেও খেলা দেখাত।

আমি সবার আগে বিয়ে করায় বড়দি আমার উপর খুব চটে ছিলেন। আমার

বিয়ে করার কারণটা 'মা'-ই শুধু জানতেন। আমার বিয়ের পরে বড়দি রমা ওরফে মিনার বিয়ে হয়েছিল। বড়দি বাবার ওপরেও প্রচণ্ড খেপে থাকতেন, বাবা ওর বিয়ে দিচ্ছেন না বলে। পরে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কলকাতায় টেলিফোন ভবনে চাকরি পেলেন বড়দি। ক্লার্কের পদ। সরকারি চাকরি। তাই বিয়ের জন্য পাত্রের অভাব নেই।

প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত একটি পাত্র পাওয়া গেল। থাকতেন যাদবপুরে। ওখানের কলোনিতে একটা বাড়ি বানিয়েছিলেন পাত্ররা তিনভাই মিলে। বড়দির বিয়ে হতে আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আমি তখন দমদম আর্ট ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ছবি ভালই আঁকি। আমার আঁকা দুটো পেইন্টিং টাঙানো ছিল বৈঠকখানা ঘরের দেওয়ালে। বড়দি ছবি দুটো বিদায় করে দিলেন। ওর অফিস যাওয়ার সময়ে বাড়ির সবাই তটস্থ থাকত। কেউ চুল বেঁধে দিত, কেউ হাতের সামনে ব্যাগ গুছিয়ে দিত। দিদি সবসময়ে ছন্‌ছন্‌ ছন্‌ছন্‌ করতেন।

আমার ওপরের বোন আরতি ওরফে ডলি হলেন মেজদি। আমার চাকরি পাওয়ার পরে তিনি পাড়ার শিশু বিদ্যাবীথিতে টিচার হিসেবে ঢুকলেন। ওকে দেখতে যেসব পাত্রপক্ষ আসতেন, জানতে চাইতেন, কোনও অসুখ বিসুখ আছে নাকি, কারণ খুবই রোগা ছিলেন। বহু পাত্রপক্ষ ওকে দেখে গেছে। শেষে বিরক্ত হয়ে মেজদি বললেন, আর বিয়ে করবেন না।

এখনও তিনি 'ব্যাচেলার'ই আছেন। তিনি বড়দির মতো আমার সঙ্গে রাফ ব্যবহার করতেন না। অত্যন্ত চতুর মহিলা। কিচেন পলিটিক্সটা ভাল বুঝতেন। আত্মীয়স্বজনদের চোখে আমাকে ছোট করার একটা তীব্র চেষ্টা চালাতেন। কিন্তু আমার মোটামুটি একটা নাম হয়ে যাবার পর, ওঁর সমস্ত পরিকল্পনাই মিইয়ে গেছিল।

আমার ঠিক পরের বোন মঞ্জুলা ওরফে সন্টু পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে 'প্রেমট্রেম' জাতীয় কিছু একটা করে ফেলল। ছেলেটির নাম বাবলু সাহা। ছেলেটি দু'ভাই—ছানা ও বাবলু। ছানাদা বাজারে একটা মুদি দোকান চালাতেন। তাঁর পায়ে ছিল পোলিওর আক্রমণ। ছানাদা ভাল মানুষ। একা হাতে রোজগার করে যৌথ পরিবার সামলাতেন। ভাই বাবলু দোকানে যেত না, কিছুই কাজ করত না। শুধু স্টাইল করত।

সন্টুকে নিয়ে তখন বাড়িতে অশান্তি। আমাদের বাড়ির কমান্ডার-ইন-চিফ্‌ বড়দি ঘোষণা করে দিলেন, ওই সিডিউল কাস্ট ছেলের সঙ্গে আমরা কোনওমতেই বিয়ে দেব না।

বাবলুকে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ক্লার্কের কাজে ঢোকাবার জন্য কিঞ্চিৎ সাহায্য করেছিলাম। আমি ধারদেনা করলাম। আমি ও আমার বউ সীমা প্রধান উদ্যোক্তা।

পাশের পাড়ায় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করলাম। বন্ধুবান্ধবের অভাব আমার নেই। ফলে অসুবিধা কিছুই হল না। বিয়ে হয়ে গেল বাবলু আর সন্টুর। বেশ কিছু লোক নেমন্তন্ন খেল।

আমি জাতপাত মানি না, শালগ্রাম শিলা মানি না। তাই শালগ্রাম সাক্ষী ছাড়াই ওদের বিয়ে হল রেজিস্ট্রি করে। বাকি বোনরা এবং বাবা-মা আসেননি। ছিলেন—মাখনদা, মাখনদার বউ, গণেশদা, ডলি বউদি। বন্ধুরা বলতে তপন, গোরা এবং পাড়ার কিছু বন্ধুরা ছিল।

ছোট বোন রঞ্জুর বিয়ে হল রজত রুদ্রর সঙ্গে। ছেলেটি ব্যাঙ্কের অফিসার। বাড়ি শ্যামবাজারের পাঁচমাথা মোড়ের কাছে।

রঞ্জু দেখতে সুন্দরী ছিল। লেখাপড়ায় সাধারণ মানের। অবশ্য সব বোনেরাই লেখাপড়ায় সাধারণ মানের ছিল। শুধু বড়দি লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত স্কুলে ফার্স্ট হয়েছেন। স্কুলটা ভালই। ওকে পড়াবার জন্য একাধিক প্রাইভেট টিচার ছিল। তারপর ভৌমিক স্যার ওকে পড়াতে এলেন ক্লাস নাইন থেকে। ফলে বড়দি লেখাপড়ায় দ্রুত পিছতে থাকলেন। ভৌমিক স্যার ওকে কোন্ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়েছিলেন কে জানে। তাই বোধহয় স্কুল ফাইনালে বড়দি থার্ড ডিভিশন পেলেন।

আমার রেজাল্ট ভালই হত। প্রাইভেট টিউটর ছিলেন না। আদাড়ে-বাদাড়ে বড় হয়েছি। আমার রেজাল্ট ভাল হওয়াতে বড়দি আমার উপর ক্ষুব্ধ হলেন। মা মনসার রাগ। অন্য বোনেরা মিলিটারি বড়দির কথা অনুসারে চলে। তাই, আমার চলাফেরা সবই খারাপ। আমাকে বোনেরা দেখতেই পারত না। অন্য বোনেরা বড়দির বাক্যকে 'বেদবাক্য' করে নিল। আমার প্রতি বোনেদের নজর তখন যেন, 'যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা'।

আমি ঈশ্বর, আত্মার অবিনশ্বরতা, ভাগ্য, জ্যোতিষ, কোনও কুসংস্কারে বিশ্বাস করতাম না। আমার একটা জনপ্রিয়তাও তৈরি হচ্ছিল লেখক হিসেবে। নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে ছিলাম। আমাদের বাড়িতে পুজোপাঁজি, ব্রত, কুসংস্কার প্রায় ছিল না। অথচ বড়দি ও মেজদি বেশি বেশি করে বিভিন্ন কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরছিলেন। এটা আমার ওপর বদলা নিতেই বোধহয় করেছিলেন।

সন্টু ও রঞ্জু দু'বোনই বড়দি ও মেজদির অন্ধ সমর্থক হয়ে গেল ধীরে ধীরে। সন্টু আমার ভক্ত ছিল। এই সন্টু আর ওর বরকে আমার দুই দিদি স্বীকার করে নেওয়ায় দিদিরা যেন হাতে চাঁদ পেলেন। বাবলু, সন্টু ওরা চলে গেল দিদির দলে।

অধ্যায় : নয়

মায়ের মৃত্যু

মায়ের মতো বিচিত্র রমণী, বিচিত্র মহিলা আমি জীবনে দেখিনি। মা ছিলেন দাদুর সেজো মেয়ে। এগারো জন ভাইবোন। ভাইবোনেরা সকলেই 'সেজদি' বলে ডাকতেন। দিদিমা ফর্সা, সুন্দরী। মা-ও ছিলেন খুব ফর্সা ও সুন্দরী। সমস্ত সংসারের ভার মায়ের ওপর ছিল। যেমন, বৃদ্ধাশ্রম, মহিলা শিক্ষা ইত্যাদি কাজে যেমন তাঁর বাবার নিত্যসঙ্গী হিসেবে সাহায্য করতেন, ঠিক তেমনই মামাদের রিভলবার কোথাও পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব মা-ই নিতেন।

মা ছিলেন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ধীর, স্থির, বুদ্ধিমতী। কোনও দিন চড়া সুরে একটাও কথা বলতেন না। মামারা ছিলেন প্রায় সকলেই মায়ের থেকে বড় কিন্তু সেজদি ছাড়া কথা বলতেন না।

বাবা ছিলেন কিঞ্চিৎ বোহেমিয়ান। বিয়ের পর বাবার সংসারে এসে মা খুব সুচারুভাবে সংসার পরিচালনা করেছিলেন। তখন মায়ের বাড়িতে ঘণ্টা বাজিয়ে খেতে ডাকা হত। শ'খানেক পাত পড়ত। আমার দাদু ও দাদুর বাড়ির ছেলেমেয়েরা এবং আত্মীয়স্বজনরা ছাড়াও খেতে আসতেন নায়েব, গোমস্তা, ঝি-চাকররা, নৌকার মাঝি প্রভৃতিরা। রান্না করতেন বাড়ির মেয়েরা।

মায়ের দেহাবসান ঘটে ২০০৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। মা বেঁচে ছিলেন একশ বছর। শেষ বয়সেও তাঁর মাথা খুব সক্রিয় ছিল। একদিনের ঘটনা পিয়ন এসেছে আমার নামে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি দিতে। তখন মা নিজেই বেরিয়ে এসে গেটের কাছে গিয়ে বললেন চিঠিটা দিতে এবং নিজে সুহাসিনী ঘোষ নামে সই করে প্রবীর ঘোষের চিঠিটা নিয়ে নিলেন। সত্যিই অবাক করা ব্যাপার! আমার বাড়ির সবাই ভেবে নিয়েছিল মায়ের মস্তিষ্ক অচল হয়ে গেছে।

আমাদের পরিবারে আমার একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন মা। তাঁকে সব কথা বলতাম। প্রথম ভোটে রিগিং করা থেকে শুরু করে সাম্যের সমাজ গড়ার যে স্বপ্ন দেখতাম তাও মা জানতেন। আমি যে বিয়ে করতে চলেছি এবং কেন করতে চলেছি তাও মা জানতেন।

বাবার মৃত্যু

বাবা সকাল বেলা উঠে প্রতিদিন ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতেন অনেকক্ষণ। বাবা লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন। তালুকদারের ছোট ছেলে। নীরোগ চেহারা, সুঠাম পুরুষ, গাত্রবর্ণ কালো, উচ্চতায় ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। মদ খেতেন না, কিন্তু চোখদুটো সবসময়েই লাল।

বাবা ছিলেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির। সেরকম কথা বলতেন না। কিন্তু বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা বাবাকে ঘিরে যখন বসত, বাবা একের পর এক গল্প বলতেন। আমাদের ছবি আঁকাও শেখাতেন।

প্রতিবছর বেশ কিছু পুজো সংখ্যা আমাদের বাড়িতে আসত। মা'র জন্য প্রতিমাসে দু-একটা ম্যাগাজিন তো আসতই।

বাবার অধস্তন পিয়নরা প্রত্যেকেই ছিলেন ভাল। বাবাকে খুব ভালবাসতেন।

একবারই অসুখ করল বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় এবং মারা গেলেন। বাবা মারা যান ১৯৮৫ সালের ২৬ মে।

বাবার মৃত্যুর পর আমার দেবীনিবাস ফ্ল্যাটে একটা স্মরণ সভার আয়োজন করি। সেখানে হাজির ছিলেন—ডঃ অসিত চক্রবর্তী, ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য, ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল ও সেই সময়ে আমার বইয়ের প্রকাশক 'এ মুখার্জি এন্ড কোম্পানি'র ডিরেক্টর রাজীব ও রঞ্জন এবং সাম্যকামী বহু বন্ধু।

বাবার একমাত্র ছেলে হয়ে হিন্দু প্রথা মতো আত্মার শান্তির জন্য মুখাগ্নি ও শ্রাদ্ধ-শান্তি না করায় আমার ওপর দিদি খেপে গেলেন। আর দিদি খেপে যাওয়া মানে বাকি তিনজনেরও ধুন ধরা শুরু হল।

আবার দেশ হারালাম, এলাম দেবীনিবাসে

১৯৭৮ নাগাদ বন্যার পরপরই এলাম দেবীনিবাসে। নিয়ে এলেন শিশু সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ভাড়া থাকতে শুরু করলাম পঞ্চানন ঘোষের বাড়িতে। তিনতলা বাড়িটাতে আরও কয়েকঘর ভাড়াটে। আমাদের বাড়ির এবং পাশের বাড়ির মাঝখানে যে লনটা ছিল, সেখানে শীতে ব্যাডমিন্টন খেলতাম আমরা। পাড়ার অনেক ছেলেরাই খেলতে আসত। আশিসবাবু, বিশু, বান্টি, মল্লিকদা আরও অনেকেই আসতেন।

দিনের বেলায় ওখানেই ফুটবল পেটাপেটি হত। আমার ফ্ল্যাটে তখন একটা ছোটখাটো লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে। অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে কয়েকটা বইও ইতিমধ্যে বেরিয়ে গেছে।

পাশের বাড়ির অরুণদা ও সুজাতা বউদির এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়ে মাস্তু খুবই সুন্দরী, লেখাপড়াতেও ভাল। ছেলে খুব টাফ্ চেহারা। অমিত সেও লেখাপড়ায় ভালই।

ওই লনেই এবাড়ি ওবাড়ির কাপড় নিয়ে প্যান্ডেল তৈরি হত। পঁচিশে বৈশাখ উদ্‌যাপন হত। আমাদের বাড়িতে সীমার কাছে রিহার্সাল দিতে আসত পাড়ার কচিকাঁচারা। আমাদের বাড়ি ছাড়াও আরেকটি বাড়িতে রিহার্সাল হত। সেটা হল নন্দিতা চৌধুরির বাড়িতে। মহিলা মতিঝিল কলেজে অধ্যাপনা করতেন। মেয়ে পম্পি। ভাল গাইত। আবৃত্তি, নাচ, গান এবং সব শেষে রবীন্দ্রনাথের একটা নাটকও হত। প্যান্ডেল করে দিতেন মল্লিকদা।

দেবীনিবাসে প্রচুর মানুষ আসত। ছেলে, মেয়ে, বাচ্চা, বুড়ো। আমার সমবয়স্ক যারা ছিল, তাদের সঙ্গে ঠিক আড্ডা জমত না। কারণ, তারা অশ্লীল গল্প করতেই খুব ভালবাসত। আর আমি ওসব গল্প সহ্য করতে পারতাম না। এজন্য নিজেকে ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলাম।

সীমা তখন দেবীনিবাসে আমাদের ফ্ল্যাটেই গান শেখাত। পাড়া-বেপাড়ার বিভিন্ন ফাংশানে গাইতে যেত। কম্পিটিশনে জাজও হত। আমার যতদূর মনে পড়ে, যুব উৎসবে যেবার অনুপ ঘোষাল পল্লিগীতিতে প্রথম হয়েছিলেন, সেবার সীমা দ্বিতীয় হয়েছিল। রেডিওতে গাইত। আমার পরিচিতির কল্যাণে 'সানন্দা' ও 'সুকন্যা' পত্রিকাতে বেশ কিছু মডেলিংও করেছে।

আমার লেখা আর রাজনীতি নিয়েই সময় কেটে যেত। প্রচুর ঘুরতে হত। 'উইদাউট পে'ও হতাম। পিনাকী তখন বছর পাঁচেকের। এখানেই ওর বেড়ে ওঠা।

দেশভাগের পর দেশের বাড়ি ছেড়ে বাবারা সব হারিয়ে এই বঙ্গে চলে আসেন। আর আমার দেশের বাড়ি বলতে দমদম পার্কের বাড়ি। প্রতি সপ্তাহেই দেশের বাড়ি যেতাম। মাঝে মাঝে বাগান থেকে আম-কাঁঠাল নিয়ে আসতাম। নারকেল পাড়িয়ে গোটা ছয়েক নারকেলও নিয়ে আসতাম। পেয়ারার আগ্রহ ছিল না। করমচাতেও না। এভাবেই চলছিল।

মা-বাবা তখন মারা গেছেন। ২০১১ সাল নাগাদ বড়দিদি-মেজদির নেতৃত্বে প্রোমোটারের হাতে বাড়িটা তুলে দেওয়া হল। একতলায় গ্যারেজ, আর পাঁচতলা পর্যন্ত ফ্ল্যাট উঠল। দিদি, সন্টু, রঞ্জু এদের তিনজনের বাড়ি আছে। আমিই শুধু গৃহহারা।

২০১৩-র এপ্রিল অর্থাৎ ১৪২০-র ১ বৈশাখের পরের রবিবার ফেসবুক দেখে জানতে পারলাম—প্রত্যেক বোনই একটা করে ফ্ল্যাট ও একটা করে গ্যারেজ পেয়েছে। ফেসবুকে বোনেদের ও তাঁদের পরিবারের আনন্দ-উৎসবের অনেক ছবি দেখে মনে কিঞ্চিৎ ধাক্কা খেলাম।

দিন পনেরো পর মেজদি ফোন করলেন আমার বউকে—শোনো, আমি আমার ফ্ল্যাটটায় চলে এসেছি।

আমি ফোনটা নিয়ে বললাম, আমাকে তো ফ্ল্যাট দিলে না। বছর দেড়েক ধরে ফ্ল্যাট তৈরি হল। প্রোমোটার তোমাদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করল। অথচ আমি কিছুই জানতে পারলাম না।

আমি জানি, বাবার সম্পত্তির আংশিক মালিকানা আইনত আমারও আছে। কারণ বাবা-মা উইল করে যাননি।

আমি আমার এই অংশ রেজিস্ট্রি করে দান না করলে, সেটার মালিকানা অন্য কেউ কোনওভাবে ছিনিয়ে নিতে পারে না। সুতরাং যা করা হয়েছে তার জন্য ওদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা যায়। ফৌজদারি মামলা বছরের পর বছর চলে না। খুব দ্রুত নিষ্পত্তি হয়। আমার সঙ্গে প্রতারণার জন্য প্রতারক বোনেরা জেলে যাবেই।

বাবার মৃত্যুর পর একমাত্র ছেলে হয়েও অশৌচ পালন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি আমি করিনি। ফলে দিদি-বোনেরা আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বাবার করা বাড়ি ও আমার করা ঘরটা তাঁরা বেআইনি ভাবে দখল নিলেন।

যাক, আমি কোনও কেস করলাম না। ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে যেখানে ভাড়া থাকি, সেটার মালিকের সঙ্গে কথা বলে কিনে নিলাম।

অধ্যায় : দশ

গড়ের মাঠে খেলা

কলকাতার মাঠে খেলা দেখতে যেতাম মাঝে-মাঝেই। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান মাঠে বড় খেলা থাকলে তিনটি মাঠেই যেতাম বন্ধুরা মিলে। খেলা শুরু বিকেলে তো আমরা টিকিটের জন্য লাইন দিতাম দুপুর বারোটায়। ঘোড়া পুলিশরা টগবগ করতে করতে লাইন সামাল দিত। হইহই রইরই ব্যাপার। গরমের দিনে ঘেমে নেয়ে একাকার। জামা খুলে ঘাম মোছা, হাওয়া খাওয়া। বৃষ্টির দিনে ভিজতাম। গায়ের জল গায়েই শুকোত। খেলা দেখা, খেলা নিয়ে তর্ক-বিতর্কে চিৎকারে, চেঁচামেচিতে মাঠ হত সরগরম।

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্যাচে টিকিটের জন্য হাহাকার হত। '৬৬ থেকে পাড়ার ছেলেরা আমার কাছে আসত টিকিট পাওয়ার জন্য। তখন আমি স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরিতে ঢুকেছি। কর্মসূত্রে প্রচুর খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে টিকিট জোগাড় করতাম। পাড়ার ছেলেদের সেই টিকিট দিতাম।

ঘনিষ্ঠতা ছিল সনৎ শেঠ, সুকুমার সমাজপতি, ভবানী রায়, বলাই দে-র সঙ্গে। আসলে প্রায় প্রত্যেক ফুটবলারের সঙ্গে আমার ভালই পরিচয় ছিল।

সুকুমার সমাজপতি অতি রুচিবান মানুষ। খেলতেন রাইট আউটে। অসাধারণ খেলোয়াড়। এর সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও গাইতেন। এখন তিনি সঙ্গীত নিয়েই বেঁচে আছেন।

খেলা ছাড়ার পর সুকুমার সমাজপতি খেলার ধারাভাষ্য দিতেন রেডিওতে। আর দু'জন অসাধারণ ভাষ্যকার ছিলেন পুষ্পেন সরকার ও অজয় বসু। খেলার মাঠের চিত্র থেকে হাওয়ার গতি, দর্শকদের উল্লাস এমনভাবে বলতেন যেন টিভি দেখছি। চোখ বন্ধ করে শুনে শুনে খেলা দেখার স্বাদ মেটাত বাঙালি। আমাদের পাড়ায় রেডিওতে খেলার রিলে শোনার প্রবল উৎসাহ ছিল। বিশেষত ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্যাচে। দারুণ সে দৃশ্য! এখন টিভিতে খেলা দেখানোতে 'ধারাভাষ্যে'র শিল্পটা হারিয়ে গেছে।

সনৎ শেঠ খেলতেন গোল-এ। জিমন্যাস্টিক বডি। তাঁর খেলা ছিল একটা শিল্প। অসাধারণ গোলকিপার। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বটা আজও আছে। খুব স্পষ্টবাদী

ছিলেন। এখন অশক্ত শরীরে বাইরে বেরোতেও পারেন না। আমার দেখা শ্রেষ্ঠ গোলকিপার তিনি।

ভবানী রায় ভারতীয় দলের হাফব্যাক-এ খেলতেন। শর্ট হাইট, ঠান্ডা মাথার খেলোয়াড়। এত উঁচু মানের খেলোয়াড় ছিলেন যে, স্বল্প উচ্চতাটা তাঁর কাছে কোনও বাধাই ছিল না। এত ভাল ওভারল্যাপিং জানতেন, যা অসাধারণ।

গত শতকের ছয়ের দশকে সেন্টার ফরোয়ার্ড ছিলেন আপ্পালা রাজু। খেলতেন বি এন আর-এ। তেকাঠিটা দারুণ চিনতেন। বুলেটের মতো শট মারতেন। সনৎ শেঠের ভাষায়, 'অমন ভয়ঙ্কর শট আর কাউকে মারতে দেখিনি'।

আপ্পালা রাজুর পাশেই খেলতেন অ্যান্টনি। কী ডজ্! খুব স্বল্পায়ু ছিলেন। মদই তাঁকে খেয়ে ফেলেছিল।

বলাই দে পাকিস্তান জাতীয় দলের গোলকিপার ছিলেন। তারপর কলকাতায় এসে ভারতীয় দলের গোলকিপার হলেন। মোটামুটি খেলতেন।

আমি যে কলেজ স্ট্রিট এলাকার ডাকাবুকো মানুষ সেটা বলাই জানত। অফিসে বিভিন্ন সেকশনে আমার সঙ্গে ঘুরত। সবাইকে দেখাতে চাইত আমার সঙ্গে ওর কতটা হৃদ্যতা আছে।

বলাইয়ের বিয়ে ঠিক হল, শুনলাম। বলাই এক-একটা সেকশনে গিয়ে বলত, আমি বিয়ে করছি। প্রবীর আমার বউকে একটা তিনভরি সোনার হার দেবে।

শুনে অবাক। কী দেব না দেব—সেটা আমার ব্যাপার। আমার উপর চাপ সৃষ্টি করছে যাতে আমি সোনার হারটা উপহার দিতে বাধ্য হই।

ওর আগে আমার বিয়ে হয়ে গেল। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। বলাইকে নেমন্তন্ন করলাম। সবাই এল। অনেক লোক। কিন্তু বলাইয়ের দেখা নেই। এক অফিসে কাজ করি, তাও বিয়ের পর আমাকে এড়িয়ে থাকত বলাই।

আমার দেখা সেরা ফরোয়ার্ড ছিলেন হাবিব। মরার আগে মরতেন না। নাছোড়বান্দা ফরোয়ার্ড। সারা মাঠেই ওর উপস্থিতি। ডিফেন্সকে ভেদ করত সূচের মতো। অসাধারণ হেডার। বিশেষত কর্নার বা ফ্রি কিকের সময়ে পেনাল্টি বক্সের কাছে যেকোনও ডিফেন্সের কাছে হাবিব্ হল মূর্তিমান ঝড়।

ভারতীয় দলে যেসব বিদেশি ফুটবলার খেলে গেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফুটবলার ছিলেন মজিদ বাস্কার। জামশেদ-মজিদ জুটি ছিল। মজিদের খেলা দেখার সুযোগ যাদের হয়েছে তাঁরা কোনও দিনই ওর খেলা ভুলতে পারবেন না।

জার্নেল সিং ও অরুণ ঘোষ ছিলেন আমার দেখা সেরা ডিফেন্স। এদের ডিফেন্স যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীর। নইমউদ্দিনেরও ভাল নাম ছিল ডিফেন্স হিসেবে। পরে এলেন সুব্রত ভট্টাচার্য।

পি কে, চুনী, বলরাম-দের অনবদ্য খেলা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁদের সময়ে ভারত এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ফুটবল দলের সম্মান পেয়েছে। পি কে 'উইথ

দ্য বল' দারুণ দৌড়তেন। দারুণ ফার্স্ট আর কামানের গোলার মতো শট। চুনী গোস্বামীর বল কন্ট্রোল ছিল অসাধারণ। বদ্রু ব্যানার্জির নেতৃত্বে ভারতীয় দল অলিম্পিকে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল ১৯৫৪ সালে। আর আজকের ভারতীয় ফুটবল দল একশো ষাট-সত্তরে ওঠানামা করছে।

সনৎদা শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেসময়ে এলেন থঙ্গরাজ। বল ফ্লাই করে গোল দেওয়া কঠিন ছিল থঙ্গরাজকে। কিন্তু তিনি গোল খেতেন মাটি ঘেঁষা শট-এ। বল গ্রিপিং দারুণ। একসঙ্গে ধরেই হাতে ছুড়তেন তো সেন্টার লাইন পার হয়ে ওপরের মিডফিল্ডে গিয়ে বল পড়ত। যেন একটা পিক্আপ কিক্ মারলেন।

একটা জনপ্রিয় পত্রিকায় পড়ছিলাম শ্যাম থাপা ভারতে প্রথম ব্যাকভলি প্রচলন করেছিলেন। কথাটা সত্যি নয়। পাঁচ-ছয়ের দশকেই মেওয়ালাল ব্যাকভলিতে প্রচুর গোল করেছিলেন। ব্যাকভলিতে এত দক্ষ ছিলেন যে, প্রবাদ রটেছিল তাঁর ব্যাকভলি গোলপোস্টে লাগা মানে গোলপোস্টটাই ছোট। তিনি ভারতীয় দলের হয়েও খেলেছিলেন। খেলতেন বি এন আর দলে।

সুবীর কর্মকার, সমরেশ চৌধুরি ভাল ফরোয়ার্ড ছিলেন। এদের খেলা চোখের সামনে ভাসে। সুরজিৎ সেনগুপ্ত খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। অসাধারণ ডজ্ ও বল কন্ট্রোল। তবে বড় খেলায় সবসময়েই সুপার ফ্লপ।

'৭৭-'৭৮ নাগাদ 'পেলে' এলেন কলকাতায়। হইহই করে মাঠে গেলাম খেলা দেখতে। পেলে-র সঙ্গে নাছোড়বান্দার মতো লেগেছিলেন হাবিব্। এক ইঞ্চি জমি ছাড়েননি হাবিব। খেলাটা উপভোগ করেছিলাম।

গত শতকের ছয় ও সাতের দশকের বাংলার ক্রিকেট প্লেয়ারদের সবাইকে আমি চিনতাম, তাঁরাও আমাকে চিনতেন। ক্রিকেটে বাংলা দল কোনও দিনই ভাল ছিল না। পঙ্কজ রায় ভারতীয় দলে খেলতেন। আমি ওর খেলা কোনও দিনই দেখিনি। রিলে শুনেছি।

প্রতিবছর 'অমূল্য স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শিল্ড' ফুটবল টুর্নামেন্ট হত পাড়ায়। বাইরের টিম আসত। প্রতিযোগিতামূলক খেলা নিয়ে মাঝে-মধ্যেই তুমুল মারামারি হত। তখন আমাদের পাড়ার সঙ্গে মারামারিতে প্রধান অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন নান্টুদা, বিনয়দা, গুড্ডু, শ্যামাদা, কালুদা এবং গুপ্তদা। এতে হাতাহাতি লড়াই হত না। হত লাঠি দিয়ে। অনেক দলই ঝান্ডা নিয়ে আসত। ঝান্ডার কাপড় খুলে পকেটে পুরলেই, ঝান্ডা হত লাঠি।

গ্রীষ্মে ও বর্ষায় প্রতিদিনই পাড়ায় ফুটবল খেলা হত। আর, শীতে হত ক্রিকেট খেলা। শীতকালে রাত্রে ব্যাডমিন্টন খেলাও হত, লাইট জ্বালিয়ে। দিনে চলত ভলি খেলাও। হইহই করে পাড়ার ছেলেরা খেলত। খেলা হত স্কুলের পাশের মাঠে।

আর ব্যাডমিন্টন খেলা হত পাড়ায় একগাদা। খেলাধুলায় মেতে থাকত পাড়ার অধিকাংশ ছেলেরা। খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াও এগোচ্ছে।

অধ্যায় : এগারো

নতুন কলেজ জীবন

মতিঝিল কলেজ থেকে 'প্রি-ইউনিভার্সিটি' পাস করলাম। ভর্তি হলাম মণীন্দ্র কলেজে। বিষয় বি কম। ক্লাস নাইটে। বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাস চলত।

জানি, আমহার্স্ট স্ট্রিট সিটি ও মির্জাপুর সিটিতে কমার্স ভাল পড়ায়। কিন্তু, আমার বাড়ি থেকে অনেকটা দূর ও পয়সা বেশি খরচ হবে, তাই মণীন্দ্র কলেজেই ভর্তি হলাম।

দোতলা কমপ্লেক্স। চৌকোনা বিল্ডিং। সারিসারি ঘর। মাঝখানে উঠোন। একতলায় একটা কমনরুম। এখানে আড্ডাবাজি দেওয়া ছাত্রের অভাব নেই। এর পাশেই স্টুডেন্টস হেলথ হোম পরিচালিত ডিস্‌পেন্সারি। মাহিনার বই দেখালে চিকিৎসা ও ওষুধ মিলত এখান থেকে। একদম পিছনের দিকে বড়সড় ক্যান্টিন। চা, ঘুগনি, রুটি ইত্যাদি পাওয়া যায়। কেউ কেউ এখানে আড্ডা দিত।

শ্যামবাজারের ফড়িয়া পুকুরে একটা ফ্রেন্ডস কেবিন ছিল। সেখানে কয়েকজন বন্ধু মিলে প্রায়ই আড্ডা মারতে যেতাম। ফ্রেন্ডস কেবিনে শুধু চা নিয়ে বসা যায় না। তাই ভেজিটেবিল চপ অর্ডার দিতাম।

শ্যামবাজারের 'ঘটি' ৬০-৭০ বয়সি বুড়োরা সেখানে আসত। অর্ডার দিত চপ, ফিসফ্রাই, কাটলেট। বুঝতাম এরা বাড়ি থেকে লুকিয়ে এসে খাবার খেয়ে যাচ্ছে।

শ্যামবাজার পাঁচমাথা থেকে ভূপেন বোস অ্যাভিনিউ দিয়ে একটু এগোলে ডান হাতে একটা গলির মুখেই কলেজটি। এখন শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনে ঢোকার রাস্তা হয়েছে এই কলেজের উল্টোদিকে দুই রাস্তার মাঝে। আর জি কর-এর সামনে বাসে নামতাম। তারপর হেঁটেই যেতাম কলেজে। মিনিট দশেক সময় লাগত হেঁটে পৌঁছতে।

মুষ্টিমেয় কিছু ভাল ছাত্র নিয়ে ফার্স্ট ইয়ারের সেকশন 'এ', চান্স পেলাম। যাট জন ছাত্র। ছাত্রী ছিল না। আর 'বি' সেকশনে ছাত্রসংখ্যা শ'দুয়েক। বলতে গেলে একটা গোয়ালঘর।

কমার্সে মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের যথেষ্ট নাম ছিল। লেখাপড়ার বাইরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মে অনেক ছাত্ররা এগিয়ে ছিলেন। যথেষ্ট নামও করেছিলেন। এখানেই পড়তেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মতি নন্দীদের মতো প্রতিভাবানরা। তখন প্রেসিডেন্সিতে পড়তেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শৈবাল মিত্র, অসীম চট্টোপাধ্যায়। এরা আমার সমসাময়িক। কলেজ স্ট্রিটে কফি হাউজ এবং শ্যামবাজারে কফি হাউজে আড্ডা দিতাম। ওদের অনেকেই আসতেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-রা শ্যামবাজার কফি হাউজে আসতেন। কলেজ ছাড়ার পর এখানে আড্ডা দিয়ে ছাত্র আন্দোলনের খবরাখবর পেতাম ওদের কাছ থেকেই।

মতি নন্দী আমার খুব প্রিয় লেখক। অবশ্য আমি কলেজে ঢোকার আগেই তিনি কলেজ ছাড়লেন। রুদ্রপ্রসাদ ও অজিতেশ-রাও আগেই ছেড়েছিলেন। এই সময়ে কিছু পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লিখেছি।

প্রায় গোটা কলেজেই ইউনিয়নবাজি চলত। তবে আমাদের সেকশনে এসেই ইউনিয়নবাজি থেমে যেত। নাইট কলেজ। অনেকেই চাকরি করে পড়তে আসতেন। তাই পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ বেশি ছিল। আমিও পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়ে আড্ডা দিতাম না। NCC-তে রাইফেল শুটিং শেখা শুরু করলাম।

কলেজে প্রতিবছরই রি-ইউনিয়ন হত। অনুষ্ঠানটা হত মহাজাতি সদনে। একবারই গিয়েছিলাম। উৎসাহ পেতাম না।

প্রিন্সিপাল ছিলেন অনিল বাবু। ভাইস প্রিন্সিপাল এন এন দাস। পি কে জি ছিলেন প্রফেসর। পড়াতেন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট। শায়েরীর স্টাইলে পড়াতেন। সুন্দর লাগত তাঁর পড়ানো। তিনি শৌখিন ছিলেন। শীতকালেও একটা ফিনফিনে পাঞ্জাবি এবং ফিনফিনে ধুতি পরে আসতেন।

একজন ইন্‌কামট্যাক্স ল'ইয়ার পড়াতেন কমার্শিয়াল ল।

এইসময়ে দিনের বেলায় পড়াশুনা করতাম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। লিখতাম নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। নামে ও ছদ্মনামে প্রচুর লিখেছি। সন্ধ্যায় কলেজ। বাড়িতে এসে ঘাটের আড্ডা চলত প্রায় রাত এগারোটা পর্যন্ত। তারপর প্রায় দুটো পর্যন্ত চলত ক্লাসের পড়াশুনা। তারপর ঘুম। আর মাঝে মাঝে গুরুবাবাজিদের শিকার করতে বেড়াতাম।

এই কলেজে এসেই গভীর বন্ধুত্ব হল গোরা, তপন, দিলীপ, সিতু এবং দেবদাস চক্রবর্তীর সঙ্গে। সিতু পড়ত 'বি' সেকশনে। আর সবাই ও আমি পড়তাম 'এ' সেকশনে।

গৌরবর্ণের মাঝারি চেহারার গোরা গানও গাইতে পারে। থাকে বরাহনগরে কোনও দিন কাউকে খারাপ বলত না। নিন্দেমন্দ একদম পছন্দ করত না। সেইজন্যেই ওর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগত খুব। এখনও লাগে। এখনও গোরা

আমরা খুব নিকট বন্ধু। মন ভাল করার জন্য মাঝে-মাঝে ওকে ফোন করি।

তপন চ্যাটার্জি থাকত চিৎপুরে। ঝিরকুটে, কালো, মাঝারি উচ্চতার ছেলে। গরিব মানুষ ওরা। একগাদা ভাইবোন। বাবা খেটো ধুতি আর খালি গায়ে থাকতেন। শীর্ণ চেহারা কিঞ্চিৎ কুঁজো।

আমার দেখা সেরা হিংসুটে ছেলে হল তপন। আমি গরিব থেকে একটু একটু করে সচ্ছল হচ্ছি, আর তপনের হিংসে প্রকাশ পাচ্ছে।

ওর দুই তুতো বোন ছিল। ওদের বাড়িতে আসত। তখন সোবার্সের সঙ্গে অঞ্জু মাহিন্দ্রা প্রেম করে খুব নাম করেছে। এই অঞ্জু মাহিন্দ্রার মতো দেখতে ছিল তপনের তুতো ছোট বোনটি। ধপধপে ফর্সা। এই মেয়েটিকে আমার সঙ্গে ভেড়াবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেল তপন। আমার অফিসেও আসতে থাকল মেয়েটি। ওকে পাত্তা দিচ্ছি না দেখে এক-পো ওজনের একটা চিঠি লিখে পাঠাল আমায়। সেই চিঠির বয়ান যতই পড়ছি, মনে হচ্ছে মাথায় কেউ খড়মপেটা করছে। শেষে মেয়েটিকে বললাম, পড়াশুনা করো, বানান-টানান ভাল করে শেখো। তারপরে আমাকে চিঠি লিখবে।

তপন পাস করে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্লার্কের চাকরিতে ঢুকল। এই অফিসে ঘুষ হল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। অর্থ থেকে মেয়ে সবই চলে ঘুষ হিসেবে। এসব নিয়ে গল্প করতে আসত আমার বাড়িতে। খুব অশ্লীল ও নোংরা ছিল গল্পগুলো। ধাপে ধাপে অফিসার হয়ে রিটায়ার করল।

আমাদের সঙ্গে যখন ছিল তখন খুব ভাল ছেলে ছিল। একটু একটু করে খারাপ, পরশ্রী ও পরস্ত্রীকাতর হয়ে গেল।

গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন, কালকের আমি আর আজকের আমি এক নয়। এটা তপনের ক্ষেত্রে দারুণ খেটেছে। ওর সঙ্গে সম্পর্কটা ছিন্ন করে দিলাম।

আমাদের ক্লাবে একটি ছেলে পড়ত। নাম সোমনাথ। কলেজের উল্টোদিকে একটা ছোট্ট সোনার দোকান ছিল। শোকেস নেই। গয়নাগাটি নেই। কিন্তু সোমনাথরা ধনী পরিবার এবং সেটা একদিন সোমনাথই আমাকে জানাল।

সোনা স্মাগলিং করে নিয়ে আসে। ক্যারিয়ার সাধারণভাবে সবাই মুসলিম। খিদিরপুর অঞ্চলের কিছু মুসলিমরা ওদের হয়ে ক্যারিয়ারের কাজ করত। এই চোরাই সোনা বেচেই ওরা ধনী। অদ্ভুত এক পেশার খবর জানলাম সেদিন।

জিজ্ঞেস করেছিলাম পুলিশ ধরে না।

বলেছিল, মাসকাবারি ব্যবস্থা আছে থানার সঙ্গে।

দিলীপ খুবই ভাল স্টুডেন্ট ছিল। চাকরি জীবনে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি ও কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি পাস করে মোটা বেতনের চাকরি পেল।

এই দিলীপের সঙ্গেই একবার হিঙ্গলগঞ্জে গেলাম। বাস-এ হাসনাবাদ। সেখান থেকে লঞ্চে হিঙ্গলগঞ্জ।

ইছামতী নদী দিয়ে লঞ্চ চলেছে স্রোতে দুলে। পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ। পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানের সাতক্ষীরা, খুলনা। জলের ওপরেই সীমানা। ওপার ঘেঁষে পূর্ব-পাকিস্তানের লঞ্চও যাচ্ছে। শুধু জলেরই পারাপার হবার বাধা নেই। নিষেধ নেই বাতাস, জলচর প্রাণী ও পাখিরও। দু'তীরে দূরে দূরে বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কোথাও ফাঁকা মাঠ। গাছপালা। সারিসারি গ্রাম। মাথার ওপর নীলাকাশ। ছবির মতো গ্রামগুলো। মাঠে গরু চরছে ইতিউতি। আদুল গায়ে হেঁটো ধুতি পরা চাষা যাচ্ছে, যাচ্ছে লোকজন। নদীতে চলছে নৌকো লটবহর নিয়ে। গ্রীষ্মের আকাশে হালকা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। নদীর তীরের জলে গাছের ছায়া। কালচে সবুজ জল। পাড়ে নামলাম।

হিঙ্গলগঞ্জের বর্ডারে দু'দেশের সেনারা পাহারায় রয়েছে দু'পারে। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত দুই তীরে 'কার্ফিউ' থাকে। তখন দু'পারই জেগে ওঠে। চলতে থাকে পাচার। ডিউটি বাড়ে সেনাদের। লক্ষ্য, তাদের তোলা না দিয়ে যাতে কারও মাল ঢুকতে বা বেরোতে না পারে। শুনলাম, চোরাকারবারিদের দৌলতে প্রায় বাড়িতেই বেশ্যাবৃত্তিও ঢুকে গেছে। চোরাকারবারিরাই খুব সচ্ছল এসব অঞ্চলে। অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই থাকত বাড়ি। আর প্রায় ছেলেরাই একটু লুচ্চা প্রকৃতির।

এলাম দিলীপের মামাবাড়ি। দিলীপের মামাতো দাদা ছিলেন পাচারকারীদের একজন বড়মাপের নেতা। একদিনের ঘটনা—ভাই এসেছে কলকাতা থেকে বন্ধু নিয়ে। তাদের মাংস না খাওয়ালে সম্মান থাকে না। দিলীপের দাদা গুলি চালিয়ে একটা পাঁঠা মেরে দিলেন। তারপর সেটার ছাল ছাড়াবার জন্য লেগে পড়ল দুই কর্মচারী। এদিকে যার পাঁঠা সে করজোড়ে হাজির হতেই দিলীপের দাদা বললেন, কত দিতে হবে বল?

তারপর টাকা মিটিয়ে দিলেন।

ওনাদের বাড়িতে প্রচুর গাছগাছালি। ছায়া ঘেরা। বিঘা বিঘা জমি। অনেকগুলো বাড়ি। সেসব নানা কাজে আলাদা আলাদা ব্যবহার করা হয়। প্রচুর জাতের আম হয়। এখানে আম খেয়েছি প্রচুর।

নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরা হত। যারা মাছ ধরত তারা দাদার বাড়িতে কিছু মাছও বিক্রি করে যেত। প্রচুর তপসে মাছ খেয়েছি।

কলেজের আর এক বন্ধু গোকুল চৌধুরি। বেলগাছিয়ায় বাড়ি। সুন্দর স্বভাবের

এত ভদ্র ছেলে কী করে হয়, ভাবতেই অবাক লাগে। বেড়াচাঁপাতে ওদের 'দেশের বাড়ি'। অনেকবার অনুরোধ করেছে যেতে। কিন্তু আজ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সম্পর্কটা আছে এখনও।

দেবদাস চক্রবর্তী থাকত ডানলপ ব্রিজের কাছে ইউবি কলোনিতে। ওর দাদা ছিলেন চিত্তরঞ্জনের এমএলএ। দেবদাস কলেজে আসত টাই পরে। ও পোশাকটা খুব ভাল ক্যারি করতে পারত। ছোটখাটো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চেহারা।

আমি বি কম পরীক্ষা দেওয়ার পরে পরেই দেবদাস ওর অফিসে আমাকে একটা চাকরি দেয়। খুব কম সময়েই চাকরিটা করেছিলাম।

তরুণ চ্যাটার্জি থাকত এয়ারপোর্টের কাছে মতিলাল কলোনিতে। ওরা দুই ভাই, দুই বোন। তরুণ বড়। বেঁটেখাটো, সুন্দর চেহারা। গুনগুন করে গান করত। আর আমরা ওকে উসকাতাম। বলতাম, কী সুন্দর গলা, চমৎকার...। আর ও গদগদ হয়ে প্রায়ই ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত।

শান্ত স্বভাবের মুহম্মদ আফতাবুদ্দিন থাকত রাজারহাট গ্রামে। ৯১ নং বাস-এ আসত ওখান থেকে। পরনে সাদা পাজামা ও পাঞ্জাবি। আমার ঘনিষ্ঠ ছিল। আমার বাড়িতেও আসত। একবার ওদের বাড়িতে নিয়ে গেল।

অনেকটা জমির ওপর অনেকগুলো কোঠা বাড়ি। গোয়ালে গরু, দেওয়ালে হেলান দেওয়া দুটো সাইকেল। কুড়ি বিঘে চাষের জমি। বাবা ও দুই ভাই চাষ করেন। আফতাব পড়ে। আমি ওদের পেতে দেওয়া খাটিয়ায় বসে গল্প করছিলাম। এমন সময় ওর মা একটা ছোট কাঁসার থালায় ঘি জবজবে হালুয়া এনে দিলেন। এমন সুন্দর হালুয়া প্রথম খেলাম।

অঞ্চলটি ফাঁকা ফাঁকা। চাষের জমি দিগন্ত বিস্তৃত। মাঝে-মাঝে প্রচুর জলা জমি। এসব জমি ও জলাতে চাষ হয়। সেই ফসলই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যায়। আমাদের বাজারেও যায়। কলকাতাতেও যায়। সবজি, মাছ ইত্যাদি। গ্রামের সহজ সরল জীবন ও ভীষণ আন্তরিক ব্যবহার। উঠোনে খেলে বেড়ায় মুরগি। পুকুরে হাঁস। মাঝে-মাঝে মাছের ঘাই দেখি পুকুরে। গাছগাছালিতে ভরা।

তখন এটাকে সল্টলেকের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। কিন্তু এলাকার মানুষ তাতে বাধা দিচ্ছে। শেষপর্যন্ত রাজারহাট গ্রামকে শহর করা যাবে না এমন সিদ্ধান্তই হল। বরং কৃষির উন্নয়ন করে মানুষকে সচ্ছল করা হবে এমন কথা বলল স্থানীয় নেতৃত্ব ও পরে সরকার। এখন সেই রাজারহাট শহর হয়ে গেল।

সিতু থাকত শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্কের কাছে। ওর দাদা কাজ করতেন ট্রাম কোম্পানির ইন্‌সপেক্টর পদে। সিতুর এক বিধবা দিদিও থাকতেন এবাড়িতে। দিদির এক মেয়ে। সিতু আমাদের থেকে বয়সে কিঞ্চিৎ বড়। গায়ের রং ফর্সা, লম্বা, কিঞ্চিৎ কুঁজো। অতি সাধারণভাবে থাকত।

সরু লম্বা তিনতলা বাড়ি। ওরা নির্ভেজাল 'ঘটি'। ওর বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। কারণ, আমার সব বইপত্র ছিল না। তাই ওর বইপত্র নিয়ে পড়াশুনা করতাম ওরই বাড়িতে। তিনতলায় ও কতটা পড়াশুনা করতো জানি না, তবে তার চেয়ে বেশি সিগারেট খেত।

একদিন দেখি পাশের বাড়িতে বিয়ের তেরপল পড়েছে। দুপুরে একটা জ্বলন্ত সিগারেট তেরপলের ওপর পড়েছে। হঠাৎ হইহই আওয়াজ শুনে দেখি ওরে বাব্বা! প্যান্ডেলে আগুন লেগে গেছে।

রেজাল্ট বেরিয়েছে। সিতু কোনওমতে ঘেসটে ঘুসটে পাস করল। আমি, তপন ও গোরা তিনজনেই গেছি সিতুর বাড়ি। সিতুর দিদি বলল, ইউনিভার্সিটি যা-তা খাতা দেখে। প্রবীর সিতুর বই পড়ে ওর থেকে বেশি নম্বর পেল!

সিতুর বাড়ির উল্টোদিকের বাড়িতেই আমি দুটো ছেলেকে পড়াতাম। তাদের বাবার মুখে গল্প শুনে জেনেছিলাম তিনি নকশাল করেন।

এখন দেখছি আটের দশকে জন্মানো ছেলেমেয়েরাও নাকি নকশাল করত। গল্পে নকশাল করা। গল্পে হামাগুড়ি দিয়ে হিমালয় ডিঙিয়ে চিন-এ যাওয়া। গল্পে মাও সে তুং-এর সিগারেট উপহার পাওয়া...। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

এই সিতু একবার বলল, একটা খুব ভাল পাবলিশার দে তো যারা খুব ভাল টাকা দেবে। তাহলে তাদের একটা উপন্যাস দেব।

বললাম, পাবলিশারদের কাছে উপন্যাস নিয়ে নিয়ে ঘোর। তারা দেখুক। ছাপতে রাজি হলে, তারপরে তো টাকার কথা। উপন্যাস লেখা হয়েছে?

—না, না। এখনও লেখা শুরুই করিনি। তবে ভাল টাকা দিলে লিখে ফেলব।

আমি আর কী বলব! আমাকে দেখে ওর লেখক হওয়ার উৎসাহ চাগাড় দিয়েছে। কিছুই বলার নেই।

এরকম উপদ্রব আরও সহ্য করতে হয়েছে লেখার জগতে। যা ফুরায় না।

আমাদের ক্লাসের সহপাঠী ছিল বিমল। ধুতি-শার্ট পরে আসত। প্রায়শই হাতে একটা ছাতা থাকত। বিমল আমার কাছে একদিন আলাদা করে বসে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা চাইল। সমস্যাটা হল, ওর বাবা ওর বোনকে নিয়ে তন্ত্রসাধনা করেন। আসলে তন্ত্রসাধনার নামে বোনকে প্রায়ই মৈথুন করেন। মা খুব কান্নাকাটি করেন। পাড়ার লোকেরাও জানেন। কিন্তু বাবার তন্ত্রসাধনাকে খুব ভয় পায় সবাই। সেজন্যে বাধা দিতে পারে না কেউই।

বললাম, ঠিক আছে আজ যাচ্ছি তোর বাড়িতে।

ও বলল, আজ যাস না। কাল মঙ্গলবার আছে কালকে আয়।

পরদিন গেলাম বরানগরে ওদের বাড়িতে। ঘরের বাইরেই একটা কালী মন্দির।

ওর বাবা তখন কালীপুজোয় বসবেন বসবেন করছিলেন। বয়স বছর পঞ্চান্ন। গায়ের রং মাজা। স্বাস্থ্য ভালই। বাবাকে পুজোতে সাহায্য করছে ওর বোন। বয়স কুড়ি, বাইশ। দেখতে ভালই।

আর বাবার গলায় গোটাকয়েক রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে গোলা সিঁদুরের দীর্ঘ টিপ। হাতে এবং বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে লাল বস্ত্র। খালি পা।

বললাম, আমি বিমলের সঙ্গে পড়ি। ভীষণ প্রাইভেট কথা আছে। একটু যদি ভিতরে আসেন। দু মিনিট।

তান্ত্রিক বাবাজি ঘরে ঢুকল। বাইরে বেরোবার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলাম। এখন ঘরে আমি, বিমল ও বাবাজি।

প্রথমেই হাতের তালুর গোড়া দিয়ে নাকে এক থাবড়া মারলাম বাবাজিকে। ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। মারলি কেন বলার সঙ্গে সঙ্গেই থুতনিতে একটা হুক করেই সজোরে পাঞ্চ করলাম মুখে। ধপ্ করে কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল মেঝেতে।

এদিকে ওর বাবার গোঙানি কান্না। ওদিকে ওর বোনের দরজা ধাক্কানোর শব্দ। বোনটি কাঁদতে কাঁদতে দরজা ধাক্কাচ্ছে—দরজা খোলো। দরজা খোলো।

বিমলকে বললাম, তোর বোনকে ঢুকতে দে। তোর মা থাকলে তাকেও ঢুকতে দে।

দু'জনেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর বাবাকে জড়িয়ে বোনের সে কী কান্না— আমি বাবাকে খুব ভালবাসি। বাবাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। আমাকে যাই করো বাবাকে মেরো না।

মা স্থবির দাঁড়িয়ে। বোনটাকে চুলের মুঠি ধরে তুলে সপাসপ চড় মারলাম দু'গালে। গালে প্রচণ্ড চড় খেয়ে ডায়লগ ভুলে আমি ক্ষমা চাইছি, আমাকে ক্ষমা করুন বলে কাঁদতে লাগল। বুঝলাম প্যাঁদালেই সব লুচ্চা সিধে হয়ে যায়।

বিমল আর বিমলের মা হতভম্ব। দাঁড়িয়ে দেখছে কাণ্ডগুলো।

আমি বাবাজিকে ন্যাংটো করলাম। পকেট থেকে ধারালো ছুরি বার করলাম। বাবাজির লিঙ্গটা ধরে বললাম, এটাকেই কেটে ফেলব। তারপর বাছা বাছা খিস্তি দিতে থাকলাম।

বাবাজি কাঁদো কাঁদো হয়ে আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে থাকল। আমি বললাম, ক্ষমা চাইতে হয় তো মেয়ের পা ধরে ক্ষমা চান।

বাবাজি তার মেয়ের পা ধরে ক্ষমা চেয়ে বলল, তন্ত্রের নাম করে যা যা করেছি সব অন্যায় করেছি। তোর কাছে ক্ষমা চাইছি। তোর সর্বনাশ করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দে।

আমি বাবাজির রুদ্রাক্ষের মালাগুলো ছুরি দিয়ে খাচাখাচ কেটে ফেললাম।

আর বিমলের বোনকে বললাম, ওর মুখে একটা লাথি মার না হলে কিন্তু নুনু কাটা যাবেই। জোরে মারবি। বিমলের বোন আমার আজ্ঞা অনুসারে তার বাবার মুখে জোরে একটা লাথি মারল।

বিমলের বাবাকে বললাম, এখনই কয়েকটা টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যা। আর এ বাড়িতে ঢুকবি না। ঢুকেছিস কী শেষ করে দিয়ে যাব...।

অথ বিমল সমস্যার সমাধান হইল।

সাধুদের সন্ধানে

গোরা, তপন ও আমি—তিনজনে কলকাতার আশপাশের তথাকথিত সাধু, পির এদের কাছে যেতাম। ওদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিতাম। খাওয়া-দাওয়াটাও অবশ্যই করতাম ওদের ওখানে। বালক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সম্পর্কটা এমনই জমেছিল যে, যখনই ভাল-মন্দ খাওয়ার ইচ্ছা হত, তখন বালক ব্রহ্মচারীর কাছে হাজির হতাম।

একদিন গোরা বলল, তুই তো অলৌকিক ক্ষমতার মানুষ খুঁজছিস... চল আমার সঙ্গে গুরুদেবের কাছে।

বালক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রথম মোলাকাতেই তিনি বুঝে গেছিলেন যে, আমি তাঁর চেয়েও ভাল ম্যাজিশিয়ান। সুতরাং সমবেত প্রচুর ভক্তদের সামনে আমাকে এই বলে পরিচিত করালেন যে, আমি হলাম কৃষ্ণের অবতার। এই গোটা ঘটনাটা 'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা' বইতে বিস্তৃত লিখেছি।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের কাছে গেছি। তিনি আমাকে ঠিক চিনে নিয়েছিলেন। সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে 'মুড়িমিছরি একদর' না করে, আমার থাকা ও খাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সঙ্গে একটা গাড়িও অ্যালট করে দিয়েছিলেন।

এই দু'জনের কাছ থেকেই দীক্ষা নিয়েছি। দু'জনের কাছেই শুনেছিলাম, কোনও এক গুরুর কাছে দীক্ষা নিলে আর অন্য কোনও গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া যায় না। সৎ গুরুরা সেটা বুঝতে পারেন এবং আর দীক্ষা দেন না।

কিন্তু জীবনে গোটা তিরিশেক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলাম আমি। বুঝেছিলাম, কোনও গুরুই 'সৎ গুরু' হয় না।

একবার, গোরার মা-বাবার অত্যন্ত অনুরোধে গোরাদের বাড়িতে আমাকে যেতেই হল। ওর বাড়িতে যেতেই ওর মা-বাবা কৃষ্ণের অবতার জ্ঞানে আমার পা ধুইয়ে দিলেন, মুছিয়ে দিলেন এবং আমাকে প্রণাম করলেন। আমার শত বাধা শুনলেনই না। আমি লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলাম। আর বালক ব্রহ্মচারীর ওপর শোধ তুলেছিলাম ওনার মৃত্যুর পর।

ওনার নির্বিকল্প সমাধির ভান্ডাফোড় করে পানিহাটিতেই সভা করেছিলাম।

সেই সভা বিশাল সাড়া পড়েছিল। তারপর হাইকোর্টে বিচারপতি শ্যামল সেনের এজলাসে মামলা করেছিলাম। এরপর ওনার মৃতদেহ দাহ করে শান্তির শ্বাস নিয়েছিলাম।

মাঝে-মাঝেই ভোরবেলায় বেরিয়ে যেতাম। সঙ্গী আমি, তপন ও গোরা। যেতাম নিমতায় নারায়ণ ঠাকুরের আশ্রমে। হেঁটেই যেতাম নাগেরবাজার, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, দুর্গানগর হয়ে মাঝেরহাটি। দুর্গানগর ও মাঝেরহাটি তখন ফাঁকা ফাঁকা শুনশান। বিশাল বিশাল মাঠ আর জলা, জঙ্গলে ভরা। তার ভিতর দিয়েই কাঁচা-আধপাকা রাস্তা। দু'একটা দোকান। মিষ্টি, চা, পানবিড়ি ইত্যাদির দোকান। পৌঁছতাম নারায়ণ ঠাকুরের আশ্রমে।

ওটাই আশ্রম ও বসতবাড়ি। সামনে খোলামেলা উঠোন। ভালই ভক্ত সমাগম হত। ভক্তরা ফলমূল, মিষ্টি ইত্যাদি গুরুদেবকে নিবেদন করত। আমি সরাসরি বলতাম, ঠাকুর আমার খুব খিদে পেয়ে গেছে। বলে ওগুলো নিতাম। আমরা তিনজনে ভাগ করে খেতাম। আর অন্য ভক্তরা ড্যাবড্যাব করে দেখত।

নারায়ণ ঠাকুরের তখন হিক্কা রোগ হয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে 'হিক্ হিক্' করে হিক্কা তোলে। বললাম, তুমি লোকের রোগ সারাও, আর তোমার হিক্কা রোগ সারাতে পারছ না? হয় তোমার রোগ সারাও নচেৎ আমাকে বলো আমিই সারিয়ে দেব।

বললাম, একটা কাগজের ঠোঙা আনাও। ঠোঙা এল। বললাম, ঠোঙাটার খোলা মুখটা মুখে চেপে ধরো। ঠাকুর তাই-ই করলেন। 'হিক্কা' সেরে গেল।

বললাম, যখনই হিক্কা আসবে তখনই এরকম করতে। উনিও তাই-ই করতেন। শেষ পর্যন্ত ওনার হিক্কা রোগ সেরে গেল।

এরকম সাধু-সন্তদের খবর পেলেই আমরা দৌড়তাম তাদের সাক্ষাৎ করতে। সেইসব বাবাজিদের অলৌকিক ক্ষমতার দাবির ভান্ডাফোড় করতাম। ভান্ডাফোড়েই ছিল আমাদের আনন্দ।

এইসব গুরুবাবাজির সামনে আংটি পরে, কখনও বা রুদ্রাক্ষ পরে যেতাম। ভড়ং ধরতে ভড়ং করে যেতাম। সঙ্গীরাও ভড়ং করেই যেত। বাবাজিরা কাত হতেন। তারপর ভান্ডাফোড় করতাম।

কলেজে পড়তে পড়তে কলেজ স্ট্রিট দাপিয়ে বেড়াতাম। পত্র-পত্রিকাগুলোতে প্রচুর লিখতাম। সেই সূত্রে প্রচুর পরিচিতি হচ্ছিল। বন্ধুত্ব হচ্ছিল নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের ধারণা ছিল, আমি ও আমার বন্ধুরা কলকাতা শাসন করার ক্ষমতা রাখি। লেখকও মিশুকে বলে একটা সুনাম ছিল আমার। পাড়ার লোকেরা আমার লেখা পড়ে আমাকে জানাতেন, 'লেখাটা পড়েছি'। তাতে আমি উৎসাহিত হতাম।

আমার বন্ধুদের এক-একটা খোপে রেখেছিলাম। তপন, গোরা, দিলীপ, সিতু হল কলেজের বন্ধু। বিলাস হল শ্যামবাজারের আড্ডাখানার বন্ধু। আর দমদম পার্কের প্রচুর বন্ধু। তাদের মধ্যে কাছের ছিল বাবলু এবং দীপক। দীপক, বাবলুর সঙ্গে পাড়ায় প্রচুর দুষ্টুমি করেছি, পাড়ায় অন্যরা তা টেরও পায়নি। প্রচুর আড্ডাও দিয়েছি পাড়ায় এবং আরও বিভিন্ন জায়গায়।

ঘাটের কথা

নাইট কলেজ। তাই রাত ন'টা পনেরো থেকে সাড়ে ন'টায় বাড়ি ফিরতাম। তারপর বেরোতাম আড্ডা দিতে। চার নম্বর ট্যাঙ্কের ঘাটে ছিল আমাদের আড্ডা। চলত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত। খেলা থেকে রাজনীতি সবই আলোচনায় থাকত। বন্ধুদের ভিতর রাজনৈতিক চেতনা বাড়াবার চেষ্টা করতাম। অশ্লীল আলোচনা ছিল অনুপস্থিত।

আমাকে একরাতে শ্যামাদা আর তাঁর বন্ধুরা জ্ঞান দিলেন যে, তোমার বাবা রিটায়ার করেছেন। পড়াশুনা না করে এরকম আড্ডা দিলে, জীবন তো ঝরঝরে হয়ে যাবে। আর একগাদা ছেলের মাথা খাচ্ছো তুমি।

বললাম, ওদের রেজাল্ট খুব খারাপ হলে আমি কী করতে পারি? আমার সঙ্গে আড্ডা দিতে বারণ করে দিন। আমাকে নিয়ে আপনাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই।

আমার সঙ্গে যারা আড্ডা দিত, তাদের কেউ কেউ খারাপ রেজাল্ট করত, ফেল করত। তারা তো আমার মতো রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত একমনে পড়াশুনা করত না। আমি বি কম পড়তে পড়তেই বি কম-এর ছাত্রদের পড়িয়েছি।

বি কম পাস করার পর গোটা তিনেক ব্যাঙ্কের চাকরি পাই। স্টেট ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়ি।

একদিনের ঘটনা। অলৌকিক নয়, লৌকিক অনুষ্ঠান করার শেষে এক সাংবাদিক আমার কাছে এলেন। বললেন, আপনার কোয়ালিফিকেশন কী আছে? আমি বললাম, স্কুল ফাইনাল পাস।

বেশ কিছুক্ষণ পর উনি আমার ফ্ল্যাটে এসে রাগত স্বরে বললেন, আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বললেন কেন? আপনার তো মাস্টার্স ডিগ্রি আছে।

বললাম, আমি মিথ্যে কিছুই বলিনি। স্কুল ফাইনাল পাস না করে কি ডিগ্রি পাওয়া যায়?

আমার এই কোয়ালিফিকেশন জাহির না করার একটা অন্যতম কারণ ছিল। যদি নাকি সাধারণ মানুষ শোনে যে প্রবীর ঘোষের বড় বড় ডিগ্রি আছে, তাহলে

সাধারণ মানুষ ভাববে যে প্রবীর ঘোষের প্রচুর পড়াশুনা আছে তাই উনি পারেন, আমরা কি ওসব পারব। এই চিন্তা সাধারণ মানুষের মাথা থেকে তাড়াতে আমি নিজেকে পুল ডাউন করে রাখতাম।

পাড়ায় তখন চুরি হত। চুরি বন্ধ করার জন্য নাইটগার্ড গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেকটা বাড়ির একজন করে ছেলে বেরোত নাইটগার্ড দিতে। রাত্তিরে চলত চা তৈরি করে খাওয়া বিস্কুট সহযোগে। আর আড্ডা দিতে দিতে মধ্য রাত। ওদের আড্ডা শুনতাম, কিন্তু আমি কখনও আমার রাজনৈতিক পরিচয়টা ডিসক্লোজ করিনি। মনে রাখতাম, জলে মাছের মতো মিশে যেতে গেলে নিজের কোনও গোপন কথা কাউকেই বলতে নেই।

কলকাতা শাসন করার ক্ষমতাটা শ্যামনগরের মস্তানরা জানত। তখন পাশের পাড়া শ্যামনগর ছিল গুন্ডাদের পাড়া। খুন-খারাপি, বোমাবাজি, লুঠপাট মাঝে-মাঝেই চলত। পিস্তল ও রিভলবারের চল হয়নি তখনও। বোমা, চপার, ভোজালি, বিশাল বিশাল তলোয়ার নিয়ে হইহই করে গুন্ডাবাজি করত মস্তানরা।

ওখানকার একজন স্কুল টিচার ছিলেন নিমাই মণ্ডল। ইনিই পরে আমার ছেলের গৃহশিক্ষক হন। আমি একদিন শ্যামনগর রোডে ঢুকতেই, নিমাইবাবু তাঁর দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, প্রবীরবাবু ভাল আছেন।

—বললাম, হ্যাঁ।

—বললেন, শুনলাম আপনি ঢুকছেন। তাই ভাবলাম আপনার সাথে দেখা করে যাই।

—বললাম, কার কাছে শুনলেন?

তিনি বললেন, পাড়ার গুন্ডা-মস্তানরা বলল, প্রবীর ঘোষ ঢুকছে-রে, ভাগ, বলে সবাই ভেগে গেল।

যে কোনও ভাবেই হোক আমার রাজনৈতিক পরিচয়টা দমদম পার্ক ও শ্যামনগরের মস্তানদের আবছা-আবছা জানা ছিল। তাই বোধহয় সমস্ত গুন্ডাবাজি, বোমাবাজি আমাদের বাড়ির আশপাশ এড়িয়ে হত।

জয়া সিনেমা হলে যখন সিনেমা দেখতে যেতাম, সমস্ত টিকিট ব্ল্যাকারদের টিকিও খুঁজে পেতাম না। থানায় ফোন করে দিয়ে বলতাম, ব্ল্যাকারদের ধরে দুটো টিকিট পাঠিয়ে দিন।

শ্যামনগরের গুন্ডাদের নেতা ছিল পুচু মুখার্জি। সিপিএম থেকে ফরোয়ার্ড ব্লকে গিয়েছিল। খুব স্বাস্থ্যবান।

শ্যামনগর তখন গরিব অধ্যুষিত এলাকা। সেখানকার লোকজনকে বিপদে-আপদে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত পুচু। বিয়েতে অর্থ সাহায্য করে, হাসপাতালে ভর্তি করতে সাহায্য করে, টাকা সাহায্য দিয়ে সে একটা রবিনহুড ইমেজ তৈরি করেছিল।

দমদম পার্কের সিপিএম-এর মস্তানদের এই ধরনের চরিত্রের কোনও সুপার হিরো ছিল না। মস্তানরা লেখাপড়া না করে, বেকার জীবনে গুন্ডামি করেই বেড়াত।

একদিন আমাদের বাড়ির প্রায় পাশে দোতলা বাড়িটার কাজ প্রায় শেষ। হঠাৎ বিশাল বিস্ফোরণ। পাড়ার কয়েকটি সিপিএম মস্তান বোমা বাঁধছিল সেখানে। তিনটি ছেলে ঘটনাস্থলেই মারা গেল। আহত হল শম্ভু।

দেখলাম, সিপিএম নেতৃত্বের করিশমা। বেদি তৈরি করে ওদেরকে শহিদ বানিয়ে দিল। জানাল ওই তিনজন নকশালদের আক্রমণে নিহত হয়েছে। গল্পের গরু গাছে উঠল।

ধনী কন্ট্রাক্টর সুশীল মুখার্জির বড়ই দেমাক। একদিন উঁচু দেওয়ালে তোলা বাড়ির উল্টোদিকের বাগানে ওর কর্মচারীরা একজনকে গাছের সঙ্গে বেঁধে প্রচুর পেটাচ্ছিল। ওর চিৎকার শুনে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু কিছুই করার হিম্মত কেউ দেখালই না।

কালীপুজোর বিসর্জনের রাতে, বলতে গেলে ভোর-রাতে সুশীল মুখার্জির বাড়ির বারান্দায় উঠে আমি আর দীপক দু'জনে মিলে প্রচুর হাগু করে এলাম। তারপর তো বাড়িতে এসে যথারীতি ঘুমিয়েও পড়েছি। ঘুম থেকে উঠে শুনলাম, সুশীল মুখার্জির বাড়ি আর বাগানে ধুন্ধুমার কাণ্ড হচ্ছে। রাতের বেলায় বারান্দায় হেগে গিয়েছে নাকি সলিল। তাইজন্য ওকে নারকোল গাছের সঙ্গে বেঁধে প্রচুর প্রহার করা হচ্ছে। দেবুদা অ্যান্ড পার্টি সলিলকে উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সুতরাং সুশীল মুখার্জির লেঠের বাহিনী বনাম দেবুদা অ্যান্ড পার্টির লেগে গেছে প্রচণ্ড লড়াই। পুলিশ এসে লেঠেল বাহিনীর সবাইকে এবং পাড়ার কিছু ছেলেকে ভ্যানে তুলে নিয়ে গেল।

পাড়ার যেসব ছেলেদের দমদম পুলিশ ভ্যানে ওঠাল, তারা কোর্ট থেকে ফিরে সবাই শান্ত হয়ে গিয়েছিল। সে মঞ্জুল থেকে খুকু, সলিল সব্বাই। দেবুদা পাড়াই ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু ফাঁকা ভরাট করতে উঠে এল রাম, মিহির নামে দু'জন মস্তান। তিন নম্বর ট্যাঙ্কে থাকত। ওদের পরিবারের সবাই মস্তান। উত্তর কলকাতার কোনও একটা অঞ্চল থেকে ওরা এসেছিল। পাড়ায় মস্তানি করতে মাঝে-মাঝেই ট্যাক্সি করে বেপাড়ার মস্তানদের নিয়ে হাজির হত। আমি বুঝে নিয়েছিলাম, বড় গোলমালে জিততে হলে ছোট গোলমালে যেতে নেই।

আমি তখন বক্সিং প্র্যাকটিস করতাম। স্কিপিং করতাম। আর মাঠটায় দৌড়ে দশটা করে চক্কর কাটতাম। খড়্গপুরের সুশীল রায়চৌধুরিদা আমাকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এস ও পিসি-তে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

পাড়ার প্রচুর উদ্দীপনার সঙ্গে স্পোর্টস হত। তখন পাড়ায় প্রচুর ছেলেরা ফুটবল খেলে। সুতরাং জলোচ্ছ্বাসের অভাব ছিল না। দশ মাইল রেস-এ আমি

নামতাম। আমিই একমাত্র প্রতিযোগী, যে ফুলপ্যান্ট পরে দৌড়াতাম এবং ফার্স্ট হতাম। এই কৃতিত্ব অবশ্য আমার না। নিষ্ঠার সঙ্গে বক্সিং প্রাকটিস করা কম্পিটিটার থাকলে, আমি হারতাম—এও জানি।

রাম-মিহিরের অত্যাচারের মাত্রাটা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। দমদম পার্কের মানুষদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। পরিণতিতে একদিন জনরোষের মুখে ওদের উপর নেমে এল গণধোলাই।

আমার সেদিন জ্বর। তাও রাম-মিহির কেমন ধোলাই খাচ্ছে দেখতে হাজির হলাম। দেখলাম ওরা কুকুর কুণ্ডলী হয়ে মার খাচ্ছে। তবে সবই কিল-চড়। এ তো পকেটমারদের মার খাওয়া ও হজম করার কৌশল।

আমি এগিয়ে গেলাম। মিহিরের কলার ধরে দাঁড় করাবার চেষ্টা করতেই মিহির মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিল। আমি ওর থুতুনিতে একটা হুক করেই নাকে একটা পাঞ্চ করলাম। এই প্রথম রক্তাক্ত মিহির ভূমি শয্যা নিল। ওই অবস্থা দেখেই রাম পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বলল, আর কোনও দিন মস্তানি করব না।

রাম-মিহিরের রাজত্বের অবসান হল।

একটা দুষ্টুমির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

তখন দমদম পার্ক পাড়াটা ছিল ভাল এবং খারাপ ছেলেদের নিয়ে গড়ে ওঠা। তবে ভাল ছেলের সংখ্যাই বেশি। দু'নম্বর ট্যাঙ্কে থাকতেন অমূল্য মুখার্জি। তাঁর ছেলে মঞ্জুল আমাদের সমবয়স্ক। কিন্তু প্রকৃতিতে গুন্ডা। কথায় কথায় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হলে, শ্যামনগরের মস্তানদের নিয়ে হাজির হত।

একবার মঞ্জুলদের বাগানে প্রচুর ফুলকপি হয়েছে। এক মধ্যরাতের পর আমি আর দীপক মঞ্জুলদের বাগানে ঢুকে এক-একটা ফুলকপিকে হাতের মুঠোয় ধরে ঘুরিয়ে ভাঙলাম।

তারপর সেগুলোকে দু'নম্বর ট্যাঙ্কের জলে ফেলে দিলাম।

বাঃ, কী সুন্দর—ফুলকপিগুলো জলে ভাসছে দেখে বাড়ি ফিরলাম আমরা।

বাইরে থেকে দরজার শেকল তুলে গোপনে বাড়ি থেকে বেরোতাম। আবার, শেকল খুলে গোপনে বাড়িতে ঢুকে পড়তাম।

মঞ্জুল পরদিন সকালে শ্যামনগরের মস্তান নিয়ে এসে মুরগি বাড়ির সলিলদের গ্রুপকে আক্রমণ করল। এ-ব্যাপারে সলিলের গডফাদার ছিলেন দেবুদা। খুব চওড়া কব্জি। শুনেছি বক্সার। গ্রাম্য লড়াই যেমন হয়, তেমনই লাঠিসোটা নিয়ে লড়াই হতে হতেই পুলিশ এল। দু'পক্ষের একগাদা ছেলেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল।

ঘুম থেকে উঠে খবরটা শুনলাম। তিন বন্ধুতে হাসলাম।

এই মঞ্জুল পুলিশের বেদম মার খেয়ে বাড়ি ফিরল। শান্ত হল। মস্তানি ছাড়ল। শুরু হল 'হাত দেখা', জ্যোতিষ চর্চা। গুরু ধরল আমাকে।

বললাম, জ্যোতিষচর্চা করতে হাত-ছক কিছুই দেখার দরকার হয় না। একমাত্র দরকার হয় মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার। ইয়ং ছেলেমেয়েরা তোমার কাছে এলে বুঝেই নেবে, সমস্যার বিষয়—বেকারত্ব বা প্রেম। হাত দেখা বা ছক দেখাটা একটা ভান।

আমার এই উপদেশকে পুঁজি করে মঞ্জুল এখন দমদম পার্ক-এর নামী জ্যোতিষী। প্রচুর টাকার মালিক।

অধ্যায় : বারো

চাকরি জীবন ও রাজনীতি

১৯৬৬-তে স্টেট ব্যাঙ্কে ঢুকলাম। স্ট্র্যান্ড রোড-এর কলকাতা মেইন ব্রাঞ্চ। সাড়ে তিনহাজার কর্মী। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কর্মী সংখ্যার ব্যাঙ্ক শাখা।

বাঙ্গুরের L3C স্টেট বাস যেত এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত। ওই বাসে আমি নামতাম গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কাছে। ওখান থেকে হেঁটে গভর্নর হাউসকে বাঁদিকে রেখে সোজা গেলে স্ট্র্যান্ড রোড। স্ট্র্যান্ড রোডে উঠে বাঁহাতে নিউসেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর পাশেই আমাদের অফিস।

তখন অফিসের কাছে ফুটপাথে প্রচুর খাবারের দোকান। রুটি, পাউরুটি, ডিমসেদ্ধ, ওমলেট, ঘুগনি, ভেজিটেবল স্টু, কাটা ফল নুন দিয়ে, মশলা মুড়ি, বেলের মোরব্বা ইত্যাদি পাওয়া যেত। একটা দুধের দোকান ছিল। অনেকেই দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে করে একপো বা আধপো দুধ খেত।

আমাদের অফিসের পিছনে হাইকোর্ট। বাঁপাশে রাস্তা পেরোলে ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাব। সামনে স্ট্র্যান্ড রোড আর অফিসের উল্টোদিকেই হুগলি নদী।

আমাদের ব্যাচে নিয়োগ হয়েছিল প্রায় ১২৫ জন। এর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ হলেন মহিলা।

শুনেছিলাম অফিস বিল্ডিংটা ছিল সিরাজ-উদ-দৌলার নাচ ঘর। দোতলার সিলিং ছিল তিরিশ ফুট উঁচু। প্রচুর রঙিন কাচ দিয়ে ঘেরা জানালা। লম্বা লম্বা টেবিল। টেবিলের দু'পাশে কর্মচারীরা বসতেন। কিছু সিঙ্গল টেবিলও ছিল। সব আসবাবই বার্মাটিক-এর।

এখানে ঢুকে অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, বয়স্ক কর্মীদের অভাবনীয় সব অপকর্ম।

পেপারওয়েট হত বালি ঢোকানো মোটা কাপড়ের ছোট কোলবালিশ আকারের। ওগুলো পেপারওয়েট ছাড়াও এর ওর গায়ে ছুড়ে মারার কাজে ব্যবহৃত হত। বয়স্ক, প্রবীণ কর্মীদের গায়ে তরুণ কর্মীরাও লুকিয়ে বালির ওই বস্তা ছুড়ে আঘাত করে বিকৃত আনন্দ পেত। এদের আবার পালের গোদা ছিলেন সৌমেন দেব। এই বিকৃত র‍্যাগিং-এ ইন্ধন জোগাতেন এবং অংশ নিতেন প্রবীণ বেশ কিছু মানুষ। এমনকী ধুতি পরে যাঁরা অফিসে আসতেন, তাঁদের ধুতি খুলে নেবার মতো এবং

তাতে আনন্দ পাওয়ার মতো রুচির মানুষও ছিল। ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের সামনেই এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটত। আমাদের ডিপার্টমেন্টেই বসতেন ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি নির্মল গোস্বামী। রোগা, লম্বা, ধূর্ত মানুষ। মার্কসবাদী কমরেড। বসতেন সৌমেন দেবের পাশে।

আর একটা ব্যাপার তখন ঘটত। প্রায় প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে ম্যাগাজিন ক্লাব ছিল। তাতে প্রচুর পর্নো বই কেনা হত। মহিলা কর্মীরাও এ-বিষয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। মহিলাদেরও কিছু ম্যাগাজিন ক্লাব ছিল। তাতেও রাখা হত প্রচুর পর্নো বই।

নির্মলদাকে পর্ণো লাইব্রেরির ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, তুই স্টাফদের বোঝা। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুই করা যায় না। এমন কিছু করতে গেলে পারবি না।

তখন সিপিআইএম-এর একচ্ছত্র রাজ। ইউনিয়ন ব'কলমে সিপিআইএম-এর। ইউনিয়নে মাসলম্যানের অভাব নেই। তাদের লিডার রবিন চক্রবর্তী। একটা পা ছোট। রবিন এসেও আমাকে জ্ঞান দিয়ে গেল। আমি সরাসরি ব্রাঞ্চের সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে জানালাম, পর্নো বই নিয়ে লাইব্রেরি চালাবার ঘটনা। বললাম, কালকের মধ্যে সব নোংরা বই ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। নতুবা পুলিশ কমিশনারকে জানাতে বাধ্য হব। লালবাজার থেকে পুলিশ এসে এক একটা টেবিলের ড্রয়ার থেকে পর্নো বই বের করবে, স্টাফদের অ্যারেস্ট করবে। মিডিয়াগুলো আসবে। ছবিসমেত খবরটা বের হবে। এতে কি আপনার সম্মান, ব্রাঞ্চের সম্মান বাড়বে?

না। আর বেশি কিছু বলতে হয়নি। আমার কথা যে ফাঁকা আওয়াজ নয়, এটা নির্মলদা খুব ভালই বুঝেছিলেন। কারণ যারা কলেজ স্ট্রিট শাসন করত, সেই নকশালদের অনেকেই আমার অফিসের সিটের আশপাশে এসে বসত। নিচু গলায় দীর্ঘক্ষণ কথাও বলত। আমি তখনই পরিবর্তন ও যুগান্তরের নিয়মিত লেখক। আমার থেকে সিনিয়াররাও প্রবীরদা বলে সম্বোধন করতেন। সব মিলিয়ে আমি যে কিছুটা রহস্যজনক চরিত্র, এটা সহকর্মীরা বুঝতেন। অতএব পরের দিনই বড় বড় বস্তায় পুরে হুগলি নদীতে বিসর্জন দেওয়া হল পর্নো-রাশি।

এরপর র‍্যাগিংও বন্ধ করেছিলাম। অত না বুঝিয়ে বলেছিলাম, এরপর যারা সিনিয়ারদের র‍্যাগিং করবে, তাদের ধরে কেউ রাস্তায় ন্যাংটো করে খবরের কাগজ পরিয়ে ছেড়ে দিলে, আমি জানি না।

স্কুল জীবনে দামড়া পেটানো দিয়ে শুরু করতে পেরেছিলাম বলেই অফিসের ডবল-দামড়াদের শায়েস্তা করতে পেরেছিলাম সেদিন। তারপর র‍্যাগিং বন্ধ এবং শুধুই এগিয়ে যাওয়ার অধ্যায়।

অমর, সবিত, তুষারদা, গুপ্তদা আমার সহকর্মী ছিলেন। অমর আর সবিত আমার সঙ্গে একই দিনে ব্যাঙ্কে ঢুকেছে। অমর রোজই ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসত। খুব শান্তশিষ্ট, ভদ্র। সবিত স্বাস্থ্যবান। আমার নীতিবোধকে খুবই শ্রদ্ধা করত অমরের মতো।

তুষারদা ইউনিয়ন করত। স্বাস্থ্যবান নয়, কিন্তু, হাতদুটি ফাঁক করে গটগট করে হেঁটে স্বাস্থ্যবান সাজার চেষ্টা করত।

গুপ্তদা বেঁটেখাটো, স্বাস্থ্যবান। আমার থেকে বছর কুড়ি বড়। সবসময়ই হাসি-খুশি। আমাদের এক সহকর্মী অমিয়দার পেছনে খুব লাগতেন। অমিয়দা চট করে রেগে যেতেন।

অমিয়দাকে বলতেন, এই হুলো তোর পোঁদে মুলো।

অমিয়দা উত্তরে বলতেন, এই হুলো তোর পোঁদে আছোলা বাঁশ।

গুপ্তদা হেসে বলতেন, কই মিলল।

অমিয়দা রাগত স্বরে বললেন, না মিলল না মিলল। তোর পোঁদ তো ছিঁড়ল।

এটাই ছিল সেই সময়কার স্টেট ব্যাঙ্কের কালচার।

দারোয়ানদের টাকা ঘুষ দিয়ে কোনও কোনও ছেলে-মেয়ে অফিস আওয়ারর্স-এর পর দারোয়ানকে পাহারায় রেখে নিজেরা সঙ্গমও করত।

অফিসের সহকর্মী অশোক ব্যানার্জি। আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়। শীর্ণ চেহারা। শীর্ণতার জন্য কিছুটা কুঁজোও হয়ে গেছেন। উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। পরনে ধুতি আর সাদা পাঞ্জাবি। একটু পাগলাটে। সকাল দশটা থেকে অফিস। উনি আসতেন সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা। এটা ওনার নিত্যদিনের কর্মপদ্ধতি।

অশোকদার কাছ থেকে কেউ নাকি আজ পর্যন্ত কোনও খাবার আদায় করতে পারেনি। একদিন আমরা কয়েকজন মিলে একটা প্ল্যান করলাম। আমাদের সেকশনে সিনিয়র মোট দু'জন হলেন প্রভাত মিত্র ও মণি দালাল। মণিদার উপর দায়িত্ব দিলাম অশোকদার ছেলের জন্মদিন কবে জেনে নিতে। বাড়িটা দমদম নাগেরবাজার অঞ্চলে। প্রভাত মিত্র দ্রুত হাতে একটা করে চিঠি লিখতে লাগলেন সেকশনের প্রত্যেক স্টাফের নামে।

'আমার ছেলের জন্মদিন (অমুক) তারিখে। সেইদিন সন্ধ্যায় আপনাদেরকে প্রীতিভোজের আমন্ত্রণ করছি। আপনারা সেদিন আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমার সন্তানটিকে আশীর্বাদ করে আসবেন। অনুরোধ।

ইতি

অশোক ব্যানার্জি'

মণিদা সবার হাতে হাতে চিঠি বিলি করলেন এবং বললেন অবশ্যই আমরা একসঙ্গে যাব। আর একটা চিঠি দেওয়া হল অশোকদার হাতে। আমরা বললাম, কোনও চিন্তা নেই। আমরা সেদিন চলে যাব।

অশোক ব্যানার্জি চিঠি পড়ে রাগে তেড়ে গালমন্দ করতে লাগলেন।

দিনটা এল। চাঁদা তোলা হয়ে গেল। ঠিক হল অশোক ব্যানার্জি খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা না করলে আমরা বাইরে কোনও একটা হোটেলে খেয়ে নেব।

অ্যাডভান্স পার্টি হিসেবে আমি আর সেকশনের প্রদীপ ব্যানার্জি দু'জন শ্যামবাজার থেকে একটা ভাল ক্যারাম কিনে ট্যাক্সি ধরে অশোকদার বাড়ি হাজির হলাম।

অশোকদার বাড়ি টুনি বাল্ব দিয়ে সাজানো হয়েছে। বাগানের গাছগুলোও টুনি বাল্ব দিয়ে সেজেছে। আর মাইকে সানাই বাজছে।

উরি বাবা! এ তো এলাহি ব্যবস্থা।

ঘুরে ঢুকলাম। অশোকদা নেই। বউদি আছেন। লম্বায় ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি হবে। ওজনটা পঁচাত্তর কেজির কম নয়। আমি বউদিকে দেখে একগাল হেসে বললাম, বউদি আমার নাম প্রবীর। বউদি একগাল হেসে বললেন, আপনার নাম খুব শুনেছি। আপনি তো লেখেন আর খুব দুষ্টুমিও করেন।

—বউদি এরা তো সব দূর দূর থেকে এসেছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে চলে যাবে। আপনি আমাকে সব বুঝিয়ে দিন কোথায় কী আছে, আমি সব দেখে নিচ্ছি। তারপর রাঁধুনির কাছে গিয়ে বললাম গোটা তিরিশ ফিশফ্রাই ভেজে ফেলো। ভাজা হয়ে গেলে তিরিশটা প্লেটে ফিশফ্রাই ও এক কাপ করে কফি সবাইকে দিয়ে দাও। আমি একটা ফ্রিশফ্রাই খেতে খেতে তদারকি করছি। খাবারের জায়গায় ফোল্ডিং টেবিল পেতে তার উপর কাগজের রোল টেনে দিলাম। ফটাফট কাগজের প্লেট আর মাটির গ্লাস পেতে দিলাম।

খাওয়ার পরিবেশনে এক আর একমাত্র লোক আমি। একটা প্লেট আমার জন্য ফাঁকা রেখে ঝড়ের মতো পরিবেশন শুরু করলাম। তখন সেই সময় অশোকদা এসে হাজির। তিনি বললেন, আরে প্রবীর তুমি থাকতে আমার আর চিন্তা কী? দাও আমিও হেল্প করি।

বললাম, আমিও খেতে বসে যাচ্ছি। তুমি আর কার কী লাগবে এগুলো দেখভাল করো।

নাঃ, কোনও তিক্ততাই হল না, খুব আনন্দই হল সেদিন।

স্টেট ব্যাঙ্কে ঢোকার পর বহু বিখ্যাত ফুটবলার ও ক্রিকেটারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তখনকার দিনে বাংলার প্রায় সমস্ত ক্রিকেটার ও ফুটবলাররা ছিলেন

স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মী। তাঁদের সবার সঙ্গেই আমার আলাপ পরিচয় হয়েই গেল। কারও কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হল। এঁরা হলেন আমার আরেকটা খোপের বন্ধু।

তখন কেন জানি না অনেকে তাঁদের অনেক সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসতেন।

তেমনই দমদম পার্কে আমার বাড়িতে হঠাৎ একদিন এসে হাজির ভারতীয় ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন। আমাকে বললেন, অনেক ভরসা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। সমস্যাটার সমাধান আপনাকে করতেই হবে। আমার বোনের সঙ্গে একটি ছেলের বছর দুই প্রেম চলছিল। ছেলেটি স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার। নাম অমুক। আমার বোনকে প্রেগনেন্ট করে এখন বিয়ে করতে চাইছে না।

বললাম, ঠিক আছে। ছেলেটির বাড়িতে গিয়ে বলুন, বাবা-মাকে নিয়ে আমার সঙ্গে যেন দেখা করতে আসে কালই সকালে।

পরদিন সকালেই ছেলেটির বাবা ও দিদি এসে হাজির। ছেলেটির দেখা নেই। দু'জন আমাকে আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করল, ওদের ছেলেটি দোষী নয়। কার সন্তান ওর গর্ভে ধারণ করেছে কে জানে! কারণ আরও অনেকের সঙ্গেই মেয়েটির সুসম্পর্ক ছিল।

ইতিমধ্যে আমি ও'পাড়া থেকে খবর সংগ্রহ করেছিলাম যে, ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। একটা ফালতু মিথ্যে ভয় দেখালাম—সন্তান হয়ে গেলে তার ব্লাড গ্রুপ আর আপনার ছেলের ব্লাড গ্রুপ মিলে গেলে তো হয়েই গেল। আপনার ছেলের জেল হবে, চাকরিও যাবে। ছেলেটিকে বোঝান আর কথা না বাড়িয়ে বিয়ে করে নিতে।

দিদি বললেন। মেয়েটির ন'মাস চলছে। এখন কী করে বিয়ে দেওয়া সম্ভব?

বললাম, ঠিক আছে। আমার ছেলেরা যাবে, আপনার ভাই-এর দুটো হাতের কব্জি ভেঙে দিয়ে চলে আসবে।

সাতদিনের শিশুসন্তান কোলে নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসল মেয়েটি। পাত্র ওই ছেলেটি। আমিও হাজির ছিলাম দেখতে যে, বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হচ্ছে কি না।

আরেকটি ঘটনা। গত শতকের সাত এর দশকের প্রথমার্ধ। সে-সময়ে 'যুগান্তর' ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় এক পাতা জুড়ে আমার লেখা দুটি আর্টিকেল বেরিয়েছিল। বিষয়টা ব্যাঙ্কের দুর্নীতি। কয়েকটি ব্যাঙ্ক থেকে ২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হত প্রতিবছর। জড়িত থাকত উচ্চপদের ব্যাঙ্ক কর্মচারী। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অব বরোদা—এই তিন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান একাজ করেছে তার ডিটেল তদন্তমূলক রিপোর্ট দিলাম। এর সঙ্গে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক তিনটির দুর্নীতি ও আর্থিক বেনিয়মের খবরও ছিল।

খবরটি প্রকাশ হতেই প্রথম তিনটি ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার হল। চাকরি গেল। পরের তিনটি ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করল সরকার। আমার সহকর্মীরা ভাবলেন, আমি খুন হয়ে যাব। ঈর্ষাকাতররা লাফাতে লাগল—'এবার প্রবীরের চাকরি যাবে' ভেবে।

স্টেট ব্যাঙ্ক আমাকে শোকজ করল। শোকজ করতেই যুগান্তর ও অমৃতবাজারের নিউজ এডিটর দু'জনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। যুগান্তরের নিউজ এডিটর তখন অমিতাভ চৌধুরি আর অমৃতবাজারের নিউজ এডিটর দেবব্রত ব্যানার্জি। দু'জনেই জানতে চাইলেন আমি কি লড়ে যেতে চাই? জানালাম—নিশ্চই লড়ব, আপস করব না।

তখন কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি। ওনারা বললেন, প্রণব মুখার্জিকে বিষয়টা জানিয়ে রাখবেন। প্রণব মুখার্জিকে ফোনে সব জানালাম। তারপর ইউনিয়নের নেতা নির্মলদাকে শোকজের বিষয়টা জানালাম। নির্মলদা বললেন, কোনও পত্রিকায় লিখবার জন্য লিখিত পারমিশন নিয়েছিলি? বললাম, না। নির্মলদা বললেন, তাহলে ইউনিয়নের কিছুই করবার নেই। তুই বেআইনি কাজ করেছিস্, তুই সামলা।

যথাসময়ে হেড অফিসে হাজির হলাম। চিফ জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার রঞ্জিৎ সিন্‌হার চেম্বারে ঢোকার আগে মুখোমুখি হতে হল চিফ্ পিআরও মিস্টার বাগের। বাগ বললেন, আপনাকে ডিসচার্জ করার চিঠি আজই ধরিয়ে দেওয়া হবে।

মিস্টার সিন্‌হার চেম্বারে ঢুকলাম। তিনি সামনের চেয়ারে বসতেও বললেন না। তিনি খুব অল্প কথায় বললেন, আপনি লেখার কোনও পারমিশন নিয়েছিলেন? আপনার এইটুকু বোধ নেই যে, ব্যাঙ্কে কাজ করে ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লেখা যায় না সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল অনুযায়ী? এ বিষয়ে আপনার কিছু বলার আছে?

আমি বললাম, বসছি। সামনের চেয়ারে বসলাম। এরপর বললাম, না, লেখার অনুমতি নেই। কিন্তু এই লেখাটার পরে পরেই স্টেট ব্যাঙ্কের দুর্নীতি নিয়েও ভাল কিছু খবর পেয়েছি। আপনি বুঝছেন না কেন যে, যে ছ'টা ব্যাঙ্কের দুর্নীতি নিয়ে আমাকে যাঁরা তথ্য-প্রমাণ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁরা চেয়ারম্যানের সমপর্যায়ের অফিসার?

মিস্টার সিন্‌হা প্রচণ্ড রেগে গেলেন। বললেন, কী খবর পেয়েছেন?

বললাম, দশ হাজার কোটি টাকার রিকন্সিলেশন স্টেটমেন্ট এখনও আপনারা তৈরি করতে পারেননি। এই দশহাজার কোটি টাকার মধ্যে একটা মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে দুর্নীতি হয়ে থাকতেই পারে। আমার চাকরি গেলে, আমি লিখে সংসার চালিয়ে নেব। কিন্তু আপনি জেল-এ গেলে, আপনার চাকরি গেলে কী হবে—সেটা ভাবুন।

যেন, জোঁকের মুখে চুন পড়ল। তিনি আমাকে তুষ্ট করতে দুপুরে আমার

সঙ্গেই লাঞ্চ ক্লাবে লাঞ্চ করলেন। বম্বে-তে টেলেক্স করে আমার লেখার অনুমতি এনে দিলেন।

বেরোবার সময়ে দেখি সিপিএম-এর নেতারা হাঁ করে অপেক্ষা করছে কী হয়, কী হয়!

না, কিনে রাখা বাজিগুলো ওদের আর ফাটানো হল না।

জুলাই ২০০৫-এ অবসর নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু 'স্বেচ্ছাবসর' না নিয়েই জুলাই ১৯৯৯-তে চাকরি ছাড়লাম। 'স্বেচ্ছাবসর' নিয়ে টাকা লুঠের ব্যাপারটা দু'চক্ষে দেখতে পারতাম না, খুব খারাপ লাগত।

আমার জমানো ছুটি বলে কিছু ছিল না। নানান কাজে ছুটি নিয়ে নিয়ে সেসব ফুরিয়ে যেত। বাড়তি ছুটি নিয়ে উইদাউট পে-ও হতাম প্রচুর। বিদেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেলেও অফিস ছুটি মঞ্জুর করত না। ফলে অসুবিধা হচ্ছিল।

এর চেয়ে চাকরিটা ছেড়ে দেওয়াই ভাল মনে করলাম।

এখন আমি মুক্ত বিহঙ্গ।

আমার প্রবীণ সহকর্মী অরুণ মুখার্জি বলেছেন—

"গত শতকের ছয়ের দশক থেকেই আমি প্রবীর ঘোষের সঙ্গে পরিচিত। প্রথম যখন ও স্টেট ব্যাঙ্কে জয়েন করে, তখন ওর বয়স বাইশ-তেইশ। চেহারা মামুলি— এমন কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করিনি, শুধু করোটির আকৃতি ছাড়া। ওর মাথার আকৃতিটা একটু আলাদা ছিল। উইলিয়াম শেকস্‌পিয়রের ছবিতে লক্ষ করেছি ওইরকম মাথার গঠন।

প্রথম প্রথম কাজের সময় লক্ষ করতাম ওর প্রখর বুদ্ধি। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল। যে-কোনও ব্যাঙ্কিং-এর সমস্যা হলে খুব সহজেই বুঝে নিত ও সমাধান করে ফেলত।

পরবর্তীকালে আমি প্রবীরকে আলাদা করে লক্ষ করলাম যখন ওর অনুবাদ নজরে পড়ল। বুঝলাম বাংলা ও ইংরেজি দুটো ভাষাতেই কী অসাধারণ দখল। ওর অনুবাদ করা দুটো বই পড়েছিলাম। একটা 'জ্যস' (Jaws), আরেকটা 'দ্য গানস্ অফ ন্যাভারোন' (The Guns of Navarone)। লেখার ছত্রে ছত্রে টান টান উত্তেজনা, শিহরন, উৎকণ্ঠা। মূল ইংরেজি বইয়ের থেকে কোনও অংশে কম নয়, এত সাবলীল অনুবাদ। তখন মনে হল—এ তো সাধারণ ছেলে নয়। এর মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা লুকিয়ে আছে। অনুবাদ পড়েই ওর গুণগ্রাহী হয়ে পড়ি। সে সময় দেখলাম ওর চারিত্রিক দৃঢ়তা। যাবতীয় বিরূপতার বিরুদ্ধে ও নিজে একাই লড়ে যেতে প্রস্তুত। অফিসের কাজ এত তাড়াতাড়ি করে ফেলত এবং

তাড়াতাড়ি নিজের কাজে বেরিয়ে যেত, কেউ কোনও অভিযোগ করার সুযোগ পেত না। প্রবীর দীর্ঘ সময় জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'পরিবর্তন'-এ প্রচুর লিখেছে। যারা আড়ালে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত, তারা তা করত ঈর্ষা থেকে। আট দশকের গোড়ায় প্রবীর প্রথম কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী করেছিল ছেলেকে সঙ্গী করে। সম্ভবত ওটাই ভারতের বুকে প্রথম কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী।

সাতের দশকের কথা। তখন কলকাতায় খবরের কাগজ বলতে যুগান্তর আর আনন্দবাজার। সে-সময় যুগান্তরের সম্পাদকীয় পাতা জুড়ে প্রবীরের তদন্তমূলক একটা খবর বেরিয়েছিল। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অফ বরোদা'র তিন চেয়ারম্যানের ২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার ডিটেল খবর। সঙ্গে আরও তিনটি ব্যাঙ্কের দুর্নীতির খবর বেরোল। খবরটা নিয়ে লোকসভা তোলপাড় হল এবং ওদের শাস্তি হল। আমার মতো অনেক সহকর্মীই ভেবেছিলুম প্রবীর খুন হবে। খুন হল না, তবে একটা বড় রকমের প্রতিক্রিয়া হল। শাস্তি পাওয়া চেয়ারম্যানদের প্রতি বন্ধুত্ব দেখাতে প্রবীরকে শোকজ করল স্টেট ব্যাঙ্ক। প্রবীরকে ঈর্ষা করার মতো সহকর্মী কম ছিল না। এমনই এক বয়স্ক সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন, টুনটুনি গেছে শিকরে বাজকে ঠোক্কর মারতে।

জিজ্ঞেস করেছিলুম, কেন এটা বললেন?

দাদাটি বললেন, ধীরে রজনী ধীরে। যথা সময়েই দেখতে পাবে প্রবীরের কী অবস্থা হবে। চাকরি তো যাবেই।

শোকজের জবাব দিতে প্রবীর যখন হেড অফিসে, তখন ইউনিয়নের কয়েকজন হেভিওয়েট নেতা হাজির ছিলেন প্রবীরের চাকরি যাওয়ার বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী হতে। তারা ফিরেছিল মুখ কালো করে।

পরে প্রবীরের মুখে শুনেছিলুম, সেদিন স্টেট ব্যাঙ্কের পূর্বভারতের সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে প্রবীর বলেছিল, আমার চাকরি গেলে লিখে সংসার চালিয়ে নেব। আপনার জেল হলে, চাকরি গেলে কী হবে—সেটাই ভাবুন। প্রবীরের সাহসকে তারিফ করেছিলাম সেদিন।

আরেকবার প্রবীরের পিতৃবিয়োগের সময় ওর চারিত্রিক দৃঢ়তা নজরে পড়ল। একমাত্র পুত্র, কিন্তু কোনওরকম অশৌচের লক্ষণ দেখায়নি। কথায় এবং কাজে এক। সেই থেকেই আমি ওর মুগ্ধ ভক্ত। তারপরে বইগুলো যেভাবে বেরোতে আরম্ভ করল, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে একটা নতুন দিকের সূচনা করল। অতি কঠিন বিষয়ে ('সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ'র মতো) লেখাও ভাষার কল্যাণে সাবলীল সুখপাঠ্য হয়ে উঠল। এ ভাষা যে কী ভাষা! পড়তে পড়তে মনে হয় প্রিয় কবির কবিতা পড়ছি! হয়তো কখনও অসংসদীয় ভাষা এসে গেছে। তবু বলতেই হয় যে লেখা অত্যন্ত সুখপাঠ্য। এর একটা শব্দও শত চেষ্টা করেও বদলাতে পারিনি।

১৯৯৯ সালে প্রবীর হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিল। অনেকের মতোই আমি তারপর

দেখলুম কাশ্মীর সংক্রান্ত বইটি বেরোল। কী প্রত্যক্ষ মত—ডাইরেক্ট ওপিনিয়ন। কী নির্ভীক চিন্তা। খুব কম ক্ষেত্রে এমন নির্ভীক চিন্তার বই পড়েছি। এবার প্রবীর ঘোষ জেলে যাবে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্যে—সারা অফিস জুড়ে এইরকম প্রতিক্রিয়া দেখেছি। সারা অফিস জুড়ে গুজগুজ, ফুসফুস। স্টেট ব্যাঙ্কের প্রধান শাখার আড়াই হাজার স্টাফ—সবাইয়ের মনে অমঙ্গল আশঙ্কা। ততদিনে বুঝে গেছি (অন্নদামঙ্গলের ভাষায়) "এ তো মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।"

একের পর এক বই বেরিয়েছে এবং বলতে গেলে গোগ্রাসে গিলেছি। প্রবীরের কলম থেকে কী বেরোয়নি? কবিতা, গল্প, রুবাইয়াত (না, ওমর খৈয়ামের নয়, প্রবীর ঘোষেরই)। একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক বাদে সবই।

প্রবীর ঘোষ চাকরি ছাড়ল। ভি আর এস নিয়ে নয়। পুরো সময়ের যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী কর্মী হতে। বছর সাতেক দেরি ছিল রিটায়ারমেন্টের। ওর এমন সিদ্ধান্তে অনেক সহকর্মী অবাক হলেও আমি হইনি।

আমি প্রবীর ঘোষের থেকে অন্তত দশ বছরের বড়। কিন্তু জ্যেষ্ঠত্বের অভিমান ত্যাগ করে স্বচ্ছন্দে এবং সানন্দে কনিষ্ঠের গুণবত্তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। কমল হিরে একখণ্ড সাদা পাথর। কিন্তু তার দ্যুতিটাই তার হীরকত্বের পরিচায়ক। প্রবীর এমনই।" (প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ)

রবির বিয়ে

রবীন্দ্রনাথ দাস। ভাল স্বাস্থ্য। কথাবার্তায় ঝকঝকে। তখন সেলস্ ট্যাক্স ইন্সপেক্টরের কাজ করে। বয়সে তরুণ। থাকে আগরপাড়াতে। অসাধারণ ম্যাজিকের হাত। কুসংস্কার বিরোধী ম্যাজিক দেখানোতে মাস্টার। আমাদের অলৌকিক নয়, লৌকিক অনুষ্ঠান জমিয়ে দিত।

একদিন কাকভোরে কলিংবেল বাজল। আমি তখন দেবীনিবাসের ফ্ল্যাটে থাকি। দরজা খুলে দেখি রবি দাঁড়িয়ে আছে। সাহায্যপ্রার্থী মুখ এবং আমার কাছে এলে যে সাহায্য নিশ্চিত হবেই, তেমন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলল, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। সঙ্গে টাকা-পয়সা, জামাকাপড়ও নিয়ে এসেছি। আর বাড়ি ফিরব না, যতদিন না প্রেমিকার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে। রবির বাড়ির লোকেরও বিশাল আপত্তি আছে ওই মেয়েটির সঙ্গে রবির বিয়ের। বরং মেয়েটির অন্য জায়গায় বিয়ে হচ্ছে জেনে তারা খুশি।

ঘরে আসতে বললাম। এল। বসল। শুনলাম, ওদের পাশের বাড়ির একটি

মেয়ের সঙ্গে ওর প্রেমের সম্পর্ক। মেয়েটির আগামী পরশু বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এই বিয়েটা আটকাতে হবে। নচেৎ রবি বাঁচবে না। শুনে আমি 'থ'! এরকমভাবে বিয়ে আটকানোর কাজ করিনি।

যাকগে। বললাম, দেখছি। ওর থেকে সবকিছু জেনে নিলাম। তারপর জ্যোতি মুখার্জির বাড়িতে গেলাম। শলা-পরামর্শ করলাম। দিনটা কেটে গেল নানান যোগাযোগ আর কৌশল ঠিক করতে।

শেষে আমি আর রবির ম্যাজিক পার্টনার অধীরকে নিয়ে গেলাম রবির বাড়িতে। এ-বিয়েতে রবির বাড়িরও বিশাল আপত্তি।

একটি ছেলেকে শিয়ালদা স্টেশন থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বি আর সিং হাসপাতালে ভর্তি করেছে পুলিশ। সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। ওর পকেটে একটা চিঠি পাওয়া গেছে। সেই চিঠিতে আমার নাম-ঠিকানা লেখা আছে। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে প্রেমের কাহিনি বলা হয়েছে এবং দু'বাড়ির তীব্র আপত্তিতে ও আত্মহননকেই শেষ পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে— একথাও বলেছে রবি। এসমস্ত কথা জানালাম রবির মাকে।

রবির বাড়ির সবাই দশ মিনিটের মধ্যেই এ-বিয়েতে রাজি হয়ে গেল। এবার গেলাম মেয়ের বাড়িতে।

মেয়ের মা আছে। মস্তান ভাই আছে। মা একটি স্কুলের শিক্ষিকা। তাঁদেরকে ওই ঘটনা বললাম। তারপর অনেক ট্যাগ-অব-ওয়ারের পর মেয়েটির বাড়ির লোকও রবির সঙ্গে মেয়েটিকে বিয়ে দিতে রাজি হল। আর পরদিনই মেয়েটির ভাই চলে যাবে আগে থেকে ঠিক হওয়া পাত্রপক্ষের বাড়িতে বিয়ে বাতিলের খবর নিয়ে—এটাও ঠিক হল।

রাত দেড়টায় জ্যোতিদার বেলেঘাটার বাড়িতে এলাম। ওখানেই রবি অপেক্ষা করছিল। সবটা ডিটেলে শুনল রবি। তারপর রবি বলল, যাক্ জিতলাম। জেতাটাই বড় কথা, বিয়েটা না।

অধ্যায় : তেরো

আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংগঠনের রূপরেখা

সমাজ গড়িয়ে চলল। এল ১৯৮৫-র ১ মার্চ। এই দিনটিতে কিছু সমাজ-সচেতন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল্যায়নে সক্ষম, নিপীড়িত মানুষদের মুক্তিকামী, বেপরোয়া, নিষ্ঠ, কিছু দামাল ছেলে দমদমের একটি ফ্ল্যাটে (৭২/৮, দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪) ঘরোয়া আলোচনা শেষে গড়ে তুলল একটি সংগঠন 'ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি'। হাজির ছিলেন ডঃ অসিত চক্রবর্তী, ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল, ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য, তরুণ মান্না, গৌতম, জ্যোতি মুখার্জি, অমরেন্দ্র আদিত্য, ডাঃ ধীরেন গাঙ্গুলি এবং আরও কয়েকজন।

'ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি'র একটা 'লোগো' বা প্রতীক তৈরির ভার পড়লো আমার উপর। সমিতি আজও সেই প্রতীক-ই ব্যবহার করছে।

আমরা সিদ্ধান্তে এসেছিলাম সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কোনও বিকল্প নেই। তাঁদের ঘোষণা-পত্রে বলা হল—"আমরা সমাজ-সচেতনতার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি ভারতের শোষিত জনগণের মুক্তির জন্য এতাবৎকাল যে সকল সংগ্রাম হয়েছে তার ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ—সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের গুরুত্ব আরোপ না করা। শোষকদের রাজনীতি ও অর্থনীতি যখন শোষিতদের প্রতিরোধের মুখে সংকটে পড়ে, তখন আত্মরক্ষার চূড়ান্ত পন্থা হিসেবে শোষকরা লড়াকু মানুষদের লড়াইকে শেষ করতে সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকে দুর্নীতির সংস্কৃতির, ভাষা- ভিত্তিক সংস্কৃতির, জাত-পাতের সংস্কৃতির, ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতির, ভোগ-সর্বস্ব সংস্কৃতির, অদৃষ্টবাদী সংস্কৃতির, পূর্বজন্মের কর্মফলে বিশ্বাসী সংস্কৃতির, আপসকামী সংস্কৃতির, সুবিধাবাদীর সংস্কৃতির, ক্যারিয়ারিস্ট সংস্কৃতির, দ্বিচারিতার সংস্কৃতির, মস্তান-নির্ভর রাজনীতির সংস্কৃতির, কুসংস্কারের সংস্কৃতির, অন্ধ-বিশ্বাসের সংস্কৃতির, মগজ ধোলাইয়ের সংস্কৃতির। শোষক ও শাসকগোষ্ঠী তাদের আপন স্বার্থে, টিকে থাকার ও শ্রীবৃদ্ধির প্রয়োজনে নিপীড়িত মানুষদের মগজ ধোলাই করে তাদের একত্রিত সংগ্রামের সমস্ত চেষ্টাকে বার বার ভেঙে দিয়েছে ধর্ম, জাত-পাত বা প্রাদেশিকতার ভেদাভেদের ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে।

কুসংস্কারের আফিম খাইয়ে বঞ্চিত মানুষদের মাথায় ঢোকাতে চাইছে—প্রতিটি বঞ্চনার কারণ অদৃষ্ট, পূর্বজন্মের কর্মফল, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়া। একই সঙ্গে নিজেদের মতো করে 'দেশপ্রেম', 'জাতীয়তাবাদ', 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' ইত্যাদি বহুতর বিষয়ে ব্যাখ্যা হাজির করে লাগাতার প্রচারে সে-সব ব্যাখ্যাকে জনগণের মাথায় গুঁজে দিচ্ছে। যেন-তেন-প্রকারেণ শোষিতদের চেতনাকে কুসংস্কারের মধ্যে, মগজ ধোলাই করে ঢুকিয়ে দেওয়া ব্যাখ্যার মধ্যে বন্দি করে রাখতে পারলে ওদের প্রতিবাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে রাখা যায়। শোষকদল শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখতেই নানা ভাবে মগজ ধোলাই করে গড়ে তুলে চলেছে নতুন নতুন সংস্কৃতি, যা অবশ্যই অপসংস্কৃতি।

আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হবে সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিপ্লব, আর তাই আমাদের সমিতি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে থাকা বিভিন্ন ভ্রান্ত ও অস্বচ্ছ চিন্তাকে দূর করতে। আমরা মনে করি শোষিত মানুষদের শোষণ করার হাতিয়ার যুক্তিবাদী চিন্তার প্রবলতম শত্রু তথাকথিত ধর্ম, অধ্যাত্ম-, ভাববাদী দর্শন, বিশ্বাসবাদ ইত্যাদি। তথাকথিত ধর্মের এই যুক্তি-বিরোধী স্বরূপকে সঠিক ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে না পারলে কুসংস্কার মুক্তির, চেতনা মুক্তির, শোষক-শোষিত সম্পর্ক অবসানের কল্পনা শুধুমাত্র কল্পনাই থেকে যাবে।

যারা ট্রটস্কিবাদী-নীতি মেনে মনে করে—রাজনৈতিক বিপ্লব হলেই সব হয়ে যাবে—আমরা মনে করি তাদের এই মনোভাবের পিছনে রয়েছে সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বাস্তববোধের অভাব।

ডান-বাম নির্বিশেষে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই সংসদীয় নির্বাচনের কথা মাথায় রাখতে হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনই ক্ষমতা দখলের একমাত্র পথ। শোষক-শোষিত সম্পর্ক অবসানের কথা বলা রাজনৈতিক দলগুলোও সংসদীয় নির্বাচনে অংশ নিতে গিয়ে যেকোনও উপায়ে ভোট সংগ্রহ করাকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে বসেছে। ফলে মানুষের অন্ধ-বিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে গিয়ে মানুষের বিশ্বাসকে আঘাত করার চেয়ে ভোটার তোষণনীতিকেই অভ্রান্ত অস্ত্র হিসেবে মনে করতে শুরু করেছে। তাই তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত হানার সময় এলে কৌশল হিসেবে কে কখন কতটুকু মুখ খুলবে—এটাই তাদের কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে। দরিদ্র-শৃঙ্খলিত মানুষদের শৃঙ্খল মুক্তির লক্ষ্যেই যে সংসদীয় গণতন্ত্রে ঢোকা, তা বিস্মৃত হলে উপলক্ষই (সংসদীয় গণতন্ত্রে ঢোকা) লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যাবে।

আমরা গভীরভাবে লক্ষ করেছি—আমাদের দেশে বাস্তবিকই আজ পর্যন্ত জনজীবনে কোনও ব্যাপকতর গুণগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে

একইভাবে শোষিতদের চিন্তার ভ্রান্তির জালে আবদ্ধ রেখে শোষকরা শোষণ চালিয়েই যাচ্ছে। এতাবৎকাল আমাদের দেশে কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের নামে অথবা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নামে যা যা ঘটেছে তার কোনওটাই বাস্তবিক অর্থে আদৌ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল না। ভারতবর্ষে সংগঠিত তথাকথিত রেনেসাঁস যুগের আন্দোলন ছিল সমাজের উপরতলার কিছু ইংরেজি শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিছু সংস্কার প্রয়াস মাত্র। তৎপরবর্তী তথাকথিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলি ছিল শুধুমাত্র কলাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। তাদের আন্দোলনের এমন সীমাবদ্ধতার কারণ দু'টি হতে পারে। এক : নেতৃত্বের 'সংস্কৃতি' বিষয়ে ভুল ও অস্বচ্ছ চিন্তা। দুই : ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক আন্দোলন আদৌ গড়ে উঠতে না দেওয়ার কৌশল।

আমাদের যুদ্ধ শোষণের শক্তিশালীতম হাতিয়ার প্রতিটি কুসংস্কার ও ভ্রান্ত-বিশ্বাসগুলোর বিরুদ্ধে, যে ভ্রান্ত-বিশ্বাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'দেশপ্রেম', 'জাতীয়তাবাদ', 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' ইত্যাদি বহু বিষয়ে শোষক শ্রেণির ঢুকিয়ে দেওয়া বিশ্বাস। আমাদের যুদ্ধ ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে শোষকশ্রেণি সৃষ্ট বা পালিত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। কুসংস্কারের আবর্জনা সাফ করার প্রসঙ্গ উঠলেই যারা সোচ্চার হয়—"মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত নয়", "ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাতের মতো হঠকারী কাজ করলে আঘাতকারী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য"—তাদের বিরুদ্ধে।

যারা নিপীড়িত জনগণকে একত্রিত সংগ্রাম থেকে বিরত করতে 'জাতের নামে বজ্জাতি'-র রাজনীতি করে, তাদের বিরুদ্ধে। যারা অদৃষ্টবাদ ও পূর্বজন্মের কর্মফলজাতীয় ভ্রান্ত-চিন্তা প্রচারের মাধ্যমে মানুষদের মাথায় ঢোকাতে চায়, তাদের বঞ্চনার প্রতিটি কারণ অদৃষ্ট, পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদি—তাদের বিরুদ্ধে। যারা ধর্মের নামে মানুষের মানবিকতার চূড়ান্ত বিকাশ-গতিকে রুদ্ধ করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে। আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, প্রতিটি বিজ্ঞান-মনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষই চরমতম ধার্মিক। একটা তলোয়ারের ধর্ম যেমন তীক্ষ্ণতা, আগুনের ধর্ম যেমন দহন, তেমনই মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। সেই বিচারে যুক্তিবাদী সমাজ সচেতন আমরাই ধার্মিক, কারণ আমরা শোষিত মানুষদের মনুষ্যত্ববোধকে বিকশিত করতে চাইছি। মানুষের চিন্তায়, মানুষের চেতনায় ঘটাতে চাইছি বিপ্লব—সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

আমরা জানি, যে দিন বাস্তবিকই যুক্তিবাদী আন্দোলন দুর্বার গতি পাবে, সে-দিন দু'টি জিনিস ঘটবে। এক : এই আন্দোলন শোষণ শ্রেণির স্বার্থকে আঘাত হানবেই। এবং শোষক শ্রেণি তাদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে, অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তীব্র প্রত্যাঘাত হানবেই। এই প্রত্যাঘাতের মুখে কেউ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের

সংগ্রামকে, অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কেউ পিছু হটবে। দুই : যুক্তিবাদী চিন্তা বঞ্চিত জনতার চেতনার জগতে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবে, তারই পরিণতিতে গড়ে উঠবে নতুন নেতৃত্ব : যে নেতৃত্বে থাকবে সমাজ পরিবর্তনের, হুজুর-মজুর সম্পর্ক অবসানের, সার্বিক বিপ্লবের অঙ্গীকার।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব যখন শোষিতদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক বিপ্লবে পরিণত হবে, তখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সংগ্রামী মানুষরাই রাজনৈতিক বিপ্লবেরও সংগ্রামী মানুষ হয়ে উঠবেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকামী ও রাজনৈতিক আন্দোলনকামীদের মধ্যে তথাকথিত সীমারেখার দেওয়াল আপনিই ভেঙে পড়বে। আন্দোলন দুটি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে।

আমরা সুনিশ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই, তাদেরকে আমাদের চিন্তার শরিক করতে চাই। আমরা চাই আমাদের চিন্তার, আমাদের দর্শনের বিস্তার। আমাদের চিন্তাকে নিয়ে যেতে চাই সেখানেই, যেখানে রয়েছে মানুষ। আমরা তাই ডান, অতি-ডান, বাম, অতি-বাম বিচার না করে প্রত্যেকের আহ্বানেই হাজির হব—আমাদের নানা অনুষ্ঠানের পসরা নিয়ে নাটক নিয়ে, মাইক নিয়ে, গণসংগীত নিয়ে, আলোচনা সভা ও সেমিনার নিয়ে, লেখা-পত্তর নিয়ে। আমরা মানুষদের চিন্তাকে প্রভাবিত করতে, আমাদের চিন্তার খাতে বওয়াতে প্রবন্ধে, গল্পে, চলচ্চিত্রে, দূরদর্শনে এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে আমাদের মতাদর্শকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হব। জনগণকে যত বেশি সম্ভব প্রভাবিত করার স্বার্থে বেশি বেশি করে সমস্ত রকম প্রচার-মাধ্যম এবং গণ-মাধ্যমগুলিকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট থাকব। এই বিষয়েও অবশ্যই সতর্ক থাকব, যাতে প্রচার-মাধ্যম ও গণ-মাধ্যমগুলি শোষিত মানুষদের স্বার্থ বিরোধিতায় আমাদের না কাজে লাগাতে পারে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে তীব্রতর করতে সাংস্কৃতিক 'ফ্রন্ট' গড়ার বৈপ্লবিক তাৎপর্য মাথায় রেখে আমাদের সমিতির সদস্য নয়, কিন্তু আমাদের কাজ-কর্মে অনুরাগী সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ্ ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সংঘবদ্ধ করে এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ে তুলব। আমাদের সমিতির শাখা নয়, অথচ আমাদের কাজ-কর্মে শ্রদ্ধাবান বিভিন্ন গণ-সংগঠনগুলিকে একত্রিত করতে গণ-সংগঠনগুলির সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করব। আমরা সচেষ্ট থাকব এইসব সাহিত্যিক, শিল্পী, চিন্তাবিদ্, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী এবং গণ-সংগঠনকর্মীদের চিন্তাকে আমাদের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত করতে।

আমরা চাই আমাদের মতাদর্শের, আমাদের দর্শনের বিস্তার। আমরা শাখা বিস্তার করতে চাই সেখানেই—যেখানে রয়েছে মানুষ। আমরা মনে করি সাংস্কৃতিক ময়দানের লড়াইতে জয়লাভ করতে না পারলে, শোষিত মানুষদের

মুক্তির লড়াইয়ে জয়লাভ অধরাই থেকে যাবে।

আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম—বৈপ্লবিক সংস্কৃতি গড়ার কাজে। যে কোনও ত্যাগ বা অত্যাচারের মুখোমুখি হব হাসিমুখে। আদর্শের প্রয়োজনে, সমিতির নেতৃত্বের নির্দেশে প্রাণ-বিসর্জন দিতে সব সময়ই প্রস্তুত থাকব।"

কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' করে বেড়াচ্ছি পশ্চিমবাংলার গ্রামে-শহরে-আধা শহরে। সমিতিতে একে একে যুক্ত হচ্ছে তন্ময়, কণিষ্ক, কাজল, কমল, রঘু ও আশিস। এবার পুরোদস্তুর স্টাডি ক্লাসের প্রয়োজন অনুভব করলাম। 'স্টাডি ক্লাস' না হলে যুক্তিবাদী সমিতি আর পাঁচটা ক্লাবের মতো একটা 'ক্লাব' হয়ে যাবে। এগিয়ে এলেন 'কিশোর ভারতী' স্কুলের হেডমাস্টার মিহির সেনগুপ্ত। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী সমিতির সহ-সভাপতি। আমার বাড়ি থেকে স্টাডি ক্লাস স্থানান্তরিত হল মতিঝিল কলেজের পাশে কিশোর ভারতী স্কুলে। প্রতি রবিবার ক্লাস করার জন্য ছেড়ে দিলেন স্কুল। তর্কে-বিতর্কে-আলোচনায় জমে গেল। পুরনোদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজন মানিক মৈত্র, ডাঃ সমিত ঘোষ, ডাঃ অপরাজিত বসু, ডাঃ বিষ্ণু মুখার্জি, অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। এই সময় আমাদের সমিতির তুখোড় ছেলে মানিক মৈত্র যেমন ছিলেন ভাল বক্তা, তেমনই ছিলেন ভাল লেখক।

১৯৮৭-এর ১ মার্চ ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি (Rationalists' Association of India) নামটির সামান্য পরিবর্তন করে ঘোষিত হল নতুন নাম—ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (Science and Rationalists' Association of India)।

এই বৃহৎ নামটির থেকে 'যুক্তিবাদী সমিতি' বা 'Rationaslists' Association' নামটি অনেক বেশি জনপ্রিয়তা পেল সাধারণ মানুষের কাছে, প্রচার মাধ্যমগুলোর কাছে, যেমন ভাবে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' অনেক বেশি পরিচিত হয়েছে 'কংগ্রেস' নামে, 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)' সমধিক পরিচিত 'সি পি আই এম' নামে অথবা আরও সংক্ষিপ্ত নাম 'সি পি এম'-এ।

১৯৮৯-এর ৮ ডিসেম্বর ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি, 'সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট' অনুসারে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি' নামে রেজিস্ট্রেশন করাল।

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয় 'কিশোর যুক্তিবাদী' পত্রিকা। নাম অলংকরণ করেছিলেন আমাদের সমিতির সেই সময়কার সহ-সম্পাদক চন্দন ভট্টাচার্য। অসাধারণ অলংকরণ। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক পিনাকী ঘোষ।

ইতিমধ্যে ১৯৮৬ ও ১৯৮৭-তে আমরা এমন দুটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটিয়ে ছিলাম যা জনচিত্তে বিশাল প্রভাব ফেলেছিল। '৮৬-তে আমরা ফিলিপিনের ফেইথ হিলার রোমিও পি গ্যালার্ড-র অলৌকিক অস্ত্রপ্রচার রহস্য উন্মোচিত করি। ইতিপূর্বে ফেইথ হিলারের উপর বহু তথ্যচিত্র পরিবেশন করেছে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সভ্য দেশ। বিবিসি ও গ্রানাডা টেলিভিশন কোম্পানি ফেইথ হিলারের অলৌকিক রহস্যময়তার ওপর অনুসন্ধান চালিয়ে লৌকিক ব্যাখ্যা হাজির করতে ব্যর্থ হয়। C.S.I.C.O.P.-এর বিশিষ্ট নেতা এবং অলৌকিক রহস্য ফাঁস করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রচার পাওয়া ব্যক্তিত্ব জেমস র‍্যান্ডিও ফেইথ হিলারের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করেন এবং ব্যর্থ হন। ফেইথ হিলারের বৈশিষ্ট্য ছিল রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার করতেন কোনও অস্ত্র ছাড়া, স্রেফ নিজের আঙুলগুলোকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। রোগীকে অজ্ঞান করা হত না, তবু রোগী কোনও ব্যথা অনুভব করত না। অস্ত্রোপচার শেষে সামান্য মালিশ করতেই মিলিয়ে যেত অস্ত্রোপচারের চিহ্ন। বহুক্ষেত্রেই রোগীরা রোগমুক্ত হতেন।

ফেইথ হিলারের অস্ত্রোপচারের রহস্য উন্মোচন এবং কী ভাবেই বা কিছু কিছু রোগী রোগমুক্ত হচ্ছেন তার ব্যাখ্যা হাজির করতেই এ-দেশের গণ্ডি পার হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তা বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফিলিপিনস-এর বেতার ও দূরদর্শনেও এই রহস্য উন্মোচন নিয়ে প্রচারিত হয় অনুষ্ঠান (এই নিয়ে স-চিত্র বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে 'অলৌকিক, নয় লৌকিক' ২ খণ্ড গ্রন্থে)।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল আর এক আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী মানবী কম্পিউটার শকুন্তলাদেবীকে ঘিরে। শকুন্তলাদেবী '৮৭-র কলিকাতা পুস্তকমেলা চলাকালীন কলকাতার সান্ধ্য দৈনিক 'ইভনিং ব্রিফ'-এর পাতা জুড়ে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, 'অ্যাস্ট্রোলজি ইজ অলসো এ পার্ট অফ ম্যাথমেটিক্স' অর্থাৎ জ্যোতিষ অঙ্কেরই একটি শাখা। এই সাক্ষাৎকারেই আর এক জায়গায় বলেছিলেন, 'অ্যাস্ট্রোলজি ইজ দ্য কিং অফ অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স' অর্থাৎ কিনা জ্যোতিষশাস্ত্র হল ব্যবহারিক বিজ্ঞানের রাজা। শকুন্তলাদেবী সাক্ষাৎকারে এও জানিয়েছিলেন— 'তিনি কোনও অনুষ্ঠানে অঙ্ক কষায় কোনও ভুল করেন নি।'

তারপর আমাদের সমিতির খোলা-মেলা চ্যালেঞ্জের মুখে শকুন্তলাদেবীর গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে পলায়ন এবং তা নিয়ে ভারতের বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লোমহর্ষক খবরগুলো মানুষের মনে প্রত্যয় এনে দিয়েছিল যুক্তিবাদী সমিতি পারে যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে জয়কে ছিনিয়ে আনতে, পারে যে কোনও তথাকথিত অলৌকিক রহস্যের ব্যাখ্যা দিতে। (শকুন্তলাদেবীর প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে 'অলৌকিক, নয় লৌকিক' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে)।

'চ্যালেঞ্জ' আমাদের যুক্তিবাদী আন্দোলনের একটা পর্যায় মাত্র—তার বেশি

কিছুই নয়। প্রচারের ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গরুগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়ানোর জন্যেই এই 'চ্যালেঞ্জ'। দোদুল্যমান, সুবিধাভোগী ও ঈর্ষাকাতরদের কাছে এই 'চ্যালেঞ্জ' 'অশোভন' মনে হতেই পারে—কেন না চ্যালেঞ্জ বাস্তব সত্যকে বড় বেশি রকম স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই—যেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেই দাবি প্রমাণ করা যায়, বাস্তব সত্যকে জানা যায়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে দ্বিধা থাকবে কেন?

'চ্যালেঞ্জ' অক্ষমদের কাছে 'সস্তা চমক' অবশ্যই, তবে আমাদের কাছে আন্দোলনের 'হাতিয়ার'।

'চ্যালেঞ্জ'কে যেসব ধাপ্পাবাজরা 'নেশা' বলে প্রচার করতে চান, তাদের উদ্দেশে জানাই— সাধারণ মানুষকে, শোষিত মানুষকে অবতার ও জ্যোতিষীদের 'নেশা' থেকে মুক্ত করতেই আমাদের এই 'চ্যালেঞ্জ'। যতদিন সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অবতার ও জ্যোতিষীদের 'নেশা' থাকবে। ততদিন 'নেশা' কাটাতে আমাদের চ্যালেঞ্জের 'নেশা'ও থাকবে। চ্যালেঞ্জের ওষুধও থাকবে।

১৯৯০-তে সমিতির স্টাডি ক্লাস উঠে এল মধ্য-কলকাতার বউবাজারে। ঠিকানা : ৩৪-এ, শশীভূষণ দে স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০ ০১২। এটা ডাঃ বিমল মল্লিকের চেম্বার। স্টাডি ক্লাস হত সোম-বুধ-শুক্র বিকেল ৫টা থেকে ৮টা। আমরা জমজমাট স্টাডি ক্লাস করতাম।

এলাকাটা হল বেশ্যা পল্লি অধ্যুষিত। ওদের ছেলেমেয়েদের আমরা বিনা পয়সায় লেখাপড়া শেখাতে শুরু করি। বই-খাতা দিয়ে সাহায্য করতাম। প্রথমের দিকে ওদের মায়েরা আমাদের কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখতেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখলেন যে, না আমাদের এই কাজের পিছনে কোনও অসৎ উদ্দেশ্যই নেই।

পেশায় দেহোপজীবিনীদের কাছ থেকে আমরা গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলাম।

বেশ্যাপল্লির দখল নিয়ে কংগ্রেস ও সিপিএম-এর মার-দাঙ্গা হত। তরোয়াল, গুলি, বোমা সবই চলত। কিন্তু আমরা যখন ক্লাসে আসতাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে বেশ্যারাই হাত তুলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দু'দলের লড়াই বন্ধ করে দিত।

১৯৯১-তে এলেন সুমিত্রা পদ্মনাভন।

কেন্দ্রীয়ভাবে 'যুক্তিবাদী' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৯২ সালে। সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তেছিল আমার উপর। ১৯৯৬ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সম্পাদনার

দায়িত্ব পালন করে চলেছেন সুমিত্রা পদ্মনাভন। প্রতি মাসে প্রকাশিত হচ্ছে 'বুলেটিন' যুক্তিবাদী সমিতি ও 'হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'আমরা যুক্তিবাদী'।

'হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' গঠনের পিছনে রয়েছে একটা ছোট্ট ইতিহাস। 'যুক্তিবাদী সমিতি' ঝড় তুলে-ই এগোচ্ছিল। গোল বাধল ১৯৯৩-এর জানুয়ারিতে কলকাতা বইমেলায় 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ' বইটি প্রকাশিত হতেই। বইটিতে উঠে এল ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস ও বিশ্লেষণ, উঠে এল 'প্রেম', 'দেশপ্রেম', 'গণতন্ত্র', 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' ইত্যাদি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বহু প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং তাদের নতুন করে দেখা ও চেনা।

জনগণকে পাশে পেতে জনগণের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব। বিনা খরচে বস্তি ও গ্রামের ব্রাত্য শিশুদের এবং বয়স্কদের শিক্ষা, আইনি সাহায্য, কর্মশিক্ষা, চিকিৎসকদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প, পারিবারিক সমস্যা নিয়ে 'কাউন্সেলিং', মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান, রক্তদান শিবির, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বেশ্যাবৃত্তির মতো নিষ্ঠুর ব্যবস্থা বন্ধ করে তাঁদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া, মানবতা বিকাশের স্বার্থে মানুষকে ধর্ম, জাত-পাত প্রাদেশিকতা ও লিঙ্গবৈষম্যের মত কুসংস্কার ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করা।

এইসব কাজের প্রয়োজন মেটাতে গড়ে তোলা হলো 'হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন'। দিনটা ছিল ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সাল। অ্যাসোসিয়েশনের প্রতীক তৈরি করেছিলাম আমি। বহু অসুবিধা জয় ছিনিয়ে এনেছে হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন। প্রথম জেনারেল সেক্রেটারি : সুমিত্রা পদ্মনাভন।

অধ্যায় : চোদ্দো

আমার সহযোদ্ধারা

সুমিত্রা সাধারণভাবে বঙ্গবাসী এবং ব্রাহ্ম। বিয়ে করেছিলেন কেরালার ছেলে বসন্ত পদ্মনাভনকে। আমাদের সমিতিতে যোগ দেন ১৯৯১ সালে। যা অন্যায় মনে করতেন তা কখনও করতেন না। ছিলেন খুব সাহসী। এর জন্যেই আমাদের সমিতির দলিলপত্র সব ওনার কাছেই গচ্ছিত।

সুমিত্রাদি আমাদের যুক্তিবাদী ও হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রাণ।

আমার কাছে তাঁর দোষের মধ্যে ছিল অরুন্ধতী রায় ও তসলিমা নাসরিন-এর প্রতি 'অন্ধ' ভালবাসা।

সেক্সের ব্যাপারে তিনি ছিলেন এদের দু'জনের মতনই উদার মতাবলম্বী।

ইংলিশে এম এ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুল না করলে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করে। প্রথমে সরকারি কলেজে তিনি অধ্যাপিকা হন। তারপর ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে ঢোকেন।

জ্যোতিদা একজন 'প্রখর যুক্তিবাদী' মানুষ। জ্যোতি মুখার্জি থাকতেন বেলেঘাটার খালপুলের কাছে 'কোলে' ব্যারাক-এ। 'কোলে' বিস্কুট কোম্পানির মালিকরা এই ব্যারাকের প্রত্যেকটা কোয়ার্টারের মালিক। জ্যোতিদার অধিকারে ছিল একতলার দুটো ঘর, দোতলার দুটো ঘর একটা টয়লেট ও একটা রান্নাঘর। রান্নাঘর ব্যবহার হত না। একতলার বড় ঘরটায় আমাদের স্টাডি ক্লাস হত সপ্তাহে দু'দিন। জ্যোতিদা ছিলেন শীর্ণকায়, ফর্সা, অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তিনি অকৃতদার।

জ্যোতিদার পেটে ক্যান্সার হল। সমিতির উপদেষ্টা ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য বারাসত ক্যান্সার হাসপাতালের একজন চিকিৎসক। তাঁর ভরসায় আমার গাড়িতে নিয়ে গেলাম। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। ধরা পড়ল পেটে বিরাট ওজনের ক্যান্সার।

আশপাশে জ্যোতিদার আত্মীয়ের অভাব নেই। মোটর বাইক, গাড়ি ইত্যাদির মালিক খুব নিকট আত্মীয়ও আছেন। জ্যোতিদার আত্মীয়রা জ্যোতিদার ক্যান্সারের খবর পেয়েই সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন যদি চিকিৎসার জন্য পয়সা খরচ হয়।

ডাঃ প্রবীররঞ্জন কর অপারেশন করলেন। তিনি প্রায় ম্যাজিক করলেন। বারোটা কেমো থেরাপির জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেছি। খাই-না-খাই জ্যোতিদার চিকিৎসা করিয়ে যাচ্ছিলাম। অতনু বারাসতেই থাকে। আমাদের সমিতির নিবেদিত প্রাণ একজন। তিনি জ্যোতিদার জন্য দু'বেলা বাড়ি থেকে রান্না করে খাবার নিয়ে এসে খাইয়ে যেতেন।

জ্যোতিদা অনেকটা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। মাঝে মাঝে কেমো দিতে গাড়ি করে নিয়ে যেতাম ওই হাসপাতালে। যে বই-ই লিখতাম সেটাই জ্যোতিদাকে উপহার দিতাম। বই অনেক বেশি হয়ে যাওয়ায় বই রাখার জন্য একটা বুকসেলফ বানিয়ে দিলেন সুমিত্রাদি।

এরপরে জ্যোতিদা বছর বারো বেঁচেছিলেন। জ্যোতিদার কোনও রোজগার ছিল না। পাড়ার একটা হোটেলে ধারে চারবেলা খেতেন। তাঁর তিন বছরের ধারের টাকা শোধ করেছি। ঝুরঝুর করে পলেস্তারা খসে পড়ছে। সেগুলোকে ছাড়িয়ে প্লাস্টার করালাম, রং করালাম। জ্যোতিদার যাতে ধারে খেতে না হয় তার জন্য মাসে মাসে টাকা দিতাম।

সপ্তাহে দু-তিনদিন জ্যোতিদার বাড়িতে ক্লাস করতে বসতাম।

জ্যোতিদা বললেন, দোতলাটা সারাতে হবে। এই কোলেব্যারাকে কোলের কাছে গিয়ে এই বাড়িটা আপনার নামে করে দেব। বাড়িটা সারিয়ে নিন।

দোতলাটা সারালাম। ইলেকট্রিক আনলাম।

এরপর বছর তিনেক পরে হঠাৎ জানতে পারলাম জ্যোতিদা কোলেবাবুদের কাছে গিয়ে তাঁর ভাইয়ের নামে বাড়িটা ট্রান্সফার করে দিয়েছে।

বিশাল ধাক্কা খেলাম। এ এক অপ্রত্যাশিত ধাক্কা। খালি বাড়িটা রিপেয়ার করতেই ৮০ হাজার টাকা খরচা হয়েছে। ওখানকার আস্তানা গোটাতে হল।

এলাম আদি সদস্য অরুণ মুখার্জির ৩৩/এ ক্রিক রো-র বাড়িতে। স্মরণীয় আর একজন হলেন অরুণদা। আমাদের সমিতির প্রথম লাইফ মেম্বার অরুণ মুখার্জি। সুন্দর স্বাস্থ্য, মিষ্টি স্বভাব। এদের একটা 'ট্র্যাডিশন' ছিল কেউ বিয়ে করে না। অরুণদারা তিন ভাই, এক বোন। অরুণদা চাকরি করতেন স্টেট ব্যাঙ্কে। আমার সহকর্মী।

পরের ভাই অজিতদা বিল্ডিং মেটেরিয়ালস সাপ্লাই দিতেন। ছোট ভাই 'লন্ডন

ইস্কুল অফ ইকনমিকস্'-এ পড়াতেন। ছোটভাই লন্ডনেই ক্যান্সারে মারা যান। 'ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এ অরুণদারা দান করে দিলেন দশ লক্ষ টাকা। একটাই বোন শিপ্রা ওরফে শিপু। প্রাইমারি ইস্কুলে পড়াতেন।

ওদের ভাঙাচোরা ছোট্ট বাড়ির একটি ঘরে আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির ক্লাস হত সপ্তাহে দু'দিন করে।

অরুণদা উচ্চমেধার মানুষ। বিভিন্ন বিষয়ে অজস্র জ্ঞান ছিল। আমাদের আলোচনায় প্রতিদিনই অংশ নিতেন। শুনেছিলাম অরুণদার দেখভালের বড়ই অভাব। সেই অভাবটা আমরাই মেটাই। সেবা-শুশ্রূষা সমস্ত কিছুই করতাম। কিন্তু আমাদের সমস্ত ভালবাসার বাঁধন ছিন্ন করে ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি অরুণদা মারা যান।

একবার অরুণদার স্নায়ু রোগ হল। অরুণদা বললেন, আমি গাড়ি করে যেতে পারব না, অ্যাম্বুলেন্স-এ ভীষণ খরচা। তাই কলকাতার বিখ্যাত নিউরোলজিস্ট ডাঃ সন্দীপ পালকে অনুরোধ করি আসার জন্য। তিনি কোথাও রোগী দেখতে যান না। কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধে তিনি অরুণদার বাড়িতে এলেন। ডাঃ সন্দীপ পাল প্রায় পৌঁছে গেছে শুনেই অরুণদার ভাই ফতুয়াটা খুলে খেটো লুঙ্গি পরে বসে পড়লেন। ডাঃ সন্দীপ পাল প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ ধরে অরুণদাকে পরীক্ষা করলেন। প্রেসক্রিপশন দিলেন।

অরুণদার ভাই বললেন, ডাক্তারবাবু আপনাকে কত দেব?

ডাক্তার বললেন, না না। আপনাকে কিছু দিতে হবে না।

ফিস কত দেব, জিজ্ঞাসা করায়, 'এত গরিবের কাছ থেকে ফিস্ নেওয়া উচিত নয়' বিবেচনায় কিছুই নিলেন না। উনি জানতেও পারলেন না যে, ওনারা বহু কোটি টাকার মালিক। আমরাও জানতাম না। জানলাম অরুণদার মৃত্যুর পর।

অরুণদা যতদিন জীবিত ছিলেন একদিনও একজন আত্মীয়কে আসতে দেখিনি। অরুণদা মারা যাওয়ার পরেই ভাগাড়ে শকুনির দল ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এল। অরুণদার মৃত্যুর আগে দেখেছিলাম অরুণদার ছোটভাই খুবই বিত্তশালী। ২০১২-তে অজিতদা মারা গেলেন। তখন জানতে পারলাম, ওনাদের বাড়ির কাছেই ওনারা একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন পঁচাত্তর লাখ টাকায়।

অরুণদার মৃত্যুর পর জানা গেল বউবাজার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছেই একটি ফ্ল্যাট ছিল এক কোটি টাকার। আর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স দেখা গেল—এফডি আছে তিন কোটি টাকা এবং সেভিংস আছে তিরিশ লাখ টাকার মতো। অরুণদার পরিবারের কাউকে দেখলে বোঝার উপায়ই ছিল না। অরুণদার দুই ভাই খেটো লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে থাকত। আর বোনও ছোট্ট খাটো শাড়ি পরে থাকত।

বছর তিনেক ধরেই অরুণদা বলছিলেন, আমরা তিন ভাই-বোন আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমাদের এই বাড়িটা ভেঙে ফ্ল্যাট হতে চলেছে। তার একটা ফ্লোর তোমাকে দিয়ে যাব। তুমি ওখানে অ্যাসোসিয়েশন করো আর যাই করো। তোমার নিজের কোনও বাড়ি নেই বলে আমরা এই ডিসিশন-এ এলাম।

অরুণদা মারা যাওয়ার পর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি পড়ে রইল। আর অরুণদার আত্মীয়রা জানিয়ে দিলেন, আমরা আর চাই না যে আপনারা এখানে ক্লাস করাতে বসেন।

অরুণদার বোন শিপ্রা বললেন, ওরা যা বলবে আমি তো সেইমতোই চলব।

এরপর আমরা আর কোথাও যাইনি। ৭২/৮, দেবীনিবাসেই আমাদের স্টাডি ক্লাস স্থায়ীভাবে চলছে এবং চলবে। আমাদের স্টাডি ক্লাস বসে প্রতি রবিবার দুপুর ২.৩০ থেকে।

যুক্তিবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ছিলেন আমাদের যুক্তিবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ। আন্দোলনের জন্য কোথায় না ছুটে বেড়িয়েছেন। ক্লাস করতেন ভাল। সভার সঞ্চালক ছিলেন ভাল। আর আমার যে-কোনও বই বেরোলে একাধিক বই কিনে নিজে তো পড়তেন-ই, চলচ্চিত্র জগতের বন্ধুদেরও পড়তে দিতেন। খুবই হাসিখুশি মানুষ। পিংকি সিরিজ নিয়ে সিরিয়াল করবেন ঠিক করে স্ক্রিপ্ট লিখে আমাদের পড়াতেন। সত্যিই অনবদ্য। কিন্তু সিরিয়াল তৈরির আগেই তিনি মারা গেলেন।

আমাদের যুক্তিবাদী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ ছিলেন ডাঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন ইএনটি বিশেষজ্ঞ। দেশ-জোড়া নাম। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, টকটকে গায়ের রং। আধুনিক সাহিত্য নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা করতেন। আমাদের সমিতির তরফে রেফার করা রোগীদের বিনা পয়সায় চেক-আপ থেকে অপারেশন করা, সবই করে দিতেন। কলকাতায় আমাদের সব অনুষ্ঠানেই হাজির থাকতেন।

দূরদর্শনে জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপন দেখানো হবে খবরটা পড়ে আমরা বিশাল এক মিছিল নিয়ে হাজির হই দূরদর্শন চ্যানেলে। রাস্তায় বসে পড়ে অবস্থান ধর্মঘট করি। ডাঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এঁরা প্রত্যেকেই রাস্তায় বসে দূরদর্শনে জ্যোতিষ বিজ্ঞাপনের বিরোধিতা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপন দেখানো বন্ধ করতে সক্ষম হই।

আমাদের টাকায় জ্যোতিষীদের
বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না

একবার 'ধর্ম কি বিজ্ঞানমনস্ক বিরোধী' শিরোনামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করলাম আমরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হল-এ হবে। তখন কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দর্শকাসন-এর একমাত্র হল এটি। আর, আমাদের এই সভার মূল আর্থিক দায়িত্ব নিলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাবন্ধিক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়।

চারদিকে প্রচুর পোস্টার পড়েছে। হইহই ভিড়। ধর্মের পক্ষে আমন্ত্রিত বক্তারা হলেন— স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ, ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী ও গৌরাঙ্গ শাস্ত্রী। এর বিপরীতে ও যুক্তিমনস্কতার পক্ষে ছিলেন সিপিআইএম-এর মহম্মদ ইসমাইল, সিপিআই-এর বিশ্বনাথ মুখার্জি এবং আইপিএফ-এর অরিজিৎ মিত্র। সঞ্চালক ছিলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। তখন আমাদের সভাপতি ডাঃ বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়।

প্রচুর সাংবাদিক আমাকে ফোন করে করে জানতে চাইলেন, ধর্মের পক্ষে বলবেন বলে এই যে এত বড় তালিকা দিয়েছেন, এঁরা কি আসবেন? তিনজনই যে আসবেন এটা সাংবাদিকরা বিশ্বাস করলেন না।

এই তিন ধর্মবেত্তা মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সভাপতি বিষ্ণুদা ও তাঁর স্ত্রী গড় করে প্রণাম করলেন। লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা গেল।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজি বলতে উঠলেন। ধর্মের মহিমা কীর্তন করলেন। বললেন, বেদ-এ অলৌকিকতার কোনও স্থান নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের সঙ্গেও কোনও বিরোধ নেই। এই কথার উত্তরে তিন বক্তাই চুপ করে রইলেন।

সভা নিস্তব্ধ। আমার নাম আলোচক তালিকায় ছিল না। কিন্তু বিরোধী বক্তারা চুপ মেরে যাওয়ায় আমাকেই মাইক ধরে উঠতে হল। সঞ্চালক শুভেন্দুদা আমাকে মঞ্চে ডাকলেন বলার জন্য।

বললাম, অথর্ব বেদে আছে কোন্ মন্ত্র উচ্চারণ করে রোগ মুক্তি ঘটানো যায়। অন্যের শরীরে রোগ চালান করা যায়। এমনকী, মারণ-উচাটন মন্ত্রের কথাও আছে। গ্রামবন্ধন ও গৃহবন্ধনের কথা আছে যা করলে গ্রামে নাকি কোনও চুরি হবে না। গৃহে কোনও চুরি হবে না। তো গৃহবন্ধন করে ঘরে তালা না দিয়ে আপনারা বেরিয়ে যান, তারপর ঘরে ফিরে এসে দেখুন, চুরি হয়েছে কি হয়নি। এ ব্যাপারে লোকেশ্বরানন্দজি কী বলেন?

লোকেশ্বরানন্দজি আমার কথার জবাব আর দিতে পারলেন না। তুমুল হাততালিতে ফেটে পড়ল হল।

বিশাল আয়োজনের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা ঘাটতি হল। কেননা যে দু'জন ব্যবস্থাপক পুরো টাকা তুলে দেবেন বলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শুভেন্দুদা পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। অশোক কিছুই দেননি। তাই জ্যোতিদাকে পাঠালাম ডাঃ আবিরলাল মুখার্জির কাছে টাকা ধার করতে। চিঠিতে লিখে দিলাম—এই টাকার

দায়িত্ব আমার, আমি শোধ দেব।

জ্যোতিদা গেলেন। আবিরদা একটা ছবি সরিয়ে তার আড়াল থেকে টাকা বার করে গুনে পঁচিশ হাজার টাকা জ্যোতিদাকে দিয়ে দিলেন।

ডাঃ আই এস রায় বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক। আমাদের সমিতির কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। এখন যেমন জড়িয়ে আছেন ডাঃ দেবনাথ চ্যাটার্জি। ভারত বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক তিনি। এঁরা দু'জনেই গরিব রোগী পাঠালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে দিতেন।

বিখ্যাত স্নায়ু চিকিৎসক ডাঃ সন্দীপ পাল-এর নাম করতে হয়। প্রতিবছর একজন করে ছাত্রকে ডাক্তারি পড়ার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন তিনি। আমাদের সমিতির সঙ্গে যুক্ত এক অসাধারণ চরিত্রের মানুষ।

সাধন মজুমদার CESC-র ভবানীপুর শাখায় কাজ করতেন। থাকতেন বেলঘরিয়ায়। সংসারে রুগ্না স্ত্রী, দুই ছেলে, ছেলের বউ, তার ছেলে। তাদের সন্তান এবং সবাইয়ের ভরণ-পোষণ করতে হত সাধনদাকে। কারণ, ছেলেরা বিয়ে করেছে, সন্তান উৎপাদন করেছে, কিন্তু কাজ করতে শেখেনি।

সাধনদা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখতেন। এবং প্রচুর চিঠি ছাপাও হয়েছে।

তাঁর ছাপা লেখাগুলো জেরক্স করে রবীন্দ্রসদনে প্রতিদিন বিলি করতেন। আর বিভিন্ন স্টেশনের টয়লেটে আঠা দিয়ে পেস্ট করে দিতেন।

এমন লোককে ভাল না বেসে পারা যায় না।

একদিন ক্লাসে এসে বললেন, জলপাইগুড়িতে ছেলেরা কী ভয়ঙ্কর র‍্যাগিং করছে খবরে পড়লেন?

সেদিন ক্লাসে জলপাইগুড়ির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র অনাবিল সেনগুপ্ত এসে হাজির।

তার কথাতেই শোনা যাক তারপর কী হল—

"তখন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। সালটা ২০০৩। ওখানে র‍্যাগিং-এর চল ভালই ছিল। সিনিয়ার ছাত্ররা জুনিয়ারদের ওপর শারীরিক ও মানসিক প্রচণ্ড অত্যাচার করত। মানসিক অত্যাচারের পর্যায়টা শোভন ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কোনও ছাত্রের বোন আছে শুনলে তাকে বোনের সঙ্গে মিলনের বর্ণনা দিতে দিতে হস্তমৈথুন করতে হত। গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া, কান ধরে ওঠবোস, এমনকী মা-কে নিয়েও অশালীন বর্ণনা করতে হত।

অত্যাচারটা অন্য ছাত্রদের ওপর যতটা হত, আমার উপর প্রায় হতই না। কারণ আমি লম্বায় ছ'ফুটের মতো, শরীরের ওজন ৮৬ কেজি। আর শক্তিটা একটু বেশিই ছিল।

একবার র‍্যাগিং একটু বেশি রকম হয়ে গেল। কলেজের প্রথম বর্ষ, ইলেক্ট্রনিক্স-টেলিকমিউনিকেশন-এর ছাত্র সন্দীপ ব্যানার্জিকে হস্টেলের দোতলার ছাদ থেকে চ্যাংদোলা করে নিচে ফেলে দিল। ও জ্ঞান হারাল। অবস্থা সঙ্গিন হওয়ায় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করতে হল। মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়া সন্দীপ তখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। সেই অবস্থাতে সন্দীপ পুলিশের কাছে বয়ান দিল, কারা ওকে চ্যাংদোলা করে ফেলে দিয়েছিল।

৭ আগস্ট, ২০০৩। পুলিশ এসে চারজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করল। এর মধ্যে একজন ছাত্র-ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি। চারজন ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হল। এই বহিষ্কার ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং জামিনের দাবিতে মুহূর্তেই কলেজ স্ট্রাইক ঘোষিত হল। একদিনের মধ্যেই সারা উত্তরবঙ্গের কলেজে স্ট্রাইক ডাকা হল। সেই স্ট্রাইক ছড়াল সারা বাংলার কলেজগুলোতে।

কলেজ বন্ধ। আমি প্রবীরদার সঙ্গে দেখা করতে কলকাতায় এলাম। কী করা যেতে পারে সে ব্যাপারে পরামর্শের জন্য। তখন ক্রিক রোতে ক্লাস হত। একঘর লোক। প্রধান আলোচ্য বিষয় দেখলাম র‍্যাগিং-এর নামে গুন্ডামি।

আমাদের এক প্রবীণ সদস্য ছিলেন সাধন মজুমদার। বয়স বছর ৫৩। ছোটখাটো চেহারা। গায়ের রং কালো। চোখে পুরু চশমা। সমিতির সবাইকে খুব ভালবাসত, আবার পিছনেও লাগত।

সাধনদা প্রবীরদাকে বললেন—এই ভয়ঙ্কর র‍্যাগিংকে ছাত্ররা যেভাবে সাপোর্ট করছে, তা কি আমরা বন্ধ করতে পারি না?

প্রবীরদা বললেন—মনে তো হচ্ছে এ ব্যাপারে কথা বলতে এসেছে অনাবিল।

তারপর আমাকে বললেন—তুই আজই জলপাইগুড়ি চলে যা। তোর সঙ্গে সেল ফোনে সব কথা হয়ে যাবে। তারপরই সব বন্ধ হয়ে যাবে।

কেউ এ ব্যাপারে ডিটেলে বলার জন্য প্রবীরদাকে অনুরোধ করলেন না। কারণ, তাঁরা জানতেন প্রবীরদা অনেক অ্যাকশনেরই পরিকল্পনা আগে থেকে ফাঁস করেন না।

আমি তখন ট্রেনে জলপাইগুড়ি যাচ্ছি। প্রবীরদা ফোনে বললেন—নে কতগুলো নাম লিখে ফেল। আমাদের কয়েকজনকে প্রবীরদার নির্দেশমতো ছোট ডায়েরি ও কলম সঙ্গে রাখতেই হত।

বললেন—এরা সবাই সি পি আই (এম এল)(লিবারেশন)-এর কমরেড। এদেরকে বলবি প্রবীরদা পাঠিয়েছেন। আপনারা আমাদের কলেজের ব্যাপারটা তো জানেনই। আপনাদের সাহায্য চেয়েছেন। কী সাহায্য জিজ্ঞেস করলে বলবি—এ ব্যাপারে প্রবীরদার সঙ্গে কথা বলে নিন।

জানতাম, প্রবীরদার হাত বিরাট লম্বা। আসাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মণিপুর,

ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, অন্ধ্র, ওড়িশা, ছত্তিশগড় ইত্যাদি অঞ্চলের সাম্যকামী মানুষদের সঙ্গে প্রবীরদার সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়।

পরের দিন সিপিআই(এম এল)(লিবারেশন)-এর পার্টি অফিসে দেখা করলাম। প্রবীরদাকে ফোনে ধরিয়ে দিলাম।

ঠিক হল রাত বারোটা নাগাদ জনা পনেরো ছেলে কলেজ হস্টেলে চলে আসবে। তারপর আমি হব ওদের গাইড।

ইতিমধ্যে ইউনিয়নের জি এস জামিন পেয়ে বীরদর্পে ফিরে এসেছে। হস্টেলে মদ্যপানের উৎসব চলছে। আর আমাদের সবার চোখ ছাড়া পুরো মুখটা গামছা দিয়ে ঢাকা। প্রবীরদার আমার প্রতি সুনির্দিষ্ট ইনস্ট্রাকশন ছিল—তুই খুব কম কথা বলবি। তোর যা বাজখাই গলা তা শুনলে ছেলেরা তোকে চিনে ফেলবে।

আমি ওদের নিয়ে ইশারায় দেখিয়ে দিলাম জি এস-কে। জি এস-এর সঙ্গে আর তিনটি ছেলে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদেরকেও তোলা হল।

পনেরো-ষোলোটি ছেলের হঠাৎ রাতদুপুরে আগমন এবং কয়েকজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখে, ওদের নেশা ছুটে গেছে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে ছাত্রদের বলা হল—পুলিশে খবর দিও না। তাহলে ওরা আর জ্যান্ত ফিরবে না, লাশ ফিরবে।

প্রিন্সিপালকেও তোলা হল। ওদের পাঁচজনকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকলাম আমরা।

এবার ওদের বলা হল—কাল থেকে যদি একটি ছেলের ওপরেও র‍্যাগিং করিস, তবে তোদের ঝাঁঝরা করে দেব।

সকালবেলায় পাঁচজনকে মুক্তি দিতেই তারা হাউমাউ করে বলল আজ থেকে আর আমাদের কলেজে র‍্যাগিং হবে না। দেখে লজ্জা লাগল প্রিন্সিপালও ওদের সুরে সুর মেলালেন।

এর পরই একদিনের মধ্যেই নবাগতদের হস্টেলের জন্য নতুন ঘর নেওয়া হল। সারা বাংলা থেকে স্বস্তির নিশ্বাস উঠে গেল।

প্রবীরদার সঙ্গে *বেশ* কিছু রোমহর্ষক অ্যাকশনে অংশ নিয়েছি। আর প্রবীরদা ছাড়া, প্রবীরদার *ইনস্ট্রাকশন* মতো অ্যাকশন এই প্রথম।

এখন অবাক হয়ে ভাবি—কত শ্রেণির মানুষকে প্রবীরদা চেনেন, জানেন, ভালবাসেন, তাঁরাও প্রবীরদাকে ভালবাসেন। প্রবীরদার অনুরোধে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।"

একবার সাধনদা স্টাডি ক্লাসে আমাকে বললেন, আপনি লেখার সময় পান কখন? সবসময়েই তো আড্ডা দিচ্ছেন, ঘুরছেন, প্রোগ্রাম করছেন। তাহলে লেখেন কখন?

সিরিয়াস মুখ করে আমি সাধনদাকে বললাম, কাউকে না বললে আমি সত্যিটা জানাচ্ছি।

—না, না। কাউকে বলব না। আমাকে নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করুন।

—আসলে আমি লিখি না। লেখাগুলো আমার বউ লিখে দেয়।

এর কয়েকদিন পরে এক দুপুরবেলা সাধনদা একগাদা শিঙাড়া কিনে এনে আমার বউকে দিয়ে বললেন, প্রবীরদার লেখাগুলো সব আপনি লেখেন?

বউ বললেন, হ্যাঁ।

—আপনার কষ্ট হয় না? এত কষ্ট করে লিখছেন, আর প্রবীরদা নাম কিনছেন।

—কী করব। প্রবীরের এখন নাম হয়ে গেছে। ওর নামে লিখলে বিক্রি হবে। দুটো পয়সা পাব। সংসার চলবে।

আমার বউয়ের কাহিনি শুনে সাধনদা প্রায় কেঁদেই ফেললেন।

এরকম অনেক মজা করেছি অনেকের সঙ্গেই।

একবার আমরা একটা মফস্‌সল শহরে গিয়েছি অনুষ্ঠান করতে। রাতে অনুষ্ঠান শেষে খাওয়া-দাওয়ার পর একটা হলঘরে ঢালাও বিছানায় শয্যা নিয়েছি। চলছে আড্ডা। আমাদের সঙ্গে ছিল গৌতম। গৌতম প্রামাণিক। ছোটখাটো চেহারা। অফুরন্ত উদ্যম তাঁর। আমাদের স্ট্রিট কর্ণারগুলোতে অনুষ্ঠান শুরুর আগেই মাতিয়ে রাখত। কপালে একটা সাদা পাগড়ি বেঁধে নিজের রচিত যুক্তিবাদী গান গেয়ে ডাফলি বাজিয়ে জমিয়ে দিত। আমাদের সঙ্গে প্রচুর অনুষ্ঠান করেছে গৌতম।

এই গৌতম একটা লাল টুকটুকে গেঞ্জি পরে আড্ডা দিচ্ছে। ইতিমধ্যে বার পাঁচেক শুনিয়ে দিয়েছে গেঞ্জিটা তাঁর এক আমেরিকা প্রবাসী শালাবাবু উপহার দিয়েছে।

আমিও গল্প প্রসঙ্গে জানালাম, আমার ছোট দুই ভাই আছে। এক ভাই বসিরহাটে থাকে। খেজুর রস সংগ্রহ করে ও জাল দিয়ে গুড় বানায় এবং সেগুলো হাটে গিয়ে বিক্রি করে।

গৌতম জিজ্ঞাসা করল, আর এক ভাই?

বললাম, আর বলিস না। ও খড়্গপুরের বিখ্যাত ওয়াগান বেকার। জেলেই থাকে অধিকাংশ সময়ে।

অনুষ্ঠান শেষে ফিরছি। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ট্যাক্সি করে বাড়ি যাচ্ছি, সকালবেলায়। গৌতম স্টেশনের কাছেই লিলুয়ায় থাকে। গৌতমের বউ আমাকে মোবাইলে ফোন করল, আপনার ভাইয়ের জন্য আপনি দুঃখ পাবেন না।

অথচ বাস্তবে আমি একই ভাই, এটা বললাম না।

২০০৯-এ বাঁকুড়ার মালিয়াড়ার কাছে একটা অনুষ্ঠানে গেছি। বাল্যবিবাহ রোধের অনুষ্ঠান। যুক্তিবাদী সমিতির ওখানকার শাখার নেতৃত্বে একটা বাল্যবিবাহ রোধ হয়। যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই নিয়েই অনুষ্ঠান।

সেখানেই একটি ছেলে, বিপত্তারণ পরামানিক-এর সঙ্গে আলাপ হল। আইআইটি খড়্গপুরের ছাত্র। ও অনেক কথা বলল। তবে আমার সম্বন্ধে ওর অন্তরের ধারণাটা পরে জানলাম ওর একটা লেখা থেকে।

'প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ' থেকে সেই অংশটুকু ওর বয়ানে তুলে দিচ্ছি—

"প্রবীর ঘোষ, প্রবীরদা হয়ে ওঠেন এক সময়। ৫ জুলাই, ২০০৯। প্রথম প্রবীরদার মুখোমুখি হই বাঁকুড়ার মালিয়াড়ার কাছেই। এখানে নাবালিকা, পদ্মা রুইদাসকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। প্রতিবেশী চায়না তেওয়ারি ও যুক্তিবাদী সমিতির নেতৃত্বে বিয়ে বন্ধ হয়। আর সেই সূত্রে প্রবীরদা ও সুমিত্রাদি এসেছিলেন। কেন নাবালিকার বিবাহ বন্ধ হওয়া দরকার ও কীভাবে আইনের সাহায্য নিয়ে তা করা যায় এসব আলোচনা করতে এবং পদ্মা রুইদাসকে সম্মান জানাতে যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠান হয়। আর সেখানেই প্রবীরদার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটে। প্রাঞ্জলভাবে কোনও বিষয়কে বোঝানো, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আর সাধাসিধে জীবনযাপন, লেখকোচিত অহংকার বাগাড়ম্বর না দেখানো—গুণগুলো আমার প্রথম দিনই চোখে পড়ে। যাইহোক, আলোচনা শেষে আমি, সুমিত্রাদি ও প্রবীরদা একসঙ্গে গাড়িতে ফিরছিলাম। গাড়িতে প্রচুর গল্প হয়।

আমি কী করি, যুক্তিবাদী সমিতি কেমন লাগে, প্রবীরদার কী কী বই পড়েছি। কথাপ্রসঙ্গে আমি জানালাম সাঁইবাবার বুজরুকি ফাঁসের ভিডিওটা আমি কিছুদিন আগে Youtube-এ দেখলাম, দারুণ লাগল। প্রবীরদা উত্তর দিলেন আরও অনেক ভিডিও আছে দেখো, আবার অনেক নেই। কারণ ভিডিও করার পর মিডিয়াগুলো অনেক সময়ই আমাদেরকে কপি পাঠায়নি। একবার ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক আমাদের নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি বানিয়েছিল। কিন্তু সেটার কপি আমাদের কাছে নেই। চলন্ত গাড়িতে হঠাৎ ব্রেক কষার মতোই আমি ঝাঁকুনি খেয়েছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম আপনি যেমন সুন্দর লিখতে পারেন। তেমনই গুছিয়ে গুলও মারতে পারেন। ধুস, খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক আপনাকে নিয়ে ডকুমেন্টারি বানাবে। সেদিন ঢপ মারাটা খুব খারাপ লেগেছিল। তবে সে খারাপ লাগা বেশিদিন টেকেনি। ইন্টারনেটে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একটা ডকুমেন্টারির মধ্যে হঠাৎ প্রবীরদা ও সুমিত্রাদিকে খুঁজে পেয়েছিলাম। আরও

অনেকে অবশ্য ছিলেন, তবে তখন আমি প্রবীরদা ও সুমিত্রাদি ছাড়া সেন্ট্রাল কমিটির আর কাউকে চিনতাম না। ডকুমেন্টারির নাম Supernatural, is it real? আছে প্রবীরদার নেতৃত্বে সাঁইবাবা, সত্যানন্দ ও এক ফকিরের বুজরুকি ফাঁস। সেদিন খুব আনন্দিত ও লজ্জিত হয়েছিলাম, আর প্রবীরদার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। না, আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন প্রবীরদা গুল মারেননি। এখন বুঝি মিথ্যে বলা বা কোনও ঘটনা অতিরঞ্জিত করার স্বভাব প্রবীরদার মধ্যে একদম নেই।"

আমাদের সমিতির আন্দোলন-অন্ত প্রাণ একটি যুবক। থাকে মেদিনীপুরে। খুব আবেগপ্রবণ, সরল ছেলে। ও জানে যে, আমি ব্যাঙ্কে কাজ করি।

একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোন্ পোস্টে কাজ করেন?

বললাম, ওয়াটার বয় পোস্টে।

—মানে?

—টেবিলে টেবিলে জল দেই। বেয়ারা আর কি।

ও বলল, ঠিক ধরেছি। দেখেই বুঝেছিলাম। নচেৎ লেখার জন্য এত সময় পান কী করে?

এরকম অনেক দুষ্টুমি করেছি অনেকের সঙ্গে। সকলে মজাই পেয়েছেন। মজা পেয়েছি আমিও।

২০০১ সাল। তখন আমরা ক্লাস করি জ্যোতিদার বাড়িতে। সেদিন বাসে যাচ্ছি, আমার সঙ্গী বিপ্লব দাস। খালপুল স্টপেজের সামনের গেট দিয়ে নেমেই দেখি পিছনের গেটে চ্যাঁচামেচি হচ্ছে। বাসের কন্ডাক্টররা সামনের গেট থেকে পিছনের গেটে চলে গেছে। একটা লোক প্রতিদিনই টিকিট না কেটে বাসে চড়ত। আজ ব্যাটাকে ধরেছে।

একজন লম্বা, গৌর বর্ণের পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত এক বয়স্ক ভদ্রলোককে ঘিরে ঝামেলা। ভদ্রলোক যত চ্যাঁচান তার থেকেও বেশি চ্যাঁচান বাসের লোকেরা। দেখলাম উনি আমাদের সমিতির অতি বয়স্ক সদস্য সমীর দে।

সমীরদার এরকম কাণ্ড-কারখানা প্রায়ই চলত। 'কে কে চা খাবে' জিজ্ঞেস করতে কতগুলো হাত উঠল। কাছেই চায়ের দোকান। চায়ের দোকানে বলে এলে তারাই চা দিয়ে যায় এবং টাকা নিয়ে যায়। সমীরদা হাত তোলেননি। সুমিত্রাদি বললেন, যে চায়ের কথা বলতে যাবে তাকে পয়সা দিতে হবে না। ওমনি সমীরদা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে চায়ের কথা বলতে চলে গেলেন।

একবার কোনও একটা উপলক্ষে অরুণদার বাড়িতে এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে

আসা হয়েছে। এনেছিলেন বোধহয় সুমিত্রাদি। সবাইকে মিষ্টি দেওয়া হল। তারপর প্রচুর মিষ্টি ছিল। সেটা অরুণদা'র হাতে দিয়ে বললাম, ওগুলো আপনারা খাবেন। আমরা গিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

সমীরদা তো সবার আগে গাড়িতে ওঠে। আজ গাড়িতে নেই কেন! পেছনে অরুণদার গেটের দিকে তাকিয়ে দেখি সমীরদা মিষ্টির হাঁড়িটা হাতে নিয়ে গপাগপ গপাগপ খেয়ে চলেছে।

আমার এক স্কুল শিক্ষকের মেয়ে ক্লাসে আসত। তাঁর বাড়ি সাউথ কলকাতায়। সমীরদা থাকতেন দমদমে। কিছুদিন মেয়েটি সমিতিতে আসছে না কেন খবর নিতে ফোন করলাম।

মেয়েটি বলল, সমীরদার হ্যাংলামোর জন্য আমার আর ওখানে যেতে ইচ্ছে করে না। দুপুরে বর অফিসে থাকেন। ঘরে আমি একাই। ওই সময় সাড়ে ১২টা-১টায় আসতেন এবং গল্প করতে করতে কী রান্না করেছিস বলে খেয়ে যেতেন। এবং ওর চোখের দৃষ্টি খুব খারাপ। মনে হচ্ছে চোখ দিয়েও যেন আমাকে চেটে খাচ্ছে।

কিন্তু সমীরদার একটা বিশাল গুণ আছে। তিনি প্রচণ্ড পড়াশোনা করেন। যে কোনও কিছু তথ্য তাঁর মগজে সবসময় ঠাসাই থাকে। জিজ্ঞেস করলেই সেগুলো ঝরঝর করে বলতে থাকেন।

ভাল-খারাপ নিয়েই মানুষ। সমীরদা যেমন খারাপ তেমনই যা ভালো গুণ সেগুলো না বললে খুবই অন্যায় হবে।

অনিন্দ্যর সঙ্গে আমার যোগাযোগ 'পত্রাঘাত'-এর মধ্য দিয়ে। অনিন্দ্য তখন স্কুলে পড়ে আর তাঁর প্রেমিকা শ্যামলীও স্কুলে পড়ে। শ্যামলী কী পোশাক পরে অমুক দিন যাচ্ছিল, তাঁর দু'দিকে বেণী বাধা থাকত কি না—এই প্রসঙ্গগুলোকে নিয়ে চিঠি লিখত। এক একটা চিঠি একশো পাতার কমা নয়।

আমি কী অত পড়তে পারি। এই পত্রাঘাতে পাগল হওয়ার জোগাড়। প্রতি সপ্তাহেই একটা করে 'পত্রাঘাত'। তারপর কলেজে উঠল। যুক্তিবাদী সমিতির সঙ্গে যুক্ত হল। মেয়েটার সঙ্গে প্রেমও বাড়ল। তবে আমার মনে হয় ওর একমাত্র প্রেমিকা শ্যামলীর প্রেমিক একমাত্র ছিল না।

শ্যামলীরা প্রাদেশিকতার সুবাদে ওড়িয়া। অনিন্দ্য পড়াশুনার জন্য গেছিল মেদিনীপুর শহরে। যুক্তিবাদী আন্দোলন ও হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে অনিন্দ্য অনেকটাই জড়িয়ে ছিল কিন্তু ও ছিল একা এবং একা। আর কোনও সদস্যকেই ওর ঘরে ঢুকতে দিত না। শ্যামলীও ওই বাড়িটার একটা ঘরে থাকত। অনিন্দ্যর চোখে শ্যামলী ছিল বিশ্ব সুন্দরী। ও প্রায়ই গল্প করত অমুক ছেলেরা

ওকে টিজ করেছে তমুক ছেলেরা ওকে শ্লীলতাহানি করেছে।

আমি প্রতিবারই বলতাম, শ্যামলীকে বল একটা Complaint Letter প্রিন্সিপালকে অথবা থানায় দিতে।

ও শ্যামলীকে বলত, প্রবীরদা এই কথা বলেছে। তাতে শ্যামলী বলত, না এটা করলে ওরা আরও আমার পিছনে লাগবে।

তাবৎ শহরের সব ছেলেরাই ওর প্রেমে পাগল। শ্যামলী কবিতা লিখত। কবিতা নিয়ে দেশ পত্রিকায় দিতে আসত। আর তারা নাকি সবাই মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্যামলীকে বিছানায় শুইয়েছে।

অনিন্দ্য খবর দিল দু'জনের যে কেউ একজন চাকরি করে বিয়েটা করে ফেলবে।

অনিন্দ্যর বাবা ছিলেন 'খুব সহজ-সরল'। জেলার 'উপ-সভাধিপতি'। সিপিএম করতেন। তিনি জামাইকে স্কুল ইন্সপেক্টরের চাকরি দিয়েছেন। আর ছেলেকে না দিয়ে ছেলের অনুরোধে শ্যামলীকে হাই-স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি দিলেন, তাও আবার মেদিনীপুর শহরের ঠিক কাছেই।

আমাদের যুক্তিবাদী পত্রিকার জন্য অনিন্দ্য লেখা পাঠাত। ওকে সবসময় বলা হত লিট্‌ল ম্যাগাজিনে ৬০০-৮০০ শব্দের বেশি না লিখতে। কিন্তু লেখা পাঠাত ৭০ থেকে ৮০ পাতা। তারপর ওর লেখা এডিট করতে দিয়ে দিতাম অঞ্জনের হাতে। অঞ্জন লেখাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাতার সংখ্যা কমিয়ে ৬০০-৮০০ শব্দে যখন নামাত, তখন অঞ্জনকে ওর কঠোর পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ না দিয়ে পারতাম না।

অনিন্দ্য একবার কাঁদতে কাঁদতে বলল, শ্যামলী আমাকে ফোনে বলেছে আমাকে বিয়ে করবে না। তাই আমি আত্মহত্যা করব।

বললাম, কেন রে?

বলল, শ্যামলী বলেছে শালগ্রাম সাক্ষী রেখে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে হবে। যুক্তিবাদী হিসেবে সেটা করা অসম্ভব।

আমি বললাম, তাতেই রাজি হয়ে যা। যতবার ছুতো দেবে ততবার হার্ডল টপকে বিয়ে করে ফেল। তারপর এক বছরের মধ্যেই বাবা হয়ে যা। না হলে ও কিন্তু তোকে ডিভোর্স করবেই।

অনিন্দ্যর বিয়ে। আমাদের সমিতির জনা কুড়ি ছেলে নিয়ে গেলাম অনিন্দ্যর বাবার বাড়ি পাঁশকুড়ায়। সেখানে চারটে প্রাইভেট গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই গাড়িতে আধঘণ্টা পর ওর গ্রামে পৌঁছলাম। অনিন্দ্য বলেছিল, ওর বাবা এক কোটি টাকা দিয়ে স্কুল বানিয়ে দিয়েছে। পাড়ায় ঢোকার মুখেই ইস্কুলটা দেখতে পেলাম। বড়সড় স্কুল।

বিয়ে বাড়িতে গিয়ে দেখি, একটা জায়গা গোল করে চট দিয়ে ঘেরা। এই চট দিয়ে ঘেরাতে একটা রাধাকৃষ্ণের মন্দির থাকার সম্ভাবনা ভেবে গোটা দু'য়েক

ছেলে নিয়ে চটের তলা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। কারণ, গ্রামে চাষারা সাধারণত বৈষ্ণব ধর্মের হয়। দেখি—হ্যাঁ রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। আর জল-সন্দেশ দেওয়া হয়েছে। সন্দেশগুলো আমরা টপাটপ খেয়ে ফেললাম। বুঝলাম উনি খুবই নিষ্ঠাবান সিপিএম করেন।

সিপিএম হারল। তৃণমূলরা জিতল। ওর বাবা খুন হওয়ার ভয়ে দিল্লি পালিয়ে গেল। অনিন্দ্য বলল, আমার বাবাকে না তৃণমূলের ছেলেরা খুন করবেই। ওকে বাঁচান।

যাইহোক, কিছু হল না। বেশ কিছুদিন পালিয়ে থেকে তারপর সিপিএম-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিপ্লবের শেষ কাজটুকু সমাপ্ত করল।

এদিকে অনিন্দ্যর গল্প প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অনিন্দ্যর বউ ডিভোর্স নোটিস পাঠাল অনিন্দ্যর কাছে। আর অনিন্দ্য পাগল হয়ে গেল। অনিন্দ্যর বাবা পাঁশকুড়ায় স্টেশনের কাছে একটি নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে। অনিন্দ্য সেখানেই থাকে। ট্রিটমেন্ট করে। আবার শনিবার রাতে মতিঝিলে আমার ছেলের একটি ফ্ল্যাটে ঢোকে। রবিবার থাকে, খায়-দায়। আবার সোমবার নিজের দেশের বাড়ি চলে যায়।

আমার ওপর অনিন্দ্যর খুব রাগ আছে। ওর ধারণা, আমি যদি ওর বউকে হুমকি দিতাম, ওর বউ ডিভোর্স দিতে সাহস পেত না।

মেদিনীপুর নিবাসী একটি ছেলে আমাদের সদস্য ছিল। গরমকাল ছাড়া প্রায় সবসময়ই দেখতাম মাফলার দিয়ে কান, গলা সব ঢেকে রাখত। আত্মবিশ্বাস ছিল তলানিতে। আমাকে জিজ্ঞেস করত—প্রবীরদা এবার মাফলারটা খুলব!

এই ছেলেটি কী করে যেন একটি মেয়েকে পটিয়ে ফেলল। পরে বুঝলাম, মেয়েটি ছেলেটিকে পটিয়েছে একটা স্কুলের চাকরি জোগাড় করতে। কারণ, ছেলেটির বাবা একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি। স্কুলের চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল। ওদের দু'জনের মধ্যে চুক্তি ছিল, একজন কেউ চাকরি পেলেই দু'জনেই বিয়ে করে ফেলবে।

ছেলেটি আর তার বান্ধবী মাঝে-মধ্যে কোলকাতায় আসত। এলে উঠত সমিতির গেস্ট হাউজে অথবা বেলেঘাটায় জ্যোতিদার বাড়িতে।

একবার ওরা গেস্ট হাউজে আছে। আমাদের সেদিন স্টাডি ক্লাস ছিল। কয়েকজন গিয়েছি। গেস্ট হাউজের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ডোর বেল টিপছি, নাম ধরে ডাকছি। সাড়া-শব্দ নেই। অনেক পরে দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল দেবা-দেবী।

দেবা অশ্লীল একটা হাসি ছড়িয়ে বলল, কেন দেরি হল বলুন তো।

বললাম, জানি না।

দেবা নির্লজ্জ ভাষায় বলল—আমরা তখন করছিলাম তো তাই।

আর এই কথাগুলো শুনে দেবী বেশ্যাপল্লীর মেয়ের মতো একটা অশ্লীল হাসি হাসল।

বিপাশা চ্যাটার্জি স্কুল জীবন থেকেই যুক্তিবাদী সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তখন ও থাকত ত্রিকোণ পার্কে। বাবা সরকারি স্কুলের হেডমাস্টার। মা অসুস্থ। বিপাশা বর্তমানে মনোবিদ এবং কাউন্সেলিং করে বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের। কাজটা সরকারের। যাতায়াতে গাড়িও পায়।

সুমিত্রার পর বিপাশাই আমাদের সমিতির অন্তপ্রাণ। কলকাতা বইমেলায় যুক্তিবাদী সমিতির স্টল প্রতিদিন খোলার দায়িত্ব ছিল বিপাশার। এবং প্রতিদিন কেউ না এলেও বিশাল বিশাল বইয়ের বোঝা নিয়ে নিজেই লিটলম্যাগ টেবিলে বইপত্র সাজাত। খুব রাফ এবং টাফ্ মেয়ে।

মানসী মল্লিক। বর্তমান বয়স চৌত্রিশ বছর। উচ্চতায় ফুট পাঁচেক। একটু শীর্ণ। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট কলেজে এম এ করেছে। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন লেকচারার পদে কাজও করেছে। আমাদের যে কোনও অ্যাকশনে ও অবশ্যই যেত মুভি ক্যামেরা নিয়ে। খুব চটপটে। অ্যাকশনেও সাংঘাতিক পটু ছিল।

অণিমা চক্রবর্তী কোলিয়ারি এলাকার মেয়ে। বইমেলায় প্রচুর অপরিহার্য। সেরা যুক্তিবাদী সংকলনেও প্রচুর সাহায্য করেছে।

কনফারেন্স মানেই কাউন্টারে বসবে চৈতালী আর সবদিক সুন্দরভাবে সম্পন্ন করত।

বিপ্লব দাস স্কুল জীবন থেকেই যুক্তিবাদী মানসিকতায় পরিচালিত ছেলে। এখন কিছু বছর হল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কাজ করছে। পোস্টিং বাঁকুড়ায়। অসাধারণ প্রোগ্রাম করে। লেখার হাতও খুব ভাল। প্রচণ্ড ডায়নামিক এবং বর্তমানে যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

অরিন্দম ভট্টাচার্য যুক্তিবাদী সমিতির অন্যতম সম্পাদক এবং আমার আপ্তসহায়ক। খুব সাহসী, কিঞ্চিৎ রগচটা। যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছেলে।

সঞ্জয় কর্মকার বর্ধমানে থাকে এবং পেশায় চিত্র-সাংবাদিক। অসাধারণ সাহসী,

তীক্ষ্ণ মেধা। খুব ভাল সংগঠক। সমিতির কোনও কাজ কোথাও আটকে গেলে সঞ্জয়কে ফোন করলে সে দিশা দেখিয়ে দেয়। আমাদের কিছু কঠিন অ্যাকশনে সঞ্জয় এবং অনাবিল সেনগুপ্ত প্রবল ভূমিকা নিয়েছে।

সন্তোষ শর্মা এখন হিন্দি পত্রিকার প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক। ও উঠে এসেছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়েও সাংবাদিকতার তীব্র আকর্ষণ তাকে এই জীবন বেছে নিতে বাধ্য করেছে।

আমাদের অনেক লেখা হিন্দিতে অনুবাদ করে চলেছে এবং অলৌকিক নয়, লৌকিক অনুষ্ঠানে ও প্রচুর অনুষ্ঠান করেছে এবং করে চলেছে।

অঞ্জন চক্রবর্তী মধ্যবয়স্ক। আমাদের সমিতির তাত্ত্বিক নেতা। লেখার হাতটিও বড় সুন্দর।

মণীশ রায়চৌধুরী আর এক তাত্ত্বিক নেতা। বয়সে তরুণ কিন্তু জ্ঞানে পরিপক্ক। ওর হাতেও লেখা ভাল খেলে।

জয়দীপ মুখার্জি। প্রতিদিন জিমে যাওয়া অসাধারণ স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান টকটকে ফর্সা এক যুবক। ওর পেশা নাইট ক্লাবে মিউজিক ইন্সট্রুমেন্ট বাজানো। এই পেশায় নিযুক্ত নাইট ক্লাব গায়িকারা প্রায় প্রত্যেকেই কলগার্ল। এবং যারা মিউজিসিয়ান তারা ওদের দালাল। এই দালালি করলেও প্রচুর টাকা প্রতিদিন আসে।

জয়দীপ এই পেশাতে থেকেও দালালি করে না। হোটেলে মাগনায় মদ্যপানও করে না। এই লাইনে এমন একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র আমার চেতনাকে নাড়া দিয়েছে। এ তো পাঁকে থেকে পঙ্কজ। ও আমার প্রতিটি বই পড়েছে এবং খুব যুক্তি দিয়েই বিভিন্ন জায়গায় সুন্দর আলোচনা করে। জয়দীপ তোমাকে সেলাম।

ডাঃ নেহা গুপ্তা, অনাবিল সেনগুপ্ত, সুমন দাঁ, মৃণাল কয়াল, পঙ্কজ কুশারী, ধৃতিমান ভট্টাচার্য এরা যুক্তিবাদী সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী।

এতক্ষণ যাঁদের কথা আলোচনা করলাম তাঁরা আমার সঙ্গে প্রকাশ্য সংগ্রামে থাকেন। কিন্তু গুপ্তবাহিনী বিশাল। তাতে পুলিশ, মিলিটারি, আই এ এস, আই পি এস থেকে শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক, ছাত্র সব শ্রেণির মানুষ আছেন। ছত্তিশগড়, অন্ধ্র, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ—এই প্রতিটা অঞ্চলের স্বয়ম্ভর গ্রামগুলোতে রয়েছে আমাদের গুপ্ত বাহিনী। এদের নাম কোনও দিন বলা হবে না। যুদ্ধ জয়ের জন্যই গোপনীয়তা আবশ্যিক শর্ত।

আমার বান্ধবীরা

আমার কয়েকজন বান্ধবীর কথা উল্লেখ করতে চাইছি। ওদের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল।

এক বিদূষী, স্ট্রেট-ফরোয়ার্ড বান্ধবীকে খুব ভাল লাগত। তাঁরও আমাকে নাকি ভাল লাগত। বান্ধবীর এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে বিছানায় উঠতে চাইলেন। বান্ধবী বললেন, তোমার সঙ্গে বিছানায় উঠতে আমার কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু একবার করার পর আর আমার সঙ্গে করতে ভাল লাগবে না।

ছেলেটি বলল, এরকম কেন মনে হল?

—আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে।

এই বান্ধবী একটি উচ্চপদে চাকরি করতেন। সেই অফিসের চাপরাশি থেকে নিজের বাড়ির কম্পিউটার সারাই করতে আসা লোক, কারও সঙ্গেই মিলিত হতে কোনও দিনই আপত্তি ছিল না।

আর এক বান্ধবী, হোটেলের বেয়ারা থেকে একটি নিম্নবর্গীয় পুরুষ দেখলেই তাঁর উত্তেজনা চরমে উঠত।

আর এক বান্ধবী বেশকিছু কমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে দেহমিলনে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন, তোমাদের অল্পবয়স্কা মেয়েদের সঙ্গে করতে বেশি ভাল লাগে তো? আমাদের মেয়েদেরও অল্পবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে করতে বেশি ভাল লাগে।

আর এক বান্ধবী আমাকেই প্রশ্ন করেছিলেন, অনেকের সঙ্গেই মিলিত হলে হাতি-ঘোড়া কি হয়? একজনের বডির পার্ট আর একজনের বডির পার্টে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। কিছুই না। দু'জনেই আনন্দ পেল।

বাংলাদেশের খুব নামীদামি গায়িকা, দেখতে সুন্দরী। বাংলাদেশে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলাম। আমি উঠেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউজে। সেখানে উনি আমার উষ্ণ ঘনিষ্ঠতা চাইলেন।

আমি পারিনি। কিন্তু উনি এখনও ফোন করেন, CD পাঠিয়ে দেন। আবার একটি তিন না চার নম্বর বিয়েও করে ফেলেছেন।

অন্ডাল একটা কোলিয়ারি বেল্ট। সেখানে প্রভূত কাঁচাপয়সা। চোরাই কয়লা বিক্রি করে অনেকে বিরাট ধনী। এছাড়া পড়াশুনার চলও নেই।

ওখানকার কালচারে প্রায় বিবাহিত পুরুষ ও নারীরা একাধিক অবৈধ সম্পর্ক বজায় রেখে দিব্যি চলে।

অন্ডালের একটি মেয়ে সমিতির গেস্ট হাউজে এসে কয়েকদিন ছিল। একদিন আমি দুপুর নাগাদ গেস্ট হাউজে গেছি। দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ও বলল, ম্যাগি খাবে?

বললাম, কর।

একটু পরেই দুই প্লেট ম্যাগি নিয়ে এলো। একটু চমকে গেলাম, দেখলাম ও শুধু প্যান্টি পরে আছে। ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা সুতোও নেই। কিন্তু কোনও জড়তাও নেই।

আমি বললাম, পাগল নাকি? একটা কামিজ চাপিয়ে আয়।

ও বলল, ধুর, আমি বাড়িতে বাবার সামনে এভাবেই তো থাকি।

ওকে গেস্ট হাউজ থেকে সেদিনই বিদায় করে দিয়েছিলাম।

এরকম অভিজ্ঞতা আমার অনেক রয়েছে এবং দেখেছি মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে সহজেই সেক্স নিয়ে কথা বলতে পারেন।

একটি আত্মার অভিশাপ ও ক্যারাটে মাস্টার

৮৭-র ১ জুলাই, প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে সন্ধে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখি লোডশেডিং-য়ের মধ্যে বৈঠকখানায় চার তরুণ আমারই অপেক্ষায় বসে। দুজন এসেছেন একটি সায়েন্স ক্লাব থেকে ওঁদের একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে। তৃতীয় তরুণ রবীন্দ্রনাথ পাইন জানালেন, তিনি এসেছেন একটা ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে। চতুর্থজন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী। দুই তরুণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা সেরে বিদায় দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের দিকে মন দিলাম। রবীন্দ্রনাথের ডাক-নাম রবি। বয়স জানাল একুশ। অনুমান করলাম লম্বায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চির মধ্যে, ওজন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন কেজি। পরনে সাদা টেরিকটনের ট্রাউজার ও কালো গেঞ্জি। ট্রাউজারের ফ্যাসানে আধুনিকতার ছোঁয়া; উরুর পাশে কালো সুতোয় মোটা করে লেখা Ashihara Kai-Kan (Karate)। হাফ-হাতা গেঞ্জির জন্য বাহুর যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে হাউন্ডের মতো পেশীর আভাস। রবির চোখে দৃষ্টি ও ফাঁক হয়ে থাকা এক জোড়া ঠোঁট স্পষ্টতই ওর মানসিক ভারসাম্যের অভাবের ইঙ্গিত বহন করছিল।

রবি কথা শুরু করল এইভাবে, আপনি আমাকে বাঁচান, নইলে মরে যাব। আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই।

বললাম, আমার দ্বারা তোমাকে যদি বাঁচানো সম্ভব হয়, নিশ্চয়ই বাঁচাব। তোমার সব কথাই শুনব, তার আগে বলো তো, আমার ঠিকানা কোথা থেকে পেলে? কেউ তোমাকে পাঠিয়েছেন?

—জুন সংখ্যা 'অপরাধ' পত্রিকায় আপনার একটা ইন্টারভিউ পড়ি গতকাল। লেখাটা পড়ে আমার মনে হয়, কেউ যদি আমাকে এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারেন, তবে সে আপনি। আমি অপরাধ পত্রিকার অফিস থেকেই আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করেছি।

ইতিমধ্যে আমাদের জন্য লেবু-চা এসে গেল। দুটো কাপ রবি ও রবির বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, বাঃ, তুমি তো খুব তৎপর ছেলে।

রবি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, না, না, তা নয়, আপনি যদি আমার বর্তমান মানসিক অবস্থাটা বুঝতেন, মানে আমি আমার মানসিক অবস্থা আপনার সামনে খুলে দেখাতে পারতাম, তাহলে বুঝতেন একান্ত বাঁচার তাগিদেই আমি আপনার ঠিকানার জন্য কালই লেখাটা পড়ে পত্রিকার অফিসে দৌড়েছি।

—যাই হোক তুমি যখন আমার কাছে এসেছ, তোমার সব কথাই শুনব এবং সাধ্যমতো সমস্ত রকমের সাহায্য করব। ততক্ষণ বরং আমরা চা খেতে খেতে তোমাদের বাড়ির কথা শুনি।

একটু একটু করে ওর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম। মা, বাবা, সাড়ে চার বছরের ভাই পুকাই ও রবিকে নিয়ে ছোট সংসার। বাবা ঘনশ্যাম পাইন আপনভোলা মানুষ, গুণী যন্ত্রসংগীত শিল্পী। বহু ধরনের বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়েছেন বাংলা ও বোম্বাইয়ের বহু জনপ্রিয় লঘু-সংগীত শিল্পীর সঙ্গে। অনেক সিনেমা এবং নাটকেও যন্ত্রসংগীত শিল্পী হিসেবে অংশ নিয়েছেন। স্থায়ী আবাস তৈরি করে উঠতে পারেননি। থাকেন কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে 'আলোছায়া' সিনেমা হলের কাছে ভাড়া বাড়িতে।

রবি 'আসিহারা কাইকান ক্যারাটে অরগানাইজেশন'-এর ফুলবাগান ব্রাঞ্চের নিষ্ঠাবান প্রশিক্ষক। পার্ক সার্কাসে অরগানাইজেশনের প্রধান কার্যালয়। প্রধান পরিচালক ভারতীয় ক্যারাটের জীবন্ত প্রবাদ পুরুষ দাদি বালসারা। ফুলবাগান ব্রাঞ্চটা 'এল' পার্কে। এখানে রবি ক্যারাটে শেখায় সপ্তাহে তিন দিন, রবি, বুধ ও শুক্র, সকাল ৬টা থেকে ৮-৩০। নিজে সিনিয়ার ব্রাউন বেল্ট। এবারই ব্ল্যাক বেল্ট পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। বর্তমানে অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেনি।

কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে এমনকী বাংলার বাইরেও বহু ক্যারাটে প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে রবি। কখনও দাদি বালসারার সঙ্গে, কখনও ব্যক্তিগতভাবে। শেষ প্রদর্শনী '৮৬-র সরস্বতী পুজোর দিন বেলেঘাটা কর্মী সংঘের মাঠে। সেদিন কনুইয়ের আঘাতে রবি আটটা বরফের স্ল্যাব ভেঙে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল, ভালবাসা আদায় করেছিল। দুটো বিশাল বরফের চাঁই কেটে তৈরি হয়েছিল ওই আটটা স্ল্যাব।

রবি এবার আসল ঘটনায় ফিরল। বলতে শুরু করল, মাস দুয়েক আগের ঘটনা, সে দিনটা ছিল এপ্রিলের ২৫, শনিবার। খবর পেলাম রবি নামে একটা

ছেলে ট্রেনের তলায় মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। খবরটা পেয়ে যখন দেখতে হাজির হলাম তখন দেরি হয়ে গেছে, পুলিশ লাশ নিয়ে চলে গেছে।

পরদিন রবিবার, সকালে ক্লাবে ক্যারাটে ট্রেনিং দিয়ে বাড়ি এলাম ন'টা নাগাদ। আমাদের বাড়িতে এক উঠোন ঘিরে কয়েক ঘর ভাড়াটে। ক্যারাটের ব্যাগ নিয়ে ঢুকলাম পাশের কার্তিক কাকুর ঘরে। এটা-সেটা নিয়ে গল্প করতে করতে এক বাটি মুড়ি এসে গেল। হঠাৎ গতকালের রেলে কাটা পড়ার কথা উঠল। কাকুকে বললাম, গতকাল যে ছেলেটা কাটা পড়েছে সে নাকি আত্মহত্যা করেছে, নাম ছিল রবি। ওই রবির বদলে আমি রবি গেলেই ভাল হত।

ওই রবির মদলে আমি রবি মরলে ভাল হতো, এই কথাটা ঘুরে ফিরে বার কয়েক প্রকাশ করতেই হঠাৎই কাকু আমার চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, খুব মরার শখ হয়েছে, না রে?

কাকুর ওই কথাটা কেমন একটা অদ্ভুত শিহরন জাগিয়ে কেটে কেটে আমার মাথায় ঢুকে গেল। মাথার সমস্ত চিন্তাগুলো তালগোল পাকিয়ে গেল। কাকুর চোখের দিকে তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠল। মুহূর্তে আমার সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে নিল। থরথর করে কাঁপছিলাম। দু-পায়ের উপর নিজের শরীরকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। একসময় দেখলাম হাতের বাটি থেকে মুড়িগুলো ঝরঝর করে পড়ে যাচ্ছে। গা গুলিয়ে উঠল। ঘরের চৌকাঠ পেরুলেই এক চিলতে বারান্দা। কোনও মতে বারান্দায় গিয়ে হাজির হতেই হড় হড় করে বমি করে ফেললাম। আমার চোখের সামনে ছয়-সাত বছর আগে দেখা একটা দৃশ্য ছায়াছবির মতো ভেসে উঠল।

আশি বা একাশি সালের বর্ষাকালের সকাল। আনন্দ পালিত রোডের ব্রিজটার ওপর দিয়ে আসছিলাম বাজার করে। অনেক তলায় রেল লাইনের মিছিল, যথেষ্ট ব্যস্ত লাইন। দু-পাঁচ মিনিট পরপরই ট্রেন চলাচল করে, একটু দূরে লাইনের ধারে একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। লোকটা আত্মহত্যা করবে না তো?

মিনিটখানেক অপেক্ষা করতেই একটা ট্রেন আসতে দেখলাম। লোকটা চঞ্চল হল। ট্রেনটা কাছাকাছি হতেই লোকটা লাইনের উপর গলা দিয়ে দু'হাত দিয়ে লাইন আঁকড়ে রইল।

তীব্র সিটি বাজিয়ে ব্রেক কসল ট্রেনটা। দু-পাশের চাকা থেকে আগুনের ফুলকি ছিটোতে ছিটোতে ট্রেনটা লোকটার উপর দিয়ে চলে গেল। গলাহীন শরীরটা পাথরের টুকরোর ঢাল বেয়ে নেমে এল। গাড়িটা যখন থামল তখন শেষ কামরাটাও লোকটার দেহ অতিক্রম করে গেছে। গার্ড নেমে দেহটা দেখে খাতায় কী নোট করে সিটি বাজিয়ে দিল। বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টের দরজা-জানলা দিয়ে উঁকি মারা অনেক উৎকণ্ঠিত মাথা নিয়ে ট্রেনটা চলে গেল। এবার আমি কাটা মুণ্ডুটাকে দেখতে পেলাম। দু-পাশের রেললাইনের মাঝামাঝি পড়ে রয়েছে।

আনন্দ পালিত রোডের আত্মহত্যার এই দৃশ্যটা সেইদিন সেই রাতে বহুবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সারাটা রাত প্রচণ্ড আতঙ্কে জেগে কাটালাম।

সকালে সকলের যখন ঘুম ভাঙল তখন আমি এক অন্য মানুষ। ক্যারাটে ইনস্ট্রাক্টর রবিন পাইন তখন ভয়ে জবুথবু একটা নব্বই বছরের বুড়ো।

আমার অবস্থা দেখে বাড়িওয়ালা কৃষ্ণগোপাল দেবনাথ আমাকে নিয়ে গেলেন কাঁকুড়গাছিতে তাঁর পরিচিত এক তান্ত্রিকের কাছে। প্রণামী হিসেবে দিতে হল এক কেজি চিনি, একটা মোমবাতি, একপ্যাকেট ধূপকাঠি ও একশো টাকা। তান্ত্রিকের নাম ধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ঠিকানা ৬৮ মানিকতলা মেন রোড।

তান্ত্রিকবাবা ধূপ মোমবাতি জ্বালিয়ে মড়ার খুলি নিয়ে কী সব মন্ত্র পড়লেন, ওটাকে নাকি খুলি চালান বলে। তারপর জানালেন—আনন্দ পালিত রোডের ওই ট্রেনে কাটা পড়া লোকটার আত্মাই আমার এই বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অতৃপ্ত আত্মা তিনজনকে রেললাইনে টেনে নিয়ে আত্মহত্যা করাবে। তৃতীয় যে ব্যক্তিকে মারবে সে হল আমি।

এই কথাগুলো শোনার পর আমার জিব শুকিয়ে গেল। কিছু বলতে পারছিলাম না। মাথায় যেন কেমন একটা অদ্ভুত শূন্যতা। শিরশিরে ভয়টা আরও বেশি করে মাথাচাড়া দিল। এরই মধ্যে শুনতে পেলাম ট্রেনের আওয়াজ। দেখতে পেলাম আনন্দ পালিত রোডের লোকটাকে। লোকটা লাইনে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। বাঁ হাতটায় ধরে রাখল লাইন। ডান হাতটা তুলে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি প্রচণ্ড আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম—না, যাব না।

তান্ত্রিকবাবার ছেলে আমার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছিল। শুনতে পেলাম তান্ত্রিকবাবার গলা—আত্মাটা ওকে ডাকছে। ব্যাটা একে ছাড়বে না।

কৃষ্ণগোপালবাবু বললেন, একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে বাবা। কী করতে হবে বলুন।

বললেন, একটা যজ্ঞ করতে হবে। তবে, ভূত ব্যাটা বড় সহজ পাত্র নয়।

বাড়ি এলাম আরও খারাপ অবস্থা নিয়ে। এসেই বিছানা নিলাম। ওই ২৬ এপ্রিলই ছিল শেষ ক্লাবে যাওয়া। শেখাবার মতো শারীরিক ও মানসিক জোর সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। মাঝেমধ্যে বন্ধুরা জোর করে বাইরে নিয়ে যায়, চুপ-চাপ বসে থাকি। গলায় হাতে কয়েকটা তাবিজ কবজ চেপেছে। কাজ হয়নি কিছুই। প্রচণ্ড ভয়ের শিরশিরানি নিয়ে প্রতিদিনই আনন্দ পালিত রোডের আত্মহত্যার ঘটনাটা ছায়াছবির মতোই আমার চোখে সামনে ভেসে বেড়ায়। ট্রেনের প্রচণ্ড ব্রেক কষার আওয়াজ, আগুনের ফুলকি আর রেললাইনে গলা দেওয়া লোকটার হাতছানি আমাকে ভয়ে পাগল করে তুলেছে।

একদিনের কথা, আমার এক ছাত্রের বাড়িতে গেছি। আমাদের দু-চারটে বাড়ির পরেই থাকে। বাড়িতে এক নাগাড়ে শুয়ে-বসে অস্থির হয়ে পড়ছিলাম বলেই

যাওয়া। এটা-ওটা নিয়ে কথা বলছিলাম। ছাত্রের ছোট ভাই খাতাতে একটা কী আঁকছিল। ঝুঁকলাম দেখতে। একটা ট্রেনের ছবি। মুহূর্তে আমার কানে ভেসে এল ট্রেনের প্রচণ্ড আওয়াজ। চোখের সামনে দেখতে পেলাম একটা ট্রেন প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষল। চাকা আর লাইনের তীব্র ঘষটানির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম দু'পাশে আগুনের ফুলকি। ভয়ে শরীরের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠল। মাথাটা কেমন চিন্তাশূন্য হয়ে গেল, চিৎকার করে উঠলাম। পরে শুনেছি, আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

আমি বুঝতে পারছিলাম, একটু একটু করে শেষ হয়ে যাচ্ছি। এমনিভাবে বেশিদিন বাঁচা যাবে না। আত্মার ভয়ের হাত থেকে বাঁচতে মৃত্যুই সবচেয়ে সুন্দর পথ বলে এক সময় ভাবতে শুরু করলাম। এই সময় এক প্রতিবেশীর উপদেশে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মানসিক চিকিৎসার জন্য হাজির হলাম। দিনটা ছিল ৪ জুন।

ডাক্তারবাবু সব শুনে বোঝালেন—আত্মা-টাত্মা কিছু নেই, এটা মনের ভয়। ওষুধ লিখে দিলেন। মানসিক রোগের চিকিৎসা শুরু হল। ওষুধ পেয়ে ঘুমোই খুব কিন্তু জাগলেই সেই প্রচণ্ড ভয়ের মুহূর্তগুলো হাজির হতে থাকে। প্রচণ্ড পিপাসায় গলা কাঠ হয়ে যায়। মনে হয় জিবটা কে যেন পেছন দিকে টানছে। আত্মহত্যার দৃশ্যটা আমাকে মুক্তি দেয়নি একটি দিনের জন্যেও। দিন দিন শক্তি কমেছে, কমেছে স্মরণশক্তিও। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করলাম চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। প্রতিটি দিনের অসহ্য যন্ত্রণার থেকে নিজেকে মুক্ত করার পথ নিজেই বেছে নিলাম। তিরিশে জুন সকালে সিদ্ধান্ত নিলাম আত্মহত্যা করব। সেদিন দুপুরে আমার এক বন্ধু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমার হাতে তুলে দিল জুন সংখ্যা 'অপরাধ' পত্রিকায় প্রকাশিত আপনার একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। বলল, পড়ে দেখ ভূত-প্রেত, আত্মা কিছুই নেই, বলে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন প্রবীর ঘোষ। লেখাটা পড়লে আমাদের পুরনো ধ্যান-ধারণাগুলো বড় বেশি মিথ্যে মনে হয়।

লেখাটা পড়ে ফেললাম। বারবার পড়লাম। কেমন যেন একটা আশার আলো দেখতে পেলাম। মনে হল, আপনি আমাকে ঠিক করতে পারবেন। আপনার ঠিকানা চাই। বন্ধুকে নিয়ে কাল বিকেলে গেলাম 'অপরাধ' পত্রিকার অফিসে। ঠিকানাটা পেয়ে আজ আপনার কাছে এসেছি। আজকাল আমি পথে বেরুতে ভয় পাই। একটা মোটরের হর্ন বা সাইকেলের ঘণ্টা শুনলেই আতঙ্কে লাফিয়ে উঠি।

—হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন সঙ্গে এনেছ? জিজ্ঞেস করলাম।

প্রেসক্রিপশনটা আপনার কাজে লাগতে পারে ভেবে নিয়ে এসেছি। এই যে—

দেখলাম। ৪/৬/৮৭ লেখা আছে—

Tryptanol 25 mg
1 tab at noon
2 tabs at evening
for 3 days

পরবর্তী এক তারিখে লেখা—

Tryptanol 25 mg
1 tab at noon
3 tabs at evening

পরবর্তী এক তারিখে লেখা আছে—

Tab tryptanol 25 mg
1 tab 3 times daily
Tab Eskazine 1 mg
1 tab 3 times daily

রবির সঙ্গে গল্প-সল্প করতে করতে খোলা-মেলা একটা সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুললাম। কথাবার্তার মধ্য দিয়েই ওদের পারিবারিক জীবনের অনেক খুঁটিনাটি কথা জানতে পারলাম।

রবির কথামতো—জ্ঞান হয়ে অবধি বাবার কাছ থেকে শুনে আসছে, তার দ্বারা কিছু হবে না। বাবা ছেলেকে যতটা না মানুষ হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন, যতটা না পড়াশুনার সুযোগ দিয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি ভর্ৎসনাই করেছেন। যত্ন করে বাজনার তালিম না দিয়েই বারবার ঘোষণা করেছেন, বাজনা বাজানো তোর কর্ম নয়, আমার ঘাড়ে বসে না থেকে এখন থেকে চরে খাওয়ার চেষ্টা কর। রবি তার শিল্পী-বাবাকে ভালবাসে কিন্তু তার শাসক বাবাকে একটুও শ্রদ্ধা করতে পারে না। রবি চরে খাওয়ারই চেষ্টা করেছে। বেছে নিয়েছে বেপরোয়া জীবন। খেলা হিসেবে নিয়েছে ক্যারাটেকে। জীবনচর্চাতেও প্রতি পদে পদে পেশীশক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছে। এক সময় পড়াশুনোয় আকর্ষণ হারিয়েছে। স্কুলের গণ্ডি পার হওয়ার উৎসাহ হারিয়েছে। রবির ষোলো-সতেরো বছর বয়সে পৃথিবীর আলো দেখেছে রবির ভাই। রবিকে বাবার কাছে শুনতে হয়েছে, দুনিয়ার ছেলেরা টুকে পাস করছে, তুই এমনই অপদার্থ যে টোকার ক্ষমতাটুকুও নেই। স্কুলের গণ্ডি পেরুতে না পারলে কোনও কাজই জুটবে না। তখন হয় ভিক্ষে করে খেতে হবে না হয় চুরি ডাকাতি করে।

রবির জীবনে একমাত্র প্রেরণা ছিলেন দাদি বালসারা। খুব উৎসাহ দিলেন।

বালসারা ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রীকে হারালেন। স্ত্রী ছিলেন দাদি বালসারার জীবনের অনেকটা জুড়ে। বালসারার ক্যারাটের প্রতি উৎসাহ, ছাত্রদের প্রতি উৎসাহ হঠাৎ কেমন যেন নিভে গেল। রবির জীবনের প্রেরণার আলোটুকুও নিভে গেল। নেমে এল অন্ধকার। বাবার অনিয়মিত আয়, আর্থিক অনটন, দীর্ঘদিনের বাকি পড়া ভাড়ার জন্য বাড়িওয়ালার বাড়ি-ছাড়ার নোটিস। সকালে ঘুম থেকে উঠে গঞ্জনা, দুপুরে বাড়ি ফিরে ভাইয়ের দেখাশুনো করা, স্নান করানো, খাওয়ানো; নিজে আধপেটা খাওয়া অথবা একেবারেই না খেয়ে থাকা, বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত বাউন্ডুলের মতো উদ্দেশ্যহীন ঘোরা, রাতে ফিরে আবার সেই অনটনের সংসারে গাল-মন্দ শোনা এটাই প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবি নিজের চোখে নিজেকে ছোট করে ফেলেছিল।

রবির সঙ্গে অনেক কথা হল, অনেক গল্প। ভূত প্রসঙ্গে 'অপরাধ'-এ প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটির কথাও এল। বুঝতে অসুবিধে হল না, সাক্ষাৎকারটি রবিকে জোর নাড়া দিয়েছে। ভূতের বাস্তব অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ চেপে বসেছে ওর মনে। ভূত ভর, আত্মা নিয়ে নানা প্রসঙ্গ টেনে আলোচনায় মেতে উঠলাম, ভূতে ভরের কিছু কিছু নেপথ্য কাহিনি শোনালাম। ওসব নিয়ে ওর মনে জেগে থাকা প্রশ্নগুলো একে একে বেরিয়ে এল। ওর যুক্তির কাছে যাতে গ্রহণযোগ্য মনে হয় সে কথা মাথায় রেখেই উত্তর দিলাম। এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, ২৬ এপ্রিলের পর কোন দিন ট্রেনে উঠেছ? রবি উত্তর দিল, না। ট্রেনকে এখন আমি এড়িয়ে চলি। মনে হয় ট্রেন চড়লে আমি বোধহয় চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

রবিকে বললাম, তুমি কি এই ঘটনার পর কখনও রেল লাইনের ধারে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছ।

—না। অসম্ভব। ও আমি কিছুতেই পারব না। ওই সময় লাইনে ট্রেন এসে পড়লে আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারব না। ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়বই। বলল, রবি।

বললাম, তোমার সঙ্গে যদি আমি থাকি এবং তোমার দু-হাত দূর দিয়ে একটা ট্রেন ঝড়ের গতিতে চলে যাওয়া সত্ত্বেও ভয় না পাও বা ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে না পড়, তাহলে তোমার ভয় কাটবে তো?

রবির চোখে উজ্জ্বলতা লক্ষ করলাম, আপনি পারবেন আমার সামনে দিয়ে চলন্ত ট্রেন পাস করিয়ে দিতে? যদি পারেন তবে নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে পাব, ভয় কেটে যাবে।

—ঠিক আছে, আগামী রবিবার সকাল ৯টার মধ্যে এখানে চলে এসো। তুমি আর আমি যাব এমন কোনও একটা স্পটে, যেখান দিয়ে তীব্র গতিতে ট্রেন চলাচল করে। দু-তিনটে ট্রেন তোমার সামনে দিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। আমরা অপেক্ষা করব ট্রেনের হাত দুয়েক দূরে। প্রতিবারই ট্রেন চলে যাওয়ার পর দেখতে পাবে তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই আছ, ঝাঁপিয়ে পড়োনি।

—আঙ্কল, আপনি যদি সত্যিই এমনি করতে পারেন তবে আশা করি আমার ভয়টা কেটে যাবে। আর ভাল হয় যদি আপনি আমাকে আনন্দ পালিত রোডের আত্মহত্যার স্পটে দাঁড় করিয়ে ট্রেন পাস করিয়ে দিতে পারেন। এমনটা পারলে আমি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাব, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাব।

বললাম, বেশ তাই হবে, তবে ওই কথাই রইল, তুমি আগামী রবিবার সকাল ৯টার মধ্যে এখানে চলে এসো।

কলকাতার বাইরে না থাকলে রবিবার সকাল থেকেই বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত, অপরিচিতদের ভিড় হয় আমার ফ্ল্যাটে। সেই রবিবারেও সকাল থেকে বন্ধুদের আসা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঘড়ির কাঁটা যখন সাড়ে ৯ টায় তখনও রবি এল না। ঠিক করলাম আমিই ওর বাড়ি যাব। ঠিকানা জানি, অতএব সমস্যা নেই।

আমার এখনই একবার বের হতে হবে। —এ কথা বলে আসরের ছন্দপতন ঘটালাম। দু-একজন কারণ জানতে চাওয়ায় সংক্ষেপে রবির ঘটনা জানালাম। বেশ কয়েকজন আমার সঙ্গী হতে চাইলেন, এঁদের মধ্যে একজন হলেন কারাটের ব্ল্যাক বেল্ট ললিত সাউ।

ললিত বলল, দাদা, আমি আপনার সঙ্গে যাই। রবি যাতে ঝাঁপিয়ে না পড়ে সে আমি দেখব। এমনভাবে ধরে রাখব যে ও লাফাবার সুযোগই পাবে না।

বললাম, ললিত, তোমার ধারণাই নেই এই ধরনের মানসিক রোগীরা কী অসম্ভব ধরনের শক্তি বিশেষ মুহূর্তে প্রয়োগ করতে পারে। এই ধরনের একজন মানসিক রোগগ্রস্ত দুর্বল শরীরের মহিলাও বিশেষ মানসিক অবস্থায় যেমন ভূতে পেয়েছে ভাবলে, এতই সবল হয়ে ওঠে যে পাঁচজন সবল পুরুষও তাকে শক্তি প্রয়োগে সামাল দিতে পারে না।

সবচেয়ে বড় কথা হল, এমনি করে ওকে ধরে-বেঁধে ট্রেনের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলে ওর মনের ভয় দূর হবে না।

তাছাড়া যেভাবে ওর মানসিক চিকিৎসা করতে চাই, তাতে বহুর উপস্থিতি মোটেই কাম্য নয়। এতে ও আপনাদের দিকে, আপনাদের কথার দিকেও আকর্ষিত হবে। ফলে আমার কথাগুলোকে ওর চিন্তায় গভীরভাবে ঢোকাতে ব্যর্থ হব। আর এই ব্যর্থতা মানেই ট্রেন আসবে, রবি আতঙ্কিত হবে, আত্মার আহ্বান শুনতে পাবে, ঝাঁপাবে এবং মরবে। পরিণতিটা আমার এবং সমিতির পক্ষেও ভাল হবে না।

শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলাম মধুসূদন রায় ও চিত্র-সাংবাদিক কুমার রায়কে।

রবি বাড়িতেই ছিল। বাবা সকালেই বেরিয়েছেন, রিহার্সাল দিতে। মা যোগমায়া দেবীকে পরিচয় দিতে ঘরে নিয়ে বসালেন। রবি চৌকিতে জবুথবু হয়ে বসেছিল।

যোগমায়া জানালেন, কাল সারা দিনরাত রবি শুধু কেঁদেছে। ওর মতো একটা

জোয়ান ছেলে বাচ্চাদের মতো কাঁদছে এ এক অস্বস্তিকর অবস্থা। আজ ওর যা শরীর ও মনের অবস্থা তাতে ওর পক্ষে একা আপনার বাড়ি যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ওর বাবার আজ রিহার্সালে যাওয়া একান্তই প্রয়োজন ছিল। যাওয়ার সময় বলে গেছেন, ফিরে এসে রবিকে নিয়ে আপনাদের বাড়ি যাবেন। সাড়ে আটটার সময় আমি রবিকে বললাম, চল আমি তোকে প্রবীরবাবুর বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। রবি কিছুতেই রাজি হল না। কাল থেকে রবি বারবার বলছে, আমি আর বাঁচব না, মরবই। এই কষ্ট সহ্য করার চেয়ে আত্মহত্যা করা অনেক ভাল।

ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রতিবেশী এলেন আমার আসার খবর পেয়ে। আমি আর সময় নষ্ট করতে রাজি ছিলাম না। রবির সঙ্গে দু-একটা কথা বলে বললাম, চল, আনন্দ পালিত রোড থেকে ঘুরে আসি।

রবিকে নিয়ে আমি, কুমার আর মধুদা (মধুসূদন রায়) এলাম আনন্দ পালিত রোডে। চার দিন আগে রবির মানসিক অবস্থা যেমন দেখেছিলাম, আজকের অবস্থা তার চেয়ে অনেক খারাপ বলে মনে হল।

এক সময় সেই ব্রিজের উপর উঠলাম, যে ব্রিজ থেকে রবি আত্মহত্যা করতে দেখেছিল। ব্রিজের একটু দূরে বাঁদিকের একটা জায়গা দেখিয়ে রবি বলল, ওইখানে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেনটা আসতেই লোকটাকে চঞ্চল হতে দেখেছিলাম। তারপর...।

তারপরের কথাগুলো না শুনে ব্রিজের দু-পাশে আনাজপাতি, শাকসব্জি নিয়ে বসা লোকগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বললাম, এখানে আনাজপাতির দাম কেমন?

রবি বলল, অ্যাঁ, কী?

আমি একটা দোকানির সামনে দাঁড়িয়ে পেঁপে আর থোড়-এর দাম করতে শুরু করলাম, কিনলাম পাকা কলা।

এক সময় আমরা কলা খেতে খেতে হাঁটতে শুরু করলাম। কথা বলছিলাম সেই সঙ্গে, এখানে জিনিসপত্তর তো খুব সস্তা। তোমরা আগে এখানে কোথায় থাকতে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

দূরে দৃশ্যমান একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, ওই বাড়িটার দুটো বাড়ির পরেই।

ব্রিজ পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে রেল-লাইনের ওপর এসে পড়লাম। আমি ওকে শোনাচ্ছিলাম আমার একটা কাহিনির ওপর ফিল্ম তোলার ইচ্ছের কথা। কাহিনিটার একটু একটু অংশ ওকে শোনাচ্ছিলাম।

লাইনের পাশ দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। আমি বলে চলেছিলাম আমার কাহিনির কথা। সেখানেও ফিল্মে রেল লাইন ও ট্রেনকে কীভাবে ব্যবহার করব, ট্রেনের চলার গতির সঙ্গে কী ধরনের আবহ সঙ্গীত প্রয়োগ করব বলে ভেবে রেখেছি, তাও শোনাতে লাগলাম।

রবি সিনেমা, শুটিং, আবহ সঙ্গীত এইসবের মধ্যেই বড় হয়ে উঠছে। এসবের

সঙ্গে ওর একটা গোপন ও গভীর সখ্য আছে। রবি শুনছিল, মতামত জানাচ্ছিল। আমি কথার মাঝেই হালকাভাবেই ছ-সাত বছর আগের আত্মহত্যার স্পটটা জানতে চাইলাম।

স্পটে এসে আমি ও রবি দাঁড়ালাম। মধুদা ও কুমার দাঁড়ালেন কিছুটা দূরে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি রেললাইনের হাত দেড়েক দূরে। এখান থেকে পাথরের টুকরোগুলো ঢিবির আকারে রেল লাইন পর্যন্ত উঠে গেছে।

ব্যস্ত লাইন। মিনিট তিনেকের মধ্যে আমাদের লাইনে গাড়ি আসতে দেখলাম। আমার কাহিনি ঘিরে সিনেমা তোলার গল্প কিন্তু চালুই ছিল। রবিকে ট্রেনটা দেখিয়ে বোঝাতে লাগলাম, ঠিক কীভাবে ক্যামেরা প্যান করার কথা ভেবেছি। নিজের একটা চোখ বন্ধ করে খোলা চোখের সামনে আমার একটা হাতকে দূরবিনের মতো করে দেখতে লাগলাম। রবিকেও দৃশ্যটি বোঝার স্বার্থে আমার মতো করে ট্রেনের দিকে দৃষ্টি দিতে বললাম। বলে চললাম, এবার লাইনের ওপর দিয়ে চাকাগুলো গড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা লক্ষ করো। এমন দৃশ্যই তুলব।

ট্রেন ইতিমধ্যে অনেকটাই এগিয়ে এসেছিল। রবিকে বললাম, লক্ষ করো, ট্রেনের চাকা যতই আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে ততই দেখতে পাচ্ছি ছন্দোবদ্ধভাবে লাইনগুলো মাটিতে বসে যাচ্ছে এবং উঠে আসছে। এই যে এখন চাকাগুলো আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। দেখ, প্রতিটি চাকা আমাদের কাছে যখনই আসছে তখনই লাইনটা মাটিতে চেপে বসছে। চাকাটা চলে যেতেই কেমন সুন্দর বুক ফুলিয়ে উঠে আসছে। লাইনের ওঠা-নামার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে কেমন সুন্দর ট্রেনের ও লাইনের আওয়াজ হচ্ছে। এর সঙ্গে একটু মজার এফেক্ট মিউজিক কম্পোজ করলে দৃশ্যটা দারুণ উতরোবে। ট্রেনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা সুর কণ্ঠ থেকে বের করছিলাম। ট্রেনটা যতক্ষণ না আমাদের অতিক্রম করে গেল ততক্ষণই আমি গলা থেকে আবহ সঙ্গীত বের করে গেলাম। ট্রেনটা আমাদের অতিক্রম করে যেতে রবিকে বললাম, রবি, ট্রেন কিন্তু আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেছে।

আমার কথায় রবির ঘোর কাটল। অদ্ভুত উচ্ছলতার সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, আঙ্কল, আমার কিছু হয়নি। ট্রেনে ঝাঁপাইনি। আমি ভাল হয়ে গেছি।

ডান হাতটা বাড়িয়ে আমার সঙ্গে দৃঢ় করমর্দন করল। মধুদা ও কুমার এগিয়ে এলেন। ঘটনার পরিণতিতে ওরাও খুশি। মধুদা রবিকে বললেন, কী হল, ভয় কেটেছে?

আমরা কাছের একটা গাছের তলায় বাঁধানো বেদির ওপর বসলাম। কিছুক্ষণ চারজন হালকা মেজাজে গল্প করলাম। এক সময় রবি বলল, আঙ্কল, আর একটা ট্রেন পাস করিয়ে দেবেন?

বুঝলাম, রবি তার আত্মবিশ্বাসকে আরও একটু বাড়িয়ে নিতে চায়। উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, বেশ তো চলো।

আমরা দু'জনে আবার লাইনের সামনে দাঁড়ালাম। এবারও হাঁটতে হাঁটতে সেই ফিল্মের কাহিনিতে রবিকে নিয়ে গিয়েছিলাম। লাইন দিয়ে চাকা গড়িয়ে যাওয়া, সেই সঙ্গে লাইনের ওঠা-নামা এবং ঘটাং ঘট্ ঘট্ একটানা শব্দ, এরই সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম আমার গলার সুরকে। এবার ট্রেন চলে গেল রবির কোনও বিপদ না ঘটিয়ে।

ট্রেন চলে যেতে রবি উল্লাসে লাফিয়ে উঠল, ওঃ, এবারও আমার কিছু হয়নি। অর্থাৎ আমার আর কিছু হবে না।

তারপর সে এক অন্য রবি। শিথিল ঠোঁট, ঝুলে পড়া চোয়াল ও ফ্যালফ্যালে দৃষ্টির রবি পাল্টে গেছে। হইচই তুলে আমাদের একটা চায়ের দোকানে নিয়ে গেল। ওই চা খাওয়াল। ট্যাক্সি ডাকতেই হাত নেড়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বিদায় করে বলল, বাসেই ফিরব।

রবিদের স্ট্যান্ডে বাস দাঁড়াতে রবি নেমে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে শুরু করল প্রবল শব্দে। বাস চলতে শুরু করতেই চলন্ত বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে পড়ে চেঁচাল আঙ্কল, মাঝে মধ্যে আপনার বাড়িতে গিয়ে একটু জ্বালিয়ে আসব।

বললাম, বেশ তো, যখন ইচ্ছে চলে এসো।

চলন্ত বাস থেকে টুক করে নেমে পড়ে রবি জানিয়ে দিয়ে গেল ও সম্পূর্ণ সুস্থ।

২১ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রবি আবার এল। বসার ঘরে তখন মেলা ভিড়। পাক্কা তিন ঘণ্টা সকলকে নানা ধরনের ক্যারাটে আর আইকিদো দেখিয়ে জমিয়ে রেখে বিদায় নিল। যাওয়ার আগে দুটো কথা জানিয়ে গেল, এক, আগামী ব্ল্যাক বেল্টের পরীক্ষায় রবি নামছে, প্র্যাকটিসও শুরু করেছে। দুই, ৬ জুলাই তারিখেই কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটাল-এ মনোরোগ বিভাগে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন আছ?

—কেমন দেখছেন?

—ভালই তো দেখছি।

—সত্যিই ভাল আছি, একদম ভাল।

—দিনে দিনে তো তোমার অবস্থার অবনতিই হচ্ছিল হঠাৎ এমন আশ্চর্যজনক পরিবর্তন?

আমার সঙ্গে যোগাযোগ এবং আমার মানসিক চিকিৎসা পদ্ধতির পুরোটাই ডাক্তারবাবুকে জানিয়েছে রবি।

প্রেসক্রিপশনে ডাক্তারবাবু লিখেছেন stop medicine।

ইতিমধ্যে রবির কাজের একটা সুরাহা হয়েছে। রবি মাঝেমধ্যে আমার কাছে আসে। আমার সঙ্গে, আমার স্ত্রী সীমা ও আমার ছেলে পিনাকীর সঙ্গে গল্প করে। লক্ষ করেছি, রবি আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। বিশ্বাস করে ও আর অপদার্থ নয়। সমাজে ওরও কিছু দেওয়ার আছে। ও কারও বোঝা নয়, বরং সংসারকে সাহায্য করবে।

রবির মুখ থেকে যেদিন ওর ব্ল্যাক-বেল্ট পাওয়ার খবরটা পেলাম সেদিন সম্ভবত রবির চেয়ে কম আনন্দ আমি পাইনি।

মনোরোগ তৈরির ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, হিংসাত্মক ঘটনাবলি, বেকারত্বে ও দারিদ্র্যের বিভীষিকা, জীবন নির্বাহে প্রতিনিয়ত ব্যয় বৃদ্ধি, ধর্ম-বর্ণ বা রাজনৈতিক অত্যাচার, ভয়, শোষণ, প্রতিবাদহীনতাকে, অন্যায়কে মেনে নিতে বাধ্য হওয়া এসব থেকেও আসে মনের রোগ। আমরা মনোরোগীর আশ-পাশের সুস্থ মানুষরা রোগীদের প্রতি মানবিক হয়ে তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার মতো পরিবেশ সৃষ্টিতে কিছুটা সাহায্য করতে পারি কি না—নিশ্চয়ই দেখতে পারি। আমরা মানবিক হবার শিক্ষা দিতে পারি ঘরে, শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, খেলার মাঠে জীবনের চলাফেরা প্রতিটি ক্ষেত্রে, 'মূল্যবোধ' 'শিক্ষার সার্থকতা' মানবিকতার বিকাশে প্রাচীন সংস্কৃতির গালভরা দৃষ্টান্ত টেনে নয়।

চিকিৎসার কথা এলেই চিকিৎসকের কথাও এসে যায়, এসে যায় তাঁদের অনেকেরই পেশাগত অসাধুতার কথা। এরা অনেকেই মানসিক রোগীদের সঙ্গে বক্‌বক্ করে অর্থ প্রসবকারী সময় নষ্ট করতে অনিচ্ছুক। অথচ মানসিক রোগীদের কথাই বিস্তৃতভাবে না শুনেই বিধান দেওয়া অসম্ভব। বিধান ঠিক কি ভুল, বিধানে রোগীর ক্ষতি হবে কি অক্ষতি, সে প্রশ্ন অর্থলোলুপ চিকিৎসকদের কাছে একান্তই গৌণ।

এ বিষয়ে আমার-আপনার সচেতনতা, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধই পারে অর্থলোভী চিকিৎসকদের কাজে মনোযোগী হতে বাধ্য করতে।

ক্যারাটে Vs. বক্সিং

একদিন রবি এল। আমার বক্সিং স্কিলটা ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য ওকে চ্যালেঞ্জ করলাম। আসিহারা কাইকান ফুল-কন্ট্রাক্ট ক্যারাটের ব্ল্যাক বেল্ট প্রাপ্ত একজনকে প্রবীর ঘোষ যে সবার সামনে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে, তাতে রবির পাশাপাশি সমিতির অনেকেই অবাক হয়েছিল। সবাই খুবই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী স্টাইলের 'মুক্কা-লাথ' দেখবে বলে। না, সেদিন রবি পাওয়ার আর ক্ষিপ্রতা দিয়েও আমাকে একবারের জন্যও স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি, আমি প্রত্যেক বারই ডজ করে বেরিয়ে গেছি। আমি শুধু রবি-কে কয়েকবার শ্যাডোর মত ছুঁয়েছিলাম মাত্র। মহম্মদ আলির বিখ্যাত কথা, 'Float like a butterfly'-এর 'butterfly'-এর মতো শুধু ওর অ্যাটাকের থেকে দূরে থেকেছি, 'Sting like a bee'-এর মতো 'Sting' কিন্তু করিনি।

পরবর্তীকালে, এই রবিই অনেক অ্যাকশনে আমাদের সঙ্গে সহযোদ্ধা হয়েছিল।

অধ্যায় : পনেরো

একাধিক চ্যালেঞ্জ

প্রায় হাজার দেড়েক গুরুজি-বাবাজি-মাতাজি-ওঝা-গুণিন-তান্ত্রিক-জ্যোতিষী অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের ভান্ডাফোড় করেছি। সেই তালিকায় দেশ বিখ্যাত, বিশ্ববিখ্যাত অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার যেমন আছে তেমনই স্থানীয় স্তরের অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারও আছে। এসমস্তই ছড়িয়ে আছে আমার লেখা গোটা যাটেক বই-এ এবং সেই সময়ের সংবাদপত্রগুলিতে।

যেমন—

মেঠাইবাবার রহস্যভেদ

১৯৯২ সাল। 'মেঠাইবাবা'কে নিয়ে ভারত জুড়ে আলোড়ন। আসল নাম ভানুদাস গাইকোয়াড়। পেশায় কৃষক। থাকেন পুণে জেলার বারামতিতে। সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানীদের চোখে হয়ে উঠেছেন বিরাট বিস্ময়। তিনি যা ছুঁচ্ছেন তাই মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে। নামী বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু এই 'মিষ্টি হওয়ার রহস্য' উন্মোচন করতে পারেননি কেউই। সাংবাদিকরা সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এই সাংবাদিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসকরা 'মিঠেবাবা'র হাত ধুয়ে দিয়েছেন সাবান এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দিয়ে। কিন্তু প্রত্যেকেই ডাহা ফেল। মেঠাইবাবার হাত ধোওয়ার পরেও যে-কে-সেই মিষ্টি। অতিঝাল কাঁচালঙ্কাও মুহূর্তে গুড়। ভানুদাসের স্পর্শে স্টিলের কলম মিষ্টি, জল মিষ্টি।

এহেন অবস্থায় প্রচুর চিঠি পেলাম রহস্যভেদের জন্য।

'আজকাল' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে ২১ জুন রওনা হলাম হাওড়া থেকে। পরদিন রাত পৌনে দশটায় পৌঁছলাম মুম্বাই ভিটি-তে। যুক্তিবাদী সমিতির বিধান নিয়োগী তাঁর ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন। বিধান পেশায় স্বর্ণশিল্পী। খুব চটপটে ছেলে। অনেক বছর ধরে মুম্বাইতে থাকে। এখানকার সমস্ত জায়গা প্রায় সবই চেনে। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে দাদার থেকে পুণে রওনা দিলাম বাসে। পৌঁছলাম বিকেলে। বারামতি যাওয়ার বাস সন্ধ্যা ছ'টাতে। হাতে থাকা প্রায় দু'ঘণ্টা সময় কাটালাম অটোরিকশায় শহর ঘুরে।

সন্ধ্যা ছ'টার বাসে বারামতি যাচ্ছি। বাসেই ভানুদাস সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু করলাম। একজন সহযাত্রী বসন্ত তুলপুলে জানালেন, তাঁর বাড়ির কাছাকাছি থাকেন 'গোড়বাবা' অর্থাৎ গুড়বাবা ভানুদাস।

বারামতি নেমে অটোরিকশাতে আমি, বিধান এবং তুলপুলে চললাম। ভানুদাস সম্পর্কে গল্প চলছিল। অটোরিকশা থামল তুলপুলের বাড়ির কাছে। তিনি শরদ গাইকোয়াড় নামে স্থানীয় একটি ছেলেকে ভানুদাসের বাড়ি দেখিয়ে দিতে বললেন। আবার অটোরিকশা চলল ভানুদাসের উদ্দেশে। শরদ কলেজে পড়েন। আমাদের পরিচয়—কলকাতার সাংবাদিক। আলোচনায় অংশ নিল অটোচালক বালুও। জানলাম ও বুঝলাম, ভানুদাস সম্পর্কে অনেকেরই সন্দেহ আছে। একদিকে এলাকার গর্ব, প্রচুর নাম হয়েছে ভানুদাসের। এলাকায় চুরি, ছিনতাই কমেছে। অবস্থা পাল্টেছে অঞ্চলটির। কিন্তু সন্দেহ রয়েছে ভানুদাসের 'মিঠেবাবাত্ব' নিয়ে। নিশ্চয়ই এর পিছনে গভীর কোনো ধান্দা আছে—মনে করেন অনেকেই। ভানুদাসের অতীতও খুব পরিচ্ছন্ন নয় জানলাম।

রাত প্রায় ন'টায় পৌঁছলাম ভানুদাসের খেতের সামনে। পাথুরে রাস্তায় অটোরিকশা দাঁড়াল। চষে ফেলা খেতের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছি ভানুদাসের বাড়ির উদ্দেশে। চারদিক অন্ধকার। হাঁক পাড়া দূরে ভানুদাসের বাড়িতে বিদ্যুতের আলো জ্বলছে। বাড়ির উঠোনে ছায়া ছায়া মানুষগুলো নড়ছে চড়ছে। শরদ ছেলেটার হাঁক-এ উঠোনের ছায়া মানুষগুলো ঘরে অদৃশ্য হল। আবার, ঘর থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন।

উঠোনে পৌঁছলাম। ভানুদাসের সঙ্গে আমার পরিচয় করালেন শরদ।

সদ্য পাটভাঙা দুধ-সাদা টেরিনের প্যান্ট ও ধবধবে সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি পরিহিত ভানুদাসের সুঠাম চেহারা। ঘনকালো তেল চিকণ চুল। খুদে খুদে চোখদুটোয় তীক্ষ্ণতা ও সতর্কতা। বুঝলাম, ভানুদাস 'ভোলা-ভালা আনপড়' কৃষক নন।

আমি সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে টেপ রেকর্ডার চালু করলাম। প্রশ্নোত্তর চলল। খানিকবাদে ভানুদাস মারাঠীতে জবাব দেবে বললেন। বিধান বাংলাভাষার মতোই মারাঠী জানেন। বিধানের কাছে আগেই প্রশ্ন তালিকা দিয়ে রেখেছিলাম। এবার মারাঠী ভাষায় প্রশ্নোত্তর চলল।

ভানুদাসের বয়স একত্রিশ। গত দশ বছর হল যা ছুঁচ্ছেন তাই-ই মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে। তাঁর দাবি এটা অলৌকিক ক্ষমতা।

সাক্ষাৎকার চলতে চলতেই জল, লঙ্কা ইত্যাদি ছুঁয়ে আমাদের পরীক্ষা করতে দিল। চেটে, কামড়ে দেখলাম মিষ্টি হচ্ছে। তবে লঙ্কার ভিতরটা ঝাল থাকছে কিন্তু বাইরেটা মিষ্টি।

শুনেছিলাম তাঁর সারা শরীরই নাকি মিষ্টি। আ', দেখলাম, শুধু কনুই পর্যন্ত মিষ্টি হচ্ছে। হাত ধোওয়ালাম নিম সাবান দিয়ে। কনুই এ আঙুল ঠেকাতে দিলাম

না। এবার কিছু ছুঁলেই মিষ্টি হচ্ছে না দেখলাম। দেখল উপস্থিত জনা পনেরো স্থানীয় মানুষও।

এই মিষ্টি হওয়া এবং না হওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব চলল। বারবার ওর হাত ভাল করে ধুইয়ে কনুই-এ আঙুল ঠেকাতে নিষেধ করেছিলাম। তাতেই ওর মিষ্টি করার ক্ষমতা হারাচ্ছিল। আর 'নার্ভাস ফিল' করছিল। প্রকাশ হচ্ছিল ওর ক্ষমতার অসাড়ত্ব। এ সমস্তই রেকর্ড হচ্ছিল।

তখনই প্রচ্ছন্ন হুমকি ও গালাগাল খেলাম আমরা। কয়েক মিনিট পর বাইকে করে দু'জন এলেন। পরিচয় দিলেন পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবে। ডাক্তার আটাডে কে বি এবং ডাক্তার সোনে জাক্‌তা। দু'জনেরই বারামতিতে চেম্বার আছে। অ্যালোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসক।

তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলোচনা চলল। ভানুদাস আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন ওদের কাছে। ওঁরা আমার কার্ড দেখতে চাইলেন। কার্ড দেখে আমাকে চিনতে পারলেন। এবার টেপ রেকর্ডার বন্ধের হুমকি এল।

আমি ভানুদাসের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করলাম। বললাম, ভানুদাসের হাত ঠিক মতো ধুইয়ে দিলে উনি স্পর্শে কোনও কিছুকেই মিষ্টি করতে পারবেন না। অনেক রাসায়নিক পদার্থ আছে যা চিনির থেকে, কয়েকশো গুণ মিষ্টি। 'সিটেক্স' লিকুইড নিয়ে কাঁধে, ঘাড়ে এরকম কয়েক জায়গায় যদি লাগিয়ে রাখে তাহলে তো খেলাটা দেখানো খুব সোজা হয়ে যাবে। যতই ভাল করে হাত ধুইয়ে দিক, ঘাড়ে বা কনুইয়ে ছুঁয়ে নিলে আবার মিষ্টি হতে থাকবে। এর মধ্যে চিটিংবাজি থাকতে পারে, অলৌকিকত্ব নেই।—এ সমস্ত শুনে ডাক্তার দু'জন এবং ভানুদাস ও তার শাগরেদ আমাদের আটকে রাখতে চাইল। বলল, যতক্ষণ না ভানুদাসের 'স্পর্শে মিষ্টি করার' অলৌকিক ক্ষমতাকে স্বীকার করছি ততক্ষণ আমাদের ছাড়া হবে না।

বললাম, আমরা এখানে এসেছি স্থানীয় পত্রিকা দপ্তরে এবং স্থানীয় থানায় জানিয়ে। নির্দিষ্ট সময়ে থানায় না পৌঁছলে, তারাই এখানে এসে আমাদের উদ্ধার করবে।

অগত্যা আমাদেরকে ছেড়ে দিল, কিন্তু আমরা যে হোটেলে উঠেছি সেখান থেকে আমাদের তুলে আনার হুমকি দিলেন ডাক্তার দু'জন।

আমরা ফিরলাম হোটেলে। পরদিন ভোরে থানায় অভিযোগ জানালাম। ফিরলাম বাড়ি।

'মেঠোবাবা'র রহস্য ফাঁস করে পত্রিকাতে খবর বেরোল। সেখানে কৌশলগুলো বিস্তারিত লেখা ছিল। এর কয়েকদিন পরেই পত্রিকার খবরে জানলাম, 'অন্ধবিশ্বাস নির্মূলন সমিতি' নাকি পাঁচ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ করে ভানুদাসের কাছে হেরে

গেছে। এই সমিতির নেতা ছিলেন অভিনেতা শ্রীরাম লণ্ড এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁরই শিষ্য নরেন্দ্র দাভোলকর নেতা হন পরে।

তখন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার কলকাতার এডিটর অভিজিৎ দাশগুপ্ত এবং মুম্বাই থেকে অদিতি রায়ঘটক ফোনে আমাকে জানালেন, গোড়বাবার (ভানুদাসের) চ্যালেঞ্জ নিতে আমি রাজি আছি কিনা। থাকলে লিখে জানাতে বললেন। জানালাম, মুম্বাই বা দিল্লিতে 'প্রেস কনফারেন্স' ডেকে সাংবাদিকদের সামনে গোড়বাবার মুখোমুখি হতে চাই। হারলে দেব দেড়লক্ষ টাকা। চ্যালেঞ্জের খবরটি প্রকাশিত হল টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়াতে। বড় করে বেরোল।

তারপর কোথায় কী! সবই হাওয়া। ভানুদাস এই চ্যালেঞ্জ না নিয়ে পালানোকেই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন।

নাহ্, আজ পর্যন্ত সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস দেখাননি ভানুদাস গাইকোয়াড়।

বিষাক্ত চ্যালেঞ্জ

আর একটি ঘটনা। এটা আগে লিখিনি। তবে সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল।

১৪ ডিসেম্বর, ১৯১৯। একটি দৈনিক পত্রিকায় খবর বেরল, সাপে-কামড়ানো ও অন্য যে কোনও বিষে আক্রান্তকে চিকিৎসা করে সুস্থ করতে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন এক চিকিৎসক। নাম অসীমকুমার প্রধান। থাকেন কলকাতার কাছে হরিদেবপুরে। পেশায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

আবিষ্কৃত ওষুধটির নাম 'অ্যান্টি-টক্সিন নাগরাজ অ্যাসপেরা'। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ওষুধটির পেটেন্ট দিয়েছেন অসীমবাবুকে। পেটেন্ট নম্বর ১৮১৪৬৯ (৬০৩/ক্যাল/৯৬)। এই ওষুধটি বাণিজ্যিকভাবে তৈরি ও বিক্রির জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকে আবেদনও জানিয়েছেন। ১৯৯৬-র ৩ এপ্রিল পেটেন্ট পান ও ১৯৯৮-এর ১০ জুন সরকারি গেজেটে বিষয়টি প্রকাশিত হয়।

অসীমবাবুর দাবি, তিনি ১০০০ জন সাপে কামড়ানো রোগী-সহ বিভিন্ন বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত রুগিদের ওদের আবিষ্কৃত ওষুধটি প্রয়োগ করেছেন। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ থেকে ৯৫ শতাংশ রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে। জীবনদায়ী ওষুধটি বাণিজ্যিকভাবে তৈরি ও বিক্রির জন্য বিলম্ব হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন অসীমকুমার প্রধান।

সে সময়ে অরুণদার বাড়িতে আমাদের স্টাডি ক্লাস হয়। এখানেই একটি ছেলে এল একটা প্রস্তাব নিয়ে। সন্দীপ মুখার্জি। হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি। সে আমাকে বলল অসীমকুমার প্রধানের বিষয়টি। আরও বলল অসীমকুমার প্রধান আমাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে এবং আমি যেন হেরে যাই। অসীমবাবু দুটো মুরগি আনবেন এবং সে দুটোকে ওনার আনা সাপ দিয়ে কামড় খাওয়ানো হবে। বুঝলাম সাপটির বিষদাঁত ভাঙা থাকবে। এরপর অসীমবাবু ওনার

'নাগরাজ অ্যাসপেরা' প্রয়োগ করবেন এবং মুরগি দুটো বেঁচে থাকবে। এতে প্রমাণ হবে 'নাগরাজ অ্যাসপেরা' বিষের প্রতিষেধক হিসেবে কার্যকর ও অব্যর্থ। ফলে বাণিজ্যিক হিসেবে তৈরি ও বিক্রি করা যাবে। এতে এককোটি টাকা পাবে অসীমকুমার প্রধান। তার থেকে ৪০ শতাংশ মানে ৪০ লক্ষ টাকা দেবে আমাকে।

অর্থাৎ, ৪০ লক্ষ টাকা নিয়ে মিথ্যে চ্যালেঞ্জ পরীক্ষায় আমাকে হেরে যেতে হবে প্রতারক অসীমকুমার প্রধানের কাছে। বুঝলাম, ওনার ওষুধ নিয়ে দাবি ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদটি আসলে একটি 'বিষাক্ত ধাপ্পা'। মানুষ মারার কল করে লুটেপুটে খেতে চাইছেন অসীম হোমিও কুমার প্রধান। লোভের টোপ দিয়ে কিনেছে আমাদেরই শাখা সংগঠন হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারিকে।

আমি চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি হলাম। চ্যালেঞ্জ-এর বিষয় ও শর্তাবলি লিখিত হল। সাক্ষীসাবুদ দিয়ে স্বাক্ষর করা হল। একটি কমিটি গঠন করলাম পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। এতে বিজ্ঞানী ডাঃ সরোজ ঘোষ, চিকিৎসক অমিয়কুমার হাতি, ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য, ডাঃ প্রবীর বিজয় কর, আইনজীবী গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি—এই ছয়জন রইলাম। আর, ঠিক হল কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সামনে এই চ্যালেঞ্জ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

এরপরই আমার ওপর চাপ তৈরি শুরু হল, যাতে আমি হেরে যাই। ওই সন্দীপ মুখার্জি-সহ আরও কিছু পরিচিত ব্যক্তি এবং একটি পত্রিকার তরফে আমাকে ক্রমাগত বলা হচ্ছিল হেরে যাবার জন্য এবং অসীম হোমিওর কাছে হেরে যাওয়ার ঘুষ বাবদ ৪০ লক্ষ টাকা নেওয়ার টোপ দেওয়া হচ্ছিল লাগাতারভাবে। চালসৃষ্টিকারীরা নানান ফন্দিফিকির করছিল।

চ্যালেঞ্জের দিন দুটো তাজা মুরগি ও দুটো ছাগল আনালাম। এই চারটের ওপরই সাপের বিষ বা অন্য বিষ প্রয়োগ করা হবে। তারপর অসীমকুমার প্রধান ওর 'নাগরাজ অ্যাসপেরা' প্রয়োগ করবেন। যদি প্রাণী চারটি বাঁচে, তবে প্রমাণ হবে হোমিও ওষুধটি অব্যর্থ এবং কার্যকর।

ওই প্রাণী চারটিকে পাহারার দায়িত্ব আর কাউকেই দিইনি। কারণ, পাহারায় থাকা অন্য কারও চোখের সামনে দিয়ে সুন্দরী মেয়ে গেলেই পাহারাদারদের চোখ প্রাণী চারটি থেকে ঘুরে সুন্দরীতে চলে যাবেই। আর এই পলক ফেলা মুহূর্তে শত্রুপক্ষের যে কেউ তড়িৎ গতিতে 'এন্টিভেনাম' পুশ করে দিতে পারে প্রাণী চারটির ওপর। ফল, আসল বিষ ঢাললেও প্রাণী চারটি বেঁচে থাকবে এবং আমি হারব। কিন্তু আমি তো হারতে চাই না প্রতারকদের কাছে। তাই জ্যোতিদাকেই পাহারাদার হিসেবে রাখলাম। জ্যোতিদা একদৃষ্টে ভীষণ সতর্ক হয়ে প্রাণী চারটিকে রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। শত্রুপক্ষের কাউকেই প্রাণী চারটির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিলেন না।

এর সঙ্গে লড়তে হচ্ছিল নেপথ্যের আরও প্যাঁচ পয়জার। শত্রুবাহিনীর পক্ষ

থেকে নেপথ্যের চাপসৃষ্টি ও প্যাঁচ পয়জারকে প্রতিহত করতে হচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে। ওদের লক্ষ্য আমাকে হারানো।

৭ মার্চ, মঙ্গলবার ২০০০। বিকাল তিনটে। কলকাতা প্রেসক্লাবে ভিড় উপচে পড়ল। প্রায় সমস্ত সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকসহ রয়েছে আমাদের সমিতির কিছু সদস্য ও বিশিষ্ট কয়েকজন। রয়েছি আমরা ছয়জন। সময় এগোচ্ছে।

সাদার ওপর লাল স্ট্রাইপ ফুল শার্ট, গাঢ় রঙের ট্রাউজার, মেরুনের ওপর সোনালি কারুকার্যখচিত টাই পরিহিত এবং কপালে বেঢপ লাল সিঁদুরের মোটা তিলক শোভিত ছোটখাটো চেহারার অসীমকুমার প্রধান এলেন প্রেসক্লাবে। দেখেই বুঝলাম 'নার্ভাস ফিল' করছে বেচারা। একটু ছটফট করছে। একসময়ে ভয়ে ভয়ে আমাকেই বলে বসলেন, যদি না পারি প্রমাণ করতে, তাহলে কী হবে প্রবীরবাবু?

আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। দু'চারবার উনি এরকমই করলেন। আমিও সারাক্ষণই ওনাকে মৌখিক অভয় দিয়ে যাচ্ছি। ওঁর অবস্থা তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'।

যাক, আমার মৌখিক অভয়দানে মাঝে-মাঝে উনি চাঙ্গা হচ্ছিলেন।

বিকেল তিনটে দশ। শুরু হল 'বিষাক্ত চ্যালেঞ্জ'। প্রথমে দুটি মুরগিকে খাওয়ানো হল 'থিওকিল' নামক কীটনাশক। এর মিনিটখানেক বাদে একটি মুরগিকে 'নাগরাজ অ্যাসপেরা' দিলেন অসীমকুমার প্রধান। ৪ মাত্রার ওষুধ খাওয়ালেন তিনি।

'নাগরাজ অ্যাসপেরা' না-খাওয়ানো মুরগিটি 'থিওকিল'-এর বিষক্রিয়ায় মারা গেল। আর 'নাগরাজ অ্যাসপেরা' খাওয়ানো মুরগিটি বেঁচে থাকল। কিন্তু বেঁচে থাকা মুরগিটি 'থিওকিল'-এর বিষক্রিয়ায় দু-একদিনের মধ্যে যে মরবে না এমন গ্যারান্টি অসীমকুমার প্রধান দিতে পারলেন না।

আর, পরীক্ষা কমিটির চিকিৎসকরা এবং ডাঃ সরোজ ঘোষ বললেন, 'থিওকিল' খাওয়ালেই মুরগি মরবে এমন নয়। কারণ, থিওকিল খেয়ে মুরগি পাঁচ-ছ ঘন্টাও বেঁচে থাকে, তারপর মরে।

ফলে চ্যালেঞ্জের দু'পক্ষই সন্তুষ্ট হল না।

তাই, দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে। ঠিক হল ছাগল দুটোকে গোখরোর বিষ দেওয়া হবে। এজন্য বাদু সর্পোদ্যান থেকে দুটি প্রমাণ সাইজের বিষধর গোখরো আনিয়েছিলাম। সাপুড়ে পাঁচু তরফদার এবং সাপুড়ে দীপক মিত্রর ভাই ছিলেন। দীপক মিত্রের ভাইয়ের একটি সর্পোদ্যান ছিল।

ছাগল দুটোকে টেবিলে তোলা হল। সবার সামনে গোখরোর মুখ টিপে বিষ বার করলেন পাঁচুবাবু। রাখা হল কাচের পাত্রে। সকলের সামনে সিরিঞ্জ দিয়ে সেই বিষ অসীমকুমার প্রধানের কথামতো ডাঃ অমিয়কুমার হাতি 'পুশ' করে দিলেন

দুটি ছাগলের দেহে। প্রতিটি ছাগলের দেহে ঢুকল ৩০ মিলিগ্রাম করে গোখরোর তাজা বিষ।

এদিকে, 'নাগরাজ অ্যাসপেরা' পূর্ণ সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে প্রস্তুত অসীমবাবু। গীতানাথদা ওনাকে তখনই ওই প্রতিষেধকটি (!) দিতে না করলেন। বললেন, সাপে কামড়ালে অন্তত আধঘণ্টা সময় লাগে হাসপাতালে নিতে। এই সময়টুকু দিতে বললেন অসীমবাবুকে।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান হলভর্তি মানুষ। কী হয় কী হয়! ছাগলদুটো নিস্তেজ হচ্ছে একটু একটু করে। তখনই ঠিক হল একটি ছাগলকে মরতে দেওয়া হবে। অপর ছাগলটিকে 'নাগরাজ অ্যাসপেরা' নামক প্রতিষেধক (!) দেওয়া হবে। অসীমবাবু রাজি হলেন।

মিনিট বারো-তেরো কাটল। ছাগলদুটো মুমূর্ষু হয়ে পড়ল। অসীমবাবু আর দেরি না করে 'নাগরাজ অ্যাসপেরা' পুশ করলেন একটি ছাগলকে। এরপর ছাগলটির মুখেও কিছু 'নাগরাজ' ঢেলে দিলেন তিনি।

নাহ, একটি ছাগলও বাঁচল না। দুটোই মরল। আর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও 'নাগরাজ' অ্যাসপেরা' নামক বিষ প্রতিষেধকের আবিষ্কর্তা পেটেন্টধারী অসীমকুমার প্রধানও হারলেন।

তাহলে সাপে কাটা রুগির ৯০ শতাংশকে যে অসীম হোমিও চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন, তার কী হবে?

ডাঃ সরোজ ঘোষ জানালেন, প্রায় ৮০ শতাংশ সাপেরই কোনও বিষ থাকে না। ফলে, অসীমকুমার প্রধানের দাবি মতো যারা বেঁচেছিল তাদের বিষাক্ত সাপে কামড়ায়নি। আর ওর আবিষ্কৃত ওষুধটি ভাঁওতাবাজি। প্রশ্ন উঠল কী করে ওষুধহীন বস্তু ওষুধের পেটেন্ট পায়?

গীতানাথদা-সহ সবাই ওনাকে ধিক্কার দিলেন। গীতানাথদা ও ডাঃ সরোজ ঘোষ বললেন, এ-তো মানুষ খুনের চক্রান্ত করেছে অসীমবাবু।

আমরা ছয় জন দাবি জানালাম—অবিলম্বে এই প্রতিষেধক নামক ভাঁওতাবাজি ও মানুষ খুনের চক্রান্ত বন্ধ করা হোক।

এই চ্যালেঞ্জের খবর সারা ভারতেই হইহই কাণ্ড বাধিয়েছিল।

পরদিন বাংলা ও ইংরাজি দৈনিক পত্রিকাগুলোতেও খবরটি বিস্তারিত ছবি-সহ প্রকাশিত হল।

১৯৮২-র পর বিভিন্ন পত্রিকায় এবং পরিবর্তন পত্রিকায় এসব কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যায় : ষোলো

বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ১৯৬৭ পর্যন্ত

ভারত-পাকিস্তানের বিভাজনের সময়ে উদ্বাস্তু প্রবাহ আসল ওপার বাংলা থেকে এপারে। পশ্চিমবাংলার মূলত পূর্বসীমানার হাজার হাজার অঞ্চলে উদ্বাস্তুরা অস্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল। অবশ্য চাষের কাজও ভাল এগোল। সাফ হল বনজঙ্গল। গড়ে উঠল উদ্বাস্তু কলোনি। চাষের জমি। নতুন কিছু চাষ। বিশেষত পাট।

তৎপরবর্তীকালেও উদ্বাস্তু ওপার বাংলা থেকে এপারে আসছিলই। তবে সংখ্যাটা কম। '৭১-এর পর সংখ্যাটা আবার বাড়ল। এই উদ্বাস্তুদের ওপর ভর করেই কমিউনিস্ট পার্টি এগোচ্ছে।

সময়টা ১৯৬০-'৬২ সাল। তখন আমি কলেজে পড়ি। রাজনীতি করি না। কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল। বিধানচন্দ্র রায় তখন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি প্রচুর উদ্বাস্তু কলোনি তৈরি করলেন। উদ্বাস্তুদেরকে সাহায্য করলেন। গড়লেন প্রচুর কলকারখানা, উপনগরী। সল্টলেক, কল্যাণী, দুর্গাপুর ইত্যাদির রূপকার তিনি। তাঁর সময়েই পুরুলিয়া জেলাটি বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হয়।

আর একদিকে কমিউনিস্টরা কলকারখানায় ধর্মঘট, কারখানা বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে জঙ্গি রাজনীতি করছে। তারা উদ্বাস্তু তরুণদের সামনে রেখে বিভিন্ন কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন তৈরি করার কাজে হাত দিল। প্রথমে সিপিআই পরে সিপিএম। কারণ, এই ছাত্রনেতাদের মধ্যে সব হারানোর যে জ্বালা ছিল, যে উগ্রতা ছিল তা কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত পরিবারের ছাত্রদের মধ্যে আদৌ ছিল না।

সিপিআই ভেঙে সিপিএম হওয়াতে মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছিল প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বসুর আগমনে। সেটা অবশ্য ১৯৬৪ সালের ঘটনা।

এদিকে '৬২-র ১ জুলাই। বর্ষাকাল। বিকেলে খবর শুনলাম বিধানচন্দ্র রায় মারা গেছেন। চারদিক দেখে মনে হল একজন জননেতা মারা গেলেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি দলবাজি করতেন না। সিংহভাগ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিয়েছিলেন। গড়েছিলেন শিল্প। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, মিষ্টি স্বভাবের মানুষ

ছিলেন। যে কোনও মানুষ ওনার কাছে প্রয়োজনে যেতে পারত। তিনি ভাল ও নামী চিকিৎসক ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন প্রফুল্ল সেন। তিনি ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়ের আমলের খাদ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী থাকলেন ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত। এই সময়েই কংগ্রেসে ডামাডোল শুরু হয়।

১৯৬২ থেকেই সিপিআই দলে গন্ডগোল শুরু হল। সিপিএম-এর কিছু নেতা চিনকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করেন। আবার এই দলেরই কিছু নেতা জানান—আক্রমণকারী হল ভারত।

উত্তাল হতে শুরু করল বাংলার রাজনৈতিক জগৎ, সমাজ।

যদিও কমিউনিস্টদের ভাঙনের সূত্রপাত অনেক আগেই। সেই ১৯৬২ সালে।

১৯৬২'র ২০ অক্টোবর শুরু হল চিন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ। ওদিকে ১৯৫৯-এই একটা পটভূমি তৈরি হয়েছিল। তিব্বত তখন চিনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দলাই লামাকে উসকে দিয়ে চিনের ক্রোধ উৎপাদন করেছিল ভারত। চিনকে এমন দলাই-মলাই করল যে, শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত হল। '৫৯-এ দলাই পালিয়ে এলেন ভারতে। সঙ্গে আনলেন হাজার হাজার কোটি টাকার সোনা-মণি মুক্ত ইত্যাদি অলংকার যেগুলো ধর্মগুরু হিসেবে লুঠ করে জমিয়েছিলেন। নেহেরু দলাইকে রাজকীয় আশ্রয় দিলেন। আর দলাইয়ের কয়েক হাজার অনুগামীর জীবন-ধারণের সমস্ত খরচ-খরচা আমাদের ট্যাক্সের টাকায় দিতে লাগলেন নেহরু।

পরিণতিতে, গরম হল চিন-ভারত সম্পর্ক। পরে শুরু হল যুদ্ধ। নেহেরু তখন ভারতের এক ও একমাত্র জননেতা। রেডিওতে 'জাতীয়তাবোধ'-কে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তুলতে পিলপিল করে বুদ্ধিজীবীরা এক হল। রেডিওতেই শুনতে লাগলাম, কোনও ভিখারি ভিক্ষে করে কয়েক হাজার টাকা দান করেছে প্রতিরক্ষা তহবিলে। কোনও বউ বিয়ের দিনে সমস্ত গহনা, এমনকী হাতে আংটি, কানের দুলটি পর্যন্ত খুলে যুদ্ধাস্ত্র কেনার জন্য দিয়ে দিলেন নেহরুকে। কোনও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে যুদ্ধ তহবিলে দান করে দিল। যতই এই প্রচার বাড়ছে ততই রিকশাওয়ালা থেকে মেথর, চাষি থেকে শ্রমিকদের নাম উঠে আসছে। যেন, দানের অর্থেই যুদ্ধ জিতবেন নেহরু।

আর একদিকে নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, আসামের অধিবাসীরা অর্থ দান করে যাচ্ছে খেয়ে- না খেয়ে। সে কী আবেগের তুফান উঠছে। 'জাতীয়তাবোধ' জাগাতে ঝাম্পু ঝাম্পু গান চলছে। জাতীয়সঙ্গীত। টগবগ টগবগ করে রক্ত ফোটাতে সে কী গান! গায়ে যেন জ্বর চলে আসে।

তখন সিপিআইকে 'পঞ্চমবাহিনী' অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রচারের তুফান ছুটালেন নেহরু। আরএসপি, এসইউসিআই তখন সুযোগ বুঝে নেহরুর পোষা

বেড়াল হয়ে গেল। আর তাদের ছাত্র সংগঠনগুলো মিউমিউ করতে লাগল।

কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় পরিষদে চিনকে আক্রমণকারী বলল। নেহেরুকে সমর্থন করে আমজনতার কাছে ঘোষণা করল, নেহেরুকে সমর্থন করার জন্য। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতীয় সেনাদের সাহায্য করার কথা বলল উদাত্ত কণ্ঠে।

২১ নভেম্বর একতরফা ভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করল চিন। এর আগে প্রতিদিন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গম্ভীর কাঁপা গলায় রেডিওতে ঘোষণা করছেন ভারতীয় সেনাদের বীরত্বের সঙ্গে পশ্চাদপসরণের কাহিনি। ২১ নভেম্বর এই পশ্চাদপসরণ শেষ হল।

চিন ভারত যুদ্ধ চলছে। কলকাতার আকাশে চক্কর কাটছে যুদ্ধবিমান। মাঝে-মাঝেই সাইরেন বাজে রাতে। সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রদীপ হয়ে যায়। আমরা রেডিওতে কান পেতে শুনি ভারতীয় সেনাদের 'বীরত্বের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ-এর কাহিনি।

এরপরেই সিপিআই-এর গন্ডগোল চরম পর্যায়ে গেল। সিপিআই-এর একদল বলল ভারতই আক্রমণকারী। এই নিয়ে মত পার্থক্য। এটা কোনও মতাদর্শগত পার্থক্যের লড়াই নয়। দেশে সঠিক বিপ্লবের পথ খোঁজা নিয়ে মতপার্থক্য নয়। এটা ছিল ক্ষমতা দখলের লড়াই। রুশপন্থী কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় একচেটিয়াপনা ভাঙতে চিনের সমর্থন আদায়ের জন্য একটা কৌশল। যেহেতু রুশ-চিনের সম্পর্কটা তখন আদায়-কাঁচকলায়, তাই বড় খুঁটিতে নৌকো বাঁধার চেষ্টা।

১৯৬৪ সালের ১১ এপ্রিল সিপিআই দলের জাতীয় পরিষদ থেকে ৩২ জন সদস্য সিপিআই ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, মুজাফফর আহমেদ, হরেকৃষ্ণ কোঙার, হরকিষণ সিং সুরজিৎ, সরোজ মুখার্জি প্রমুখ।

এরা ১৯৬৪ এর ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত একটি পার্টি কংগ্রেসের আয়োজন করেন কলকাতায়। এই পার্টি কংগ্রেসের মধ্যে দিয়ে জন্ম নেয় সিপিআইএম। সিপিএম-এর সমর্থক ছিল প্রধানত পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুরা।

সর্বহারা এই উদ্বাস্তুদের কাছে টানতে তৎপর হয়েছিল সিপিএম। এবং সফলও হয়েছিল। উদ্বাস্তুরা সিপিএম-এর প্রচারে ধরে নিয়েছিলেন কংগ্রেসের জন্যেই দেশ ভাগ হয়েছে। তাদের বেশিরভাগই জানতে পারল না যে, কমিউনিস্ট পার্টিও দেশ বিভাগকে পুরোপুরি সমর্থন করেছিল। তারা স্বপ্ন দেখল ক্ষমতা দখল করেই সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ আনবে।

ওদিকে কংগ্রেস দল কেন্দ্রের ক্ষমতায়, ১৯৬৬ থেকে ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রীর গদিতে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে 'দ্য সিন্ডিকেট' কামরাজ ও অতুল্য ঘোষের

বিশাল প্রভাব। কামরাজ, অতুল্য ঘোষ চাইছেন, পার্টির নির্দেশ মেনে চলুক ইন্দিরা। ইন্দিরা চাইছেন, পার্টির সর্বময়ী কর্ত্রী হতে। ফলে ইন্দিরা অতুল্যতে টক্কর চলছে।

১৯৬৭-তে রাজ্যে কংগ্রেস ভেঙে বাংলা কংগ্রেস হল। সিপিএম প্রথম ক্ষমতার স্বাদ পেল। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে 'যুক্তফ্রন্ট' গদিতে বসল। অজয় মুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্টের বৃহত্তর দল সিপিএম নিল উপমুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রীর পদ। এই দুটি পদই নিলেন জ্যোতি বসু।

ইন্দিরার সহযোগিতায় ব্যবসায়ী শ্রেণি পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্টকে জেতাতে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করল।

১৯৬৭ থেকে জ্যোতি বসু অ্যান্ড কোম্পানি হয়ে উঠলেন ইন্দিরার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, স্রেফ সিন্ডিকেটপন্থী অতুল্য ঘোষের কংগ্রেসকে পশ্চিমবাংলায় হারাতে পারার জন্যে। ইন্দিরার ডাকে জ্যোতি বসু দিল্লি গেলেন। ইন্দিরা কমরেড বন্দিদের মুক্তি দেবেন বলে ঘোষণাও করলেন। কমরেড-বন্দি নেতারা মুক্তি পেলেন।

১৯৬৭-তে কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে ইন্দিরা দাঁড় করালেন ভি ভি গিরিকে। সিপিএম সহযোগিতার হাত বাড়াল। গিরি জিতলেন।

ইতিমধ্যেই সিপিএম-এ ভাঙন প্রক্রিয়া শুরু হল। চারু মজুমদার তাঁর প্রবন্ধ লিখলেন। সে সব ছড়াল কমরেডদের মধ্যে।

চারু মজুমদারের আটটি দলিল

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত চারু মজুমদার তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য আটটি প্রবন্ধে ব্যক্ত করলেন। পরবর্তীকালে আটটি প্রবন্ধ আটটি দলিল হিসেবে পরিচিত হয়। প্রথম দলিলেই চারু মজুমদার জানালেন ভারতীয় বিপ্লবের প্রধান স্তম্ভ কৃষি বিপ্লব।

প্রথম দলিল : 'বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য'। প্রকাশিত হয় ২৮ জানুয়ারি, ১৯৬৫।

এই দলিলে ভারতের সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষিত হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। দেখানো হয়েছে ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ সংকট ও তার গতিপ্রকৃতি। ফলস্বরূপ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের সম্প্রসারণ এবং তৃতীয় বিশ্বকে গ্রাস করার ইচ্ছা প্রকট হচ্ছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের ঘাঁটি গড়ার প্রক্রিয়া। ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেওয়ার জন্য নানা রকমের কৌশল গ্রহণ করাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক শিক্ষাটা হল ভারতের বিপ্লবের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে কৃষি বিপ্লব। কৃষি বিপ্লবকে সফল করতে হবে। কৃষকের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ, কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচি প্রচার করার উপর জোর দিতে হবে।

কীভাবে এই শিক্ষা দেওয়া হবে? প্রতিটি সভ্যকে অন্তত পাঁচজনের একটা সক্রিয় দল গঠন করতে হবে। অর্থাৎ Activist Group। নজর রাখতে হবে এর ভিতর পুলিশের চর যেন না থাকে। এই দলগুলো গোপন জায়গায় বৈঠক করবে। কাগজপত্র গোপন রাখতে হবে। এজন্য গোপন জায়গা ঠিক করে রাখতে হবে।

এই ছোট দলগুলোর সঙ্গে সমন্বয় গড়তে হবে। সমন্বয়কারী হবে একজন নির্দিষ্ট লোক।

এই সক্রিয় দলগুলোর সভ্য রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও পারদর্শী হয়ে উঠলেই তাঁকে পার্টির সদস্য করতে হবে। এই পার্টি সভ্যরা আর ওই সক্রিয় ছোট দলটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে না।

এই সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটা দৃঢ়ভাবে পালন করতে হবে, যাতে আগামী দিনে এই সংগঠন বিপ্লবী সংগঠনের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

মঙ্গোলিয়ায়, তিব্বতে, ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত আসামে, জাপানের ক্ষেত্রে, ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে, থাইল্যান্ডে চিন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন করেছিল। চারু মজুমদার চিনের এই আগ্রাসনের সমালোচনা না করে রাশিয়ার সমালোচনায় মেতে থাকলেন।

দ্বিতীয় দলিল : 'শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল কররে তুলুন'। এপ্রিল ১৯৬৫।

এই দলিলে শোধনবাদকে চিহ্নিত করা হয়েছে। শোধনবাদী চিন্তা-চর্চা কীভাবে হয় ও কীভাবে তা বর্জন করতে হবে তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শোধনবাদী চিন্তাই ভারতে বিপ্লবী পার্টি গঠনের অন্তরায়। আর এই চিন্তার বিরুদ্ধে নিরন্তর আপসহীন সংগ্রাম করতে হবে। গড়তে হবে বিপ্লবী পার্টি। এটাই প্রাথমিক কর্তব্য বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বললেন, কৃষক সভা ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং তাদের দাবিদাওয়া ভিত্তিক আন্দোলনই রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। এই কাজকে পার্টির একমাত্র কাজ মনে করলে, তা হবে পার্টিকে বিপথগামী করা। এভাবে সর্বহারা বিপ্লব সফল করা যায় না। বরং ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক সভা হল উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার মাত্র।

এই হাতিয়ার সহ অন্যান্য হাতিয়ারকে একযোগে চালিত করে মূল লক্ষ্যে

পৌঁছতে হবে। সেটা হল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল।

আবার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল মানেই কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষমতা দখল নয়। অর্থাৎ আন্দোলনের পরিধি বাড়িয়ে বিশাল আকারে নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষমতা দখল করাই একমাত্র লক্ষ্য নয়। এভাবে ক্ষমতা দখল করা পার্টির ভিতরকার বিপ্লবী চিন্তাকে নষ্ট করে এবং পার্টিকে সংস্কারবাদী দলে পরিণত করে।

বরং এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলই হবে সংগ্রামগুলোর নীতি ও কৌশল। এ বিষয়ে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ঘোষণা ও দেশীয় নাগা বিদ্রোহের উদাহরণ দেন তিনি।

১৯৪৬-'৪৭-এর তেভাগা আন্দোলনের বাস্তব ঘটনাগুলো তুলে ধরেন এবং তা বিশ্লেষণ করে শ্রেণি-সংগ্রাম, কৃষক সংগ্রামের রূপ ও স্তরকে বোঝান। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়।

তেভাগা সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভুল-বিচ্যুতি তুলে ধরেন ও তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় দেখান। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সঠিক সংজ্ঞা দেন। পার্টির গণ-সংগঠন গড়া ও তার মাধ্যমে পার্টি গঠন করার পদ্ধতি বলেন। পার্টি পরিচালনার পদ্ধতি এবং কর্মসূচি রূপায়ণের কৌশলগুলো ব্যাখ্যা দেন।

বলেন, গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে। যাতে নীতিগতভাবে, সংগঠনগতভাবে পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। নীতিহীন সমালোচনা নিষিদ্ধ করেন।

চারু মজুমদার মারা যাওয়ার পরেই নকশাল আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়। এর থেকেই প্রমাণিত হয় নকশাল আন্দোলন ছিল চারু মজুমদারকেন্দ্রিক।

চারু মজুমদারের নীতির বিরোধিতা করা মানে নিজের হত্যাকে আহ্বান করা।

চারু মজুমদার তাঁর দলিলগুলোতে 'মাও মাও' করলেও মাও-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে উনি এড়িয়ে গেছিলেন, সচেতন বা অচেতনভাবেই।

তৃতীয় দলিল : 'ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত বৈপ্লবিক উচ্ছ্বাসের উৎস কী'?

প্রকাশিত হল ৯ এপ্রিল, ১৯৬৫।

এই দলিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—পরবর্তী বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেন বিস্তারিতভাবে। দেখান, সমাজতান্ত্রিকতার অগ্রগমন। চিনের সাফল্য। এরসঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। তাদের বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরেন। তাদের পথ ভ্রান্ত পথ বলেন।

বরং চিনের পথ ভারতের বিপ্লবী পথ বলে ঘোষণা করেন। বৈপ্লবিক উচ্ছ্বাসের উৎস চিহ্নিত করে সেপথে সংগ্রাম চালিত করার কথা বলেন। দ্বিতীয় দলিলের

কর্মসূচিগুলো ও কৌশলগুলোকে প্রয়োগের কথা বলেন। আহ্বান জানান সশস্ত্র সংগ্রামের, মুক্ত কৃষক এলাকা গঠনের।

চারু মজুমদার বারবার ভারতকে চিন বানাতে চেয়েছেন কিন্তু চিনের সংস্কৃতিগত, ঐতিহাসিকগত ভিত্তি ভারতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। চিনের রাজনৈতিক, সমাজতান্ত্রিক গঠনকে ভারতে কী করে অনুসরণ করা যায়! তিনি মাও-এর নীতিকে নিজের মতো করে বুঝে নিয়েছিলেন।

চতুর্থ দলিল : 'আধুনিক শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান'। ১৯৬৫।

এই দলিলে আধুনিক শোধনবাদকে চিহ্নিত করলেন চারু মজুমদার। সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করলেন। ভারতকে সোভিয়েত রাশিয়ার আর্থিক সাহায্য দেওয়াটা রাশিয়ার শোধনবাদী একটা কাজ। বললেন, রাশিয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহায্য করছে।

পুঁজিবাদী এবং একচেটিয়া পুঁজির অবস্থা ও উদ্দেশ্য জানালেন ও বললেন, এই একচেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করছে যা রাশিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। অতএব রাশিয়াকে সমর্থন করা যাবে না।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে চিহ্নিত করে তার নিন্দা করলেন। পাল্টা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী- আন্দোলনের ভিত্তিতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে প্রতিহত করতে বললেন।

জানালেন, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়। বরং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে শাসকশ্রেণি লুণ্ঠন করতে চাইছে।

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে, এই রাশিয়ার শোধনবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং একচেটিয়া পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মার্কসবাদীদের ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তুলতে হবে, আন্দোলন গড়তে হবে। সোভিয়েত ও মার্কিন পুঁজিবাদী ও শোধনবাদের শয়তানি সমাবেশ ভাঙার ডাক দিলেন মার্কসবাদী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে।

কৃষক আন্দোলনের শ্রেণিবিচার প্রতিষ্ঠা করলেন। জমি স্বত্বের ভিত্তিতে কৃষকদের শ্রেণিবিচার না করে, উপার্জন ও জীবন-ধারণের মানের ভিত্তিতে শ্রেণিবিচার করলেন। জানালেন এটাই মার্কসবাদীদের করতে হবে। তাই ধনী, মধ্য, দরিদ্র, ভূমিহীন প্রধানত চারটি শ্রেণি আছে কৃষকদের। এরসঙ্গে গ্রাম্য কারিগর শ্রেণি রয়েছে। এজন্য তাদের বিপ্লবী চেতনার ফারাক রয়েছে। এজন্য তাদের

বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। এই আন্দোলন কতটা জঙ্গি রূপ পাবে তা নির্ভর করবে নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠার উপর।

আর, ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্ববৃহৎ শক্তি হল কৃষক শ্রেণি। তাই কৃষক শ্রেণির নেতৃত্বেই বিপ্লব সফল করতে হবে মার্কসবাদীদের।

খাদ্য আন্দোলনের পর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নিন্দা করে মাও সে তুং-এর উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। 'দমননীতির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ জনসাধারণের সংগ্রামী ঐক্যে ফাটল ধরায় এবং আত্মসমর্পণের পথে যায়।"

তাই দরকার কর্মী সংরক্ষণ। এজন্য উপযুক্ত শেল্টার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানুষকে সশস্ত্র আক্রমণের সামনে প্রতিরোধের কলা কৌশল শেখানো, সক্রিয় কর্মীদলের দ্বারা প্রতিটি আক্রমণের বদলা নেওয়ার চেষ্টা, মারের বদলা মারের সংগ্রাম করা—এসবই সক্রিয় প্রতিরোধ, যা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

প্রথমদিকে সফলতা আসবে কম বা আসবে না। একটা সাফল্য এলেই তা জনসাধারণের ভিতর ব্যাপক প্রচার করতে হবে। ফলে তারা উৎসাহ পাবে। ছড়াবে সংগ্রাম। এই সক্রিয় সংগ্রাম শহরে ও গ্রামে সবখানেতেই সম্ভব।

পার্টি সভ্যদের শোধনবাদী চিন্তামুক্ত জীবনচর্চা করতে হবে। এর সঙ্গে গোপন সংগঠন, পড়ার প্রয়োজনীয়তা ও গোপন নেতাকর্মী কীভাবে গড়তে হবে এবং কীভাবে তারা সংগ্রাম সফল করার পথে কাজ করবে তার রূপরেখা দিলেন।

চিনেও তো রাষ্ট্রীয় পুঁজি শিল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ করত। রাশিয়া বা ভারতের পুঁজিবাদকে তিনি সমালোচনা করলেন, কিন্তু চিনের পুঁজিবাদকে এড়িয়ে গেলেন কেন?

*গোপন **সংগঠন, গোপন** নেতাকর্মী গড়লে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব আর কীভাবে হবে? বরঞ্চ **এটা স্বদেশীদের** মতো কয়েকটা জোতদার, নিচুতলার পুলিশ কর্মীকে খুন—এতেই উত্তেজনার আগুন পোহানোর মতো হবে।*

যুক্তিবাদী সমিতি কোনও দিনই মনে করেনি যে গোপন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিপ্লব সফল করা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গোপন রাখা দরকার। জনযুদ্ধ গোষ্ঠী ও এম সি সি (মাওইস্ট কমিউনিটি সেন্টার) এরা আগে গোপনে কার্যকলাপ করত। ২০০২-'০৪ পর্যন্ত আমি ওদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকাশ্যে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সক্ষম হই এবং ২০০৪ সালে প্রকাশ্যে ওরা মিছিল করে। জনসভা করে সিপিআই (মাওইস্ট) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ওদের গঠনমূলক কার্যকলাপ, সাংস্কৃতিক আন্দোলন দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলে।

পঞ্চম দলিল : '১৯৬৫ সাল কি সম্ভাবনার নির্দেশ দিচ্ছে'? প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-তে।

এই দলিলে চারু মজুমদার জানান, সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের গৃহীত প্রোগ্রাম অর্থাৎ রণনীতিগত দলিল গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী পার্টি গড়ার কাজ শেষ হয়নি। সশস্ত্র সংগ্রাম কোনও হঠকারিতা নয়। বরং শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন আজকের যুগে অচল ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই সশস্ত্র হতে হবে। সংঘর্ষের জন্য সশস্ত্র ইউনিট গড়তে হবে। প্রতিটি সশস্ত্র ইউনিটকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে মাও সে তুং বলেছেন, "শত্রুর অস্ত্রাগারই আমাদের অস্ত্রাগার"।

তাই, অস্ত্রাগার গড়তে হবে গ্রামে গ্রামে। গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র দল তৈরি করতে হবে। অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। অস্ত্র গোপন রাখার জায়গা গড়তে হবে। ফসল লুকানোর জায়গা করতে হবে মাটির তলায়। ফসল পাহারা ও যোগাযোগের জন্য ছোট ছোট কৃষক দল গঠন করতে হবে। সশস্ত্র দলগুলো রাজনৈতিক প্রচার চালাবে। কৃষকদের মনোবল বাড়াতে রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলন চালাতেই হবে। ফলে সংগ্রাম ব্যাপকতা পাবে। এগুলো করতে হবে ফসল তোলার আগে আগেই। ফসল তোলার সময়ে একাজ করা যাবে না। এর সঙ্গে গোপন কাজ করার কৌশল রপ্ত করতে হবে।

এভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে ভারতের গৃহযুদ্ধে পরিণত করতে হবে। চিনের কৌশলেই ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে হবে। এটাই ভারতের মার্কসবাদীদের একমাত্র পথ। যে বামপন্থী ও মার্কসবাদীরা দেশরক্ষার জন্য আওয়াজ তুলছেন, ভারতের মতো বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে রক্ষা করতে সচেষ্ট, যে বামপন্থী ও মার্কসবাদীরা রাশিয়ার শোধনবাদী পথে চলতে চাইছে, প্রতিক্রিয়াশীলদের মদতকারীর পক্ষে চলতে চাইছে, সেই বামপন্থী মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে তত্ত্বগত সংগ্রাম চালাতে হবে আমাদের। ওরা মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। তাই ওদের বিরুদ্ধে জঙ্গি পথেও সংগ্রাম চালাতে হবে।

এই নতুন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমগ্র ভারতের প্রান্তে প্রান্তে দাবানল জ্বালাবে। সফলতার পথে যাবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব।

অতএব, এই পথে দৃঢ় পদক্ষেপ করার আহ্বান জানালেন তিনি।

এই দলিল শেষ করার আগেই তিনি গ্রেপ্তার হন। তবে বাকিটা মুখে বলেছেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসে লিখলেন ষষ্ঠ দলিল।

শত্রুর অস্ত্রই যদি আমাদের অস্ত্রাগার হয় তাহলে গ্রামে গ্রামে অস্ত্রাগার গড়তে হবে কেন?

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলতে কী বোঝায় সেটার কোনও ব্যাখ্যা উনি দেননি।

বিপ্লবের ক্ষেত্রে কৃষকদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিই বা কী? ওদের কর্মসূচি তো কৃষিকাজ করা। তবে কৃষিকাজই কি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করবে? শুধু ফসল কাটা, লুকিয়ে রাখা, পাহারা দেওয়াতেই কি তারা নেতৃত্ব দেবে শ্রেণিহীন সমাজ গঠনে? জানা নেই। কারণ, স্পষ্ট কর্মসূচি নেই। বরং শুধু অস্ত্র জোগাড় করা, সশস্ত্র আন্দোলন করার কথাই বলা হয়েছে। এভাবেই জমি দখল করবে। তারপর রাষ্ট্র তো আবার সেই জমিগুলো কেড়ে নেবে। নিয়েছেও তাই। তাহলে একগাদা রক্তপাত, জীবনহানি করে লাভ কী?

তবে সেই সশস্ত্র আন্দোলনই বা কোন কৌশলে হবে, কোথায় কতটা হবে—সে ব্যাপারেও কোনও গাইড লাইন দেওয়া হয়নি।

গেরিলা যুদ্ধ চালাতে গেলে কোন কৌশলে, কোথায় এবং কতটা চালাতে হবে, সে ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে শুধু ব্যক্তিহত্যা, নৈরাজ্যবাদী কাজই চলতে থাকে। যেমন '৬৭ থেকে '৭৩ পর্যন্ত হয়েছিল।

ষষ্ঠ দলিল : 'সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সাচ্চা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামই প্রধান কাজ'। প্রকাশিত হয় ১২ আগস্ট, ১৯৬৬।

এই দলিলে নতুন সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে বললেন, যে বামপন্থীরা, যে মার্কসবাদীরা সোভিয়েত রাশিয়াকে সমর্থন করছেন, তারা আসলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল, সোভিয়েত সংশোধনবাদের দালাল। কারণ, সোভিয়েত সংশোধনবাদী নেতৃত্ব ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজকে বিশ্বজুড়ে প্রভুত্ব চালাচ্ছে। সোভিয়েত আজকে বিপ্লবী পার্টিগুলোকে ভেঙে শোধনবাদী কাজ চালাচ্ছে যা আসলে পুঁজিবাদের দালালি করা।

চিনা কমিউনিস্ট পার্টি মাও সে তুং-এর নেতৃত্বের বিরোধিতা করে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় না। সমাজতন্ত্রের পথে সংগ্রাম করা যায় না।

মহান চিন বিপ্লব, চিনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং চেয়ারম্যান মাও সে তুং আজ সারা বিশ্বের শ্রমিক-কৃষকের নেতৃত্ব দিচ্ছে। নেতৃত্ব দিচ্ছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের। তাই চেয়ারম্যান মাও-এর পথে ভারতে কৃষকদের নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে হবে। শ্রেণিহীন সমাজ গঠনই এই বিপ্লবের লক্ষ্য।

এই বিপ্লব সফল করতে হবে সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই। সশস্ত্র কৃষকদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এজন্য যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী ও তাত্ত্বিক জ্ঞান সম্পন্ন, সেই কমরেডদের এগিয়ে আসতে হবে। তাঁরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে রাজনৈতিক শিক্ষা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তাত্ত্বিক শিক্ষা দেবেন। ছোট ছোট দলে শিক্ষাকেন্দ্র গড়তে হবে। সেখানে স্থানীয় ইউনিট ও

পার্টির কমরেডরা তাত্ত্বিক শিক্ষা নেবে। তাত্ত্বিক শিক্ষকরা আত্মপরিচয় গোপন রাখবেন।

চারু মজুমদার যেভাবে চিনকে অন্ধের মতো সমর্থন করেছেন তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে উনিও চিনের দালাল ছিলেন।

মাও-এর বিরোধিতা করা যাবে না কেন? সেখানেও তো কেন্দ্রিকতা প্রাধান্য পাচ্ছে।

সপ্তম দলিল : 'সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সশস্ত্র 'পার্টিজান' সংগ্রাম গড়ে তুলুন'। প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে।

এই দলিলে তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক জনভিত্তির পথ বলা হয়েছে। গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে পার্টি ও আদর্শ-লক্ষ্যের গণভিত্তি গড়ে তোলার ওপর।

শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের তত্ত্ব গোপন রাখা যাবে না। রাজনীতি ও পার্টি গড়ার আওয়াজ গোপন রাখা যাবে না। বরং এই আওয়াজ দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। অন্যান্য দল তাদের রাজনীতি প্রচার করবে। তাই এই সুযোগটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। আমাদের রাজনীতি, পার্টি গঠন, শ্রেণিহীন সমাজের তত্ত্ব প্রচার করতে হবে জনগণের মধ্যে। অগণতান্ত্রিক দলগুলোর ভুয়া আওয়াজে বিভ্রান্ত হলে চলবে না। শ্রমিক-কৃষক ঐক্য, সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা, কৃষকের নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলিষ্ঠভাবে জনগণের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের পার্টির নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে জনমানসে।

আমাদের মনে রাখতে হবে চেয়ারম্যান মাওয়ের কথা—"কোনও মুমূর্ষু শ্রেণি ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। একমাত্র বন্দুকের ভেতর থেকেই স্বাধীনতা বেরিয়ে আসে"। কৃষক জনগণ হবে 'পার্টিজান' সংগ্রামের নেতৃত্ব। তাদের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নে "গ্রামাঞ্চলে মুক্ত অঞ্চলই হচ্ছে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের বাস্তব প্রয়োগ" যারা বিপ্লব থেকে পালিয়ে যায় "তারা ভীরু এবং বিপ্লবী নেতৃত্বের অযোগ্য" প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। "প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আসলে কাগজে বাঘ" ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার অনাহার দিয়ে, বন্দুকের গুলি দিয়ে জনসাধারণকে হত্যা করছে" তাই "অত্যাচার হলে তার প্রতিরোধ হতে বাধ্য" ছাত্র-যুব আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ দেখছি। "মধ্যবিত্ত ছাত্র ও যুবকেরা জনতারই অংশ এবং তাদের সংগ্রামের অনিবার্য পরিণতিতে শ্রণিক ও কৃষক সংগ্রাম উত্তাল হয়ে উঠবে।" বিহারে শুরু হয়েছে কৃষক সংগ্রাম। ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। "তারা কতখানি এই আন্দোলনের শরিক হল তার

দ্বারাই তারা বিপ্লবী কিনা সেটাই নির্ধারিত হবে।"

নিরস্ত্র জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হবে আমাদের। তাদেরকে সশস্ত্র করতে হবে। তবেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হবে।

সপ্তম দলিলে চারু মজুমদার সমাজতন্ত্রের কথা বলতে গুলি, বন্দুকের নীতির কথা বলেছেন।

শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের তত্ত্ব কী সেটা উনি প্রকাশ করেননি।

অষ্টম দলিল : 'সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কৃষক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে'। প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯৬৭ সালে।

এই দলিলে কৃষক সংগ্রামের ক্ষেত্রে সেই সময়ের পার্টি নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দুতে কৃষি বিপ্লব—এই তত্ত্ব দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরতে হবে জনগণের কাছে। বিভিন্ন জাতিসত্তার সংগ্রামকে শ্রমিক-কৃষক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে জঙ্গি যুক্ত ফ্রন্ট গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে হবে। শ্রমিক শ্রেণিকে যেতে হবে গ্রামাঞ্চলে। সেখানে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিতে হবে। 'অস্ত্রসংগ্রহ করা এবং গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের ঘাঁটি তৈয়ার করা' এই শ্রেণির প্রধান কাজ। শুধু দাবি-দাওয়া আদায়ের রাজনীতির মধ্যে শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নকে আটকে রাখা চলবে না। তাদের ভিতর সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি, বন্দুক সংগ্রহের রাজনীতি প্রচার করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে আমাদের পার্টি সংগঠন।

যারা ভারতের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করেন না, ভারতের সংগ্রামগুলো থেকে শিক্ষা নেন না, অথচ সশস্ত্র সংগ্রাম, ক্ষমতা দখল, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা স্বীকার করেন—তাঁরা আসলে গোঁড়া। তাঁরা ভুলে যান 'অক্টোবর বিপ্লবে'র কথা।

আমাদের সব রকমের সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এগোতে হবে। দিকে দিকে আমাদের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কৃষকদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র পথ। এই পথেই ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবে। প্রতিষ্ঠা হবে শ্রেণিহীন সমাজ।

চেয়ারম্যান মাও সে তুং জিন্দাবাদ।

কৃষকদের নেতৃত্বেই সেই সময়ের ভারতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—একথা ঠিক। কারণ, ভারত কৃষিনির্ভর দেশ। প্রায় আশি

শতাংশই কৃষক। পোশাক হল খেটো ধুতি, আদুল গা, খালি পা। হতদরিদ্র, হাড়হাভাতে বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষণে ছিবড়ে হয়ে রয়েছে বংশ পরম্পরায়।

তাই এদের মুক্তি মানেই দেশের মুক্তি।

আর, শ্রমিকরা খেটো ধুতিতে অভ্যস্ত নয়। গ্রাম্য ভাষা বুঝলেও বলতে পারে না। শোষণ এদের উপর কম। কোথাও বা শ্রমিকরা সচ্ছল। এই অবস্থায় শ্রমিকরা কীভাবে গ্রামে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ ও মজুত করবে? কীভাবেই বা কৃষি বিপ্লবের সহযোগী হবে? কীভাবে গ্রামের মানুষের সঙ্গে 'জলে মাছের মতো মিশে যাবে'? এর কোনও স্পষ্ট দিশা নেই। বরং তারা তো পুলিশের কাছে পটাপট ধরা পড়ে যাবে। গেছেও তাই।

আর এক কলকাতার গজিয়ে ওঠা চারু মজুমদার অসীম চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করলেন। তাঁর বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামে গ্রামে ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়লেন এবং পুলিশের হাতে পটাপট ধরা পড়লেন।

উনি সব দলিলেই মাও-এর জিন্দাবাদ, চিনের সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ বলেছেন। যদিও মাও-এর ঘোষিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। এগুলোর মধ্যে দিয়ে কি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ভারত চিনের উপনিবেশ।

নকশাল আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণদের শ্রেণিহীন সমাজ, শোষণমুক্ত সমাজের আদর্শ ও তাঁদের আদর্শপ্রেমকে শ্রদ্ধা করেও বলা হচ্ছে তাঁরা রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় মেতেছিলেন। চারু মজুমদারের গেরিলাযুদ্ধ সংক্রান্ত নীতিগুলো রোমান্টিকতায় ভরা, বাস্তবসম্মত নয়। আর তাঁদের শ্রেণিশত্রু বিচার ও তাদের খতম করার বিষয়টি তখনও বুঝিনি, এখনও মাথায় ঢোকে না।

এই প্রসঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে আলোচনায় আসা প্রয়োজন।

গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োগ-পদ্ধতি

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ থেকেই সাধারণভাবে যুদ্ধে তিনটি শ্রেণির বাহিনীকে কাজে লাগানো হয়। স্থল, বিমান ও নৌ। স্থল বাহিনীর আবার দুটি বিভাগ। পদাতিক ও সাঁজোয়া। পাহাড়ি এলাকায় যুদ্ধ হলে ট্যাঙ্ক কাজে লাগে না। তখন কাজে লাগে পদাতিক সেনা। তাদের এগিয়ে যাওয়া ও অঞ্চল দখলে সাহায্য করে বিমান বাহিনী।

কোনও সর্বাত্মক যুদ্ধে শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে পদাতিক সেনা কখনও এগোয়। কখনও বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি গেড়ে অবস্থান করে। কখনও পাশে সরে, কখনও বা পিছোয়। পদাতিক বাহিনীতে অগ্রভাগ ও পশ্চাৎভাগ থাকে।

গেরিলাবাহিনী গড়ে তোলা

গেরিলা যুদ্ধ কখনও সর্বাত্মক যুদ্ধ নয়। 'লুকিয়ে থেকে আচমকা আঘাত হানো এবং আক্রান্ত হওয়ার আগেই আত্মগোপন কর'—এই হল গেরিলা যুদ্ধের মূল কৌশল।

১) যে কোনও কিছুর একটা স্থির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকাটা প্রয়োজন। গেরিলা যুদ্ধ চালালে, তারও একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকাটা খুবই জরুরি।

২) ভৌগোলিক অবস্থানটা জেনে নিতে হবে হাতের তালুর মতো।

৩) যে অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হবে সেখানকার ইতিহাস, মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক অবস্থা, শোষণের রূপ, মানসিকতা, কুসংস্কার ইত্যাদি জেনে নিতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। এখানকার মানুষদের সুখ দুঃখের সাথী হতে হবে। বিপদে বন্ধু হতে হবে।

৪) গেরিলা যুদ্ধে নামার আগে প্রচুর বড় মাপের মিছিল ও সমাবেশ করতে হবে। শোষিত মানুষদের সমাবেশিত করতে হবে এটা খুবই জরুরি।

৫) অবস্থার সঙ্গে বুঝে নিতে হবে যে, আমরা সমাজ সংস্কার করার লক্ষ্যে এগোচ্ছি না। চাইছি, সমাজের একটা উল্লম্ফন, একটা বিশাল অগ্রগতির লাফ। অগ্রগতির লাফ-ই হল 'বিপ্লব'। তাই, মদের ঠেক, ব্লু-ফিল্ম, জুয়ার ঠেক ভাঙা। নেশার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা। তাদের জুয়ার আড্ডা বন্ধ করা। বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করা। জ্যোতিষ পেশা বন্ধ করা। তন্ত্রসাধনা বন্ধ করা সহ অলৌকিক উপায়ে রোগ সারানোর পেশা বন্ধ করা। আসল তথ্যকে তুলে ধরা। এরকম সাধারণ দৃষ্টিতে সমাজের ক্ষতিকর বিষয়-বৃত্তিগুলোর বিরুদ্ধে জনসমাবেশিত করে আন্দোলন করা ও তাকে জঙ্গি রূপ দেওয়া। সঙ্গে ডিসকোর্স তৈরি করা দরকার।

৬) জনযুদ্ধের কাজ শুরু করার জন্য বিপ্লবী কমরেডদের আত্মগোপনের নির্দেশ দিতে হবে।

৭) পার্টির সাংগঠনিক কাজ গোপনে চালাবার পরিকল্পনা করতে হবে।

৮) গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলতে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন একটা বিপ্লবী সাম্যকামী সংগঠন। এই বিপ্লবী সংগঠন বিপ্লবের আগে গণসংগঠন রূপে পরিচিত হতেই পারে। এমন একটা সংগঠন বা গণসংগঠন যা শোষিত, অত্যাচারিত, হতদরিদ্র মানুষদের গ্রামগুলোতে তাদের বন্ধু হিসেবে হাজির হবে। বিপদের বন্ধু। এদের সংখ্যা গ্রাম পিছু জনা দুয়েক হলেই ভাল হয়। এরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশে থাকবে গ্রামবাসীদের একজন হিসেবেই। বাইরের কেউ এদের হদিশ পাবে না। এরা থাকবে কারও

কুঁড়ে বা বস্তিতে আত্মীয়ের পরিচয়ে। এসেছে শ্রমের বিনিময়ে খাবার জোটাতে।

৯) এই সাম্যকামী অগ্রণী সেনারা গ্রামবাসীদের তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করবে। সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচার কথা শোনাবে। সাম্যের মতাদর্শে দীক্ষিত করবে। ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বোঝাতে হবে দেশের ইতিহাস, ভূগোল। বোঝাতে হবে কিছু শব্দের অর্থ। যেমন— রাষ্ট্র, গণতন্ত্র, দেশপ্রেম, নাগরিকের অধিকার, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, স্বয়ম্ভর গ্রাম ইত্যাদির অর্থ। লেখাপড়া শেখানো, কুসংস্কার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা, জাতীয় বীরদের জীবনীর সঙ্গে পরিচয় ঘটানো, ধর্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ ও তার মধ্যে দিয়ে শোষণের পদ্ধতি, পূর্বজন্মের কর্মফল যে ভাঁওতা, অলৌকিক ক্ষমতা বলে কিছু নেই, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র যে মানুষের সমাজ কোনও কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে না—এসব বোঝাতে হবে গল্পের ছলে। বরং এইসমস্ত কুসংস্কার, ঈশ্বর বিশ্বাস যে শোষণ করার জন্যই শোষকরা টিকিয়ে রেখেছে—এসবও জানাতে হবে।

এরপর নারীকে মানুষ হিসেবে সম্মান দেওয়ার শিক্ষা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার শিক্ষা, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করার শিক্ষা দিতে হবে।

পরবর্তী পর্যায়ে বোঝাতে হবে, নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি করলেই শাসকদল বা দেশের সরকার তা দেবে না। এই অধিকার অর্জন করতে না পারলে এমন পশুর জীবনই বয়ে বেড়াতে হবে।

যারা আমাদেরকে লুঠেই বড়লোক হয়ে শাসক হয়ে বসে আছে, তাদের থেকে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। এজন্য নিজেদেরকে যোগ্য করে তুলতে হবে।

বিভিন্ন দেশের গেরিলা যুদ্ধের কাহিনি উদাহরণ হিসেবে তাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। আবার শোষক শ্রেণির শোষণ ক্ষমতা কায়েম রাখার পদ্ধতিগুলো বোঝাতে হবে।

এটি হল সাংস্কৃতিক বাহিনীর কাজ। গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যায়।

১০) এভাবে গড়ে তুলতে হবে 'ঘাঁটি অঞ্চল'। 'ঘাঁটি অঞ্চল' তৈরি হয় পুরোপুরি শক্তিশালী পার্টি সংগঠন ও পার্টির গণভিত্তির উপর নির্ভর করে। এখানে গণভিত্তি মানে শুধুমাত্র জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন পাওয়া নয়। জনগণ যখন পার্টির নেতৃত্বে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়ে ওঠে, তখনই বলতে পারি ঘাঁটি গড়ার মতো গণভিত্তি তৈরি হয়ে গেছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনও এলাকায় শত্রু সৈন্যদের পরাস্ত করে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করা যাচ্ছে, ততক্ষণ বলা যাবে না যে—*আমরা 'ঘাঁটি অঞ্চল' স্থাপন করেছি। 'ঘাঁটি অঞ্চল' মানে নিজেদের* সরকার স্থাপিত হওয়া।

১১) গড়তে হবে *গেরিলা অঞ্চল। গেরিলা অঞ্চল* হল, অস্ত্রহীন জনগণকে সশস্ত্র করে তোলা। তাদের সেইসব অস্ত্র ব্যবহারের পদ্ধতি শেখানো। শত্রুর শক্তির সঠিক পরিমাপ করতে শেখানো। তাদের দিয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ চালিয়ে সাহসী মানসিকতা গড়ে তোলা। গেরিলা- রণ-কৌশল শেখানো।

১২) গেরিলা বাহিনী হল কয়েকজনের ছোট ছোট দল। এতে থাকে সাধারণভাবে চার থেকে বড় জোর পনেরো জন। তবে এর ব্যতিক্রম হয়।

১৩) গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব পরিচালনা করবেন যুদ্ধ থেকে স্বয়ম্ভর গ্রাম, কমিউন থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, শিক্ষা বিভাগ থেকে গুপ্তচর বিভাগ ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিভাগ। এইসব বিভাগের নিখুঁত সমন্বয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয়।

এই সংগঠনই ঠিক করে কারা বিভিন্ন বিভাগে নেতৃত্ব দেবে। কোথা থেকে গেরিলারা ট্রেনিং নেবে। প্রতিবেশী কোনও দেশে গিয়ে? তবে সেই দেশের ট্রেনারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

১৪) এরপর অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। হয় অর্থ দিয়ে কিনতে হবে, নতুবা শত্রু সেনাদের কাজ থেকে লুঠ করতে হবে। অস্ত্র, গোলা-বারুদের একটা অংশ কিনতে পারা যায় দুর্নীতিপরায়ণ দেশের সেনা ও পুলিশদের কাছ থেকে। বিভিন্ন বিস্ফোরক মিলবে নানা খনির সিকিউরিটি অফিসার, সেনা অফিসারদের কাছ থেকে।

১৫) এরপর 'মিলিশিয়া' গড়তে হবে। 'মিলিশিয়া' হল সে-ই সশস্ত্র বাহিনী যা গণমুক্তিফৌজের প্রথম ধাপ। এরা গেরিলা গ্রুপ। প্রতিটি স্বশাসিত অঞ্চলকে 'মিলিশিয়া' গড়ে তোলার অধিকার দেবে পার্টি। 'মিলিশিয়া'র প্রধান কাজ ওই স্বশাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত স্বয়ম্ভর গ্রাম ও সমবায়গুলোকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। একই সঙ্গে ঘাঁটি এলাকা এবং বিভিন্ন স্তরের গণকমিটিগুলোকে নিরাপত্তা দেওয়া, জনগণ জনযুদ্ধের যে সুফল পাচ্ছে তা রক্ষা করা।

মিলিশিয়ার সদস্যরা কেউ পুরো সময়ের কর্মী, কেউ আংশিক সময়ের কর্মী। এই মিলিশিয়ার সদস্যরাই পরবর্তীকালে গণমুক্তিফৌজে যোগ

দেয়। ওরা স্থানীয় মানুষকে অস্ত্রের ব্যবহার শেখায়, রসদ সরবরাহের কাজ করে।

১৬) গেরিলা বাহিনীকে শক্ত ভিতে দাঁড় করাতে হলে একটি শক্তিশালী গুপ্তচর বাহিনী থাকা খুবই জরুরি। মন্ত্রী, পুলিশ, প্রশাসন, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সেনা সর্বত্র অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে। অথবা, বন্ধুত্ব করতে হবে।

এই বন্ধুর বা গুপ্তচর বাহিনীর থেকেই হদিশ মিলবে গেরিলা বাহিনীর ভিতরে কারা রাষ্ট্রের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছে।

১৭) মনে রাখতে হবে অপ্রয়োজনীয় আক্রমণ করবে না এই গেরিলা যোদ্ধারা।

গেরিলার আবশ্যিক গুণ

১) আদর্শে অবিচল থাকা।
২) সমস্ত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।
৩) প্রচণ্ড শৃঙ্খলাবোধ।
৪) দৃঢ়চেতা।
৫) নির্ভয়।
৬) আদেশপালনে দ্বিধাহীন।
৭) শারীরিক সক্ষমতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা।
৮) হেতুহীন কৌতূহল আদৌ থাকবে না।
৯) প্রেমিকা-মা-বাবা-ভাই-বোন ইত্যাদিদের সঙ্গে কোনওভাবেই যোগাযোগ রাখা চলবে না। নিজের ও দলের স্বার্থেই এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন। এই যোগাযোগই সেনা ও পুলিশকে গেরিলার অবস্থান চিনিয়ে দেবে। আত্মীয়রা অত্যাচারে মুখ খুলবে। যারা জানে না, তারা খোলে না।
১০) যাদের মুক্তির জন্য লড়াইতে নামা, তাদের ভালবাসাকে গ্রহণ করতে হবে, উপভোগ করতে হবে।
১১) গেরিলা যুদ্ধে গিয়ে কোনও স্বার্থত্যাগ করছ না। আনন্দ উপভোগ করছ এটাই হল গেরিলা যোদ্ধাদের আদর্শ মানসিকতা। 'স্বার্থ ত্যাগ করছি' ভাবলে গেরিলা বাহিনীতে থাকা যায় না। প্রাণ দেওয়া যায় না।
১২) গেরিলারা শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুর হবে। মনে রাখতে হবে—'হয় আমি শত্রুকে মারব, না হলে শত্রু আমাকে'। একজন গেরিলা যোদ্ধার মৃত্যু মানে গেরিলা বাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি।
১৩) গেরিলা যোদ্ধা অহেতুক ঝুঁকি নেবে না।

১৪) অপ্রয়োজনীয় গুলিগোলার ব্যবহার করবে না। কারণ বহু কষ্ট করে এই সব যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করা হয়।

১৫) অত্যধিক গোপনীয়তা ও সতর্কতা খুবই জরুরি। পেট-পাতলা, গল্পবাজ কাউকে গেরিলা বাহিনীতে দেখলে তাকে বহিষ্কার করে দিতে হবে। বহিষ্কারের আগে তাকে জানিয়ে দিন, কেন তাড়ানো হল। বাইরে গিয়ে গেরিলা বাহিনী নিয়ে কোনও গল্প করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে—তাও জানিয়ে দিন।

১৬) দলে শত্রুদের গোয়েন্দা থাকতেই পারে। তাদের যতটা সম্ভব অকর্মণ্য করতে কোনও গেরিলাকে কখনও একা থাকতে দেবেন না।

১৭) যে অঞ্চলের জনমুক্তির জন্য যুদ্ধে নামা, সেই অঞ্চলকে, তার ইতিহাস ও ভূগোলকে জানতেই হবে। জানতে হবে ওই অঞ্চলে কোন কোন উপাসনা ধর্মে বিশ্বাসীরা থাকে। তাদের সংখ্যা। আয়ের উৎস। পারিবারিক আয়ের পরিমাণ। পানীয় জলের উৎস। রাস্তা-ঘাট। কৃষি নির্ভর না শিল্প নির্ভর এলাকা। জমি ক'ফসলি। উৎপাদিত ফসল কী। জাত-পাত নিয়ে কুসংস্কার কতটা প্রবল। কী ভাষায় কথা বলে। ওই অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। মোট কথা নিজের কর্মক্ষেত্রের অঞ্চলকে চিনতে হবে হাতের তালুর মতো।

১৮) অঞ্চলের মানুষদের বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জন করতে হবে। তাদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের সাথী হলে, অঞ্চলের উন্নতির জন্য শ্রম দিলে মানুষ ভালবাসবেই, বিশ্বাস করবেই।

১৯) অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে মিশে থাকতে হবে। এমনভাবে থাকতে হবে যাতে কারও বাড়তি দৃষ্টি আকর্ষণ না হয়।

২০) কারও কোনও ঝগড়ায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলা চলবে না।

২১) দোকান বা বাজার থেকে যা কেনা হবে, তার দাম মিটিয়ে দিতে হবে।

২২) ধার নিলে অবশ্যই শোধ দিতে হবে।

২৩) কোনও পুরুষ গেরিলা তাঁর নেতার নির্দেশ ছাড়া মহিলা বন্দির দেহ তল্লাশি করবে না।

২৪) নারীদের সম্মান জানাবেন। বিনয়ী হবেন।

২৫) নারী-পুরুষ গেরিলা একসঙ্গে থাকলে শোভন ব্যবহার করবেন। প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও তার বহিঃপ্রকাশ যেন অশোভন না হয়।

২৬) গেরিলা পুরুষ নারী দু'জনে জীবন-সঙ্গিনী হলেও তাঁদের জীবনযাত্রা হবে শোভন-সুন্দর ও আদর্শ।

২৭) বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বাড়তি আকর্ষণ দেখলে নেতা তাকে বারণ করবেন। তারপরও সংশোধনের কোনও চেষ্টা না দেখলে বহিষ্কার

করতে হবে। ওর দুর্বলতাই দলের বিপদ ডেকে আনতে পারে। গোপনীয় খবর বাইরে যেতে পারে। কারণ, এমন যৌন দুর্বলতা যে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকাকালীন কোনও কোনও গেরিলার দেখা দিতে পারে—এটা শত্রুপক্ষের অজানা নয়।

২৮) গেরিলা যুদ্ধে কৃতকার্য হওয়ার একটা অন্যতম প্রধান শর্ত গোপনীয়তা।

২৯) বড় মাপের গেরিলা যুদ্ধে গেরিলাদের প্রত্যেককে নিজেদের জিনিস নিজেদের বইতে হয়। বহু পকেটওয়ালা ব্যাগের কোন পকেটে কী রাখা হল, তা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে। এতে থাকবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আধুনিক অস্ত্র, মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইট ফোন (স্যাটেলাইট ফোনের সাহায্যে পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তের ফোনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। স্যাটেলাইট ফোন কোনও মোবাইল নেটওয়ার্কের সাহায্যে চালিত হয় না। যোগাযোগ রাখে স্যাটেলাইটের সাহায্যে। জ্যামারের সাহায্যে মোবাইল নেটওয়ার্ক অকেজো করা যায়; কিন্তু স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ককে অকেজো করা যায় না। কোথা থেকে এই ফোন করা হচ্ছে, ধরা যায় না), মিলিটারি ম্যাপ, জিপিএস বা Global Positioning System (জিপিএস হল স্যাটেলাইটের সঙ্গে যুক্ত একটা ছোট্ট কম্পিউটার, যার স্ক্রিনের আয়তন মোবাইল স্ক্রিনের চেয়ে কিছু বড়। জিপিএস স্যাটেলাইটের সাহায্যে যেখানে যেতে চাওয়া হয়, তার যাত্রাপথ নির্দেশ করবে। 'গুগল আর্থ' (Google Earth) স্যাটেলাইট মানচিত্রের সাহায্যে ভারত, পশ্চিমবাংলা, দমদম এয়ারপোর্ট, মতিঝিলে আপনার বাড়িটি পর্যন্ত খুঁজে তার স্পষ্ট ছবি ও পথনির্দেশ পাওয়া সম্ভব। তারপর সেখানে যাওয়ার পথ দেখাও বললে জিপিএস পথ দেখাতে থাকবে। কোথায় পথ বাঁক নিচ্ছে, কোথায় খানাখন্দ—সব গাইড করবে। কেউ জিপিএস নিয়ে লোকসভা কক্ষ থেকে হোটেলের ফ্লোর যেখানেই ঘুরবেন, চাইলে জিপিএস সেখানকার পজিশন-ম্যাপ তৈরি করে ফেলতে পারবে। (আজকাল অনেক গাড়িতে জিপিএস লাগানো থাকে), দীর্ঘ অতি ধারাল ছুরি, টর্চ, ইনফারেড দূরবিন (অন্ধকারেও সব দেখা যায়), ডিহাইড্রেশন থেকে বাঁচতে ভিটামিন সি, জল, ক্ষত সেলাই করার ছুচ ও নাইলন জাতীয় সুতো, ব্যান্ডেজ, ল্যুকোপ্লাস্ট, কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ, লাইটার, দেশলাই, বাদাম, খেজুর, ন্যাপকিন পেপার, মগ, থালা, চামচ ইত্যাদি।

৩০) গেরিলাদের মধ্যে কারও কারও দোষ থাকে, কোনও ঘটনাকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলা। এটা অমার্জনীয় অপরাধ। নিজেকে হিরো সাজাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। এটা স্কোয়াডের একটা টিমওয়ার্ক। এই বাড়িয়ে বলার প্রবণতাই গেরিলা বাহিনীর ক্ষতি করতে পারে। কোনও নেশায়

বশীভূত গেরিলাকে দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে। নেশাগ্রস্ত মানুষ জ্ঞানত জেনে বা না জেনে দলের অনেক গোপন খবর পাচার করতে পারে বা প্রকাশ করতে পারে।

৩১) আন্ডারগ্রাউন্ড থাকাকালীন গেরিলারা বাইরে প্রচার মাধ্যমের প্রচার যেন শুনতে না পায়, পত্র-পত্রিকা পড়তে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। গেরিলা বাহিনীর মনোবল ভাঙতে সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যম লাগাতার মিথ্যে প্রচার চালাতে থাকে। এই মিথ্যে প্রচারের প্রভাব থেকে বাঁচতেই এই নির্দেশ।

৩২) গেরিলা যুদ্ধে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ নেই। প্রত্যেকেই ভাল যোদ্ধা হতে পারেন। রেসের মাঠে মেয়ে ঘোড়ারা যেমন পুরুষ ঘোড়ার সঙ্গে রেসে লড়ে এবং জেতেও। তেমনই গেরিলা যুদ্ধে নারী একই সঙ্গে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে পারেন। নারী কখনওই পুরুষের চেয়ে দুর্বল নন। লড়া ও সংগঠনের শিক্ষা তাঁদের সবল করে।

গেরিলাদের মধ্যে একটু একটু করে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ 'গেরিলা বাহিনীর মধ্যে নারী যৌনবিবাদ সৃষ্টি' করবে না এবং ওসব ভাবার কোনও সুযোগই দেবে না। ওরা বন্ধু, ওরা সহযোদ্ধা। ওদের মধ্যে কারও কারও ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব গভীরতর হতে পারে, হয়। গেরিলাদের সামনেই বিয়ে করেন বা যৌথজীবনে প্রবেশ করেন। এতে কোনও ভাবেই কারও মনে কোনও ঈর্ষা কাজ করে না।

শত্রু সেনারা নারীলোলুপ। তাঁদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করার কাজ নিখুঁতভাবে করে থাকেন মহিলারাই। খবর আদান-প্রদান ও অস্ত্র পাচারে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা অনেক এগিয়ে।

সমাজের অর্ধেককে গেরিলা যুদ্ধে কাজে লাগানো সদর্থক কাজ। এতে সংগঠন বাড়বে আয়তনে ও শক্তিতে।

৩৩) প্রতিটি গেরিলাকেই অস্ত্রের ব্যবহার ও শারীরিক ফিটনেসের পাশাপাশি 'প্রাথমিক চিকিৎসা'র ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে। শেখানো হয় শরীরের কোন অংশের হাড় ভাঙলে কেমনভাবে গাছের ডাল কেটে ট্রাকশন দিতে হয়। কাটা দেহাংশে সেলাই করতে হয়। কীভাবে 'লোকাল অ্যানেসথেসিয়া'র সাহায্যে দেহ থেকে গুলি বের করতে হয়। কোথায় কীভাবে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়।

গেরিলাদের সঙ্গে রাখতে হয় 'পেইন কিলার' ওষুধ ও অ্যান্টাসিড, অ্যান্টিবায়োটিক। আহত গেরিলা যোদ্ধাকে ওই অঞ্চলের কোনও বন্ধু পরিবারে রাখতে হবে। যে অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ চলে, সে অঞ্চলে এমন

বন্ধু পরিবার অনেক জুটে যায়। কারণ বন্ধুত্ব করে নেন গেরিলারা। এমনই কিছু বন্ধুদের আস্তানায় আহত যোদ্ধা থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্তর রাখা হয়ে থাকে। এই বন্ধুদেরই কোনও এক পরিবারে একজন ডাক্তারকে রাখার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। তারপর সময়-সুযোগ বুঝে আহত বা অসুস্থ যোদ্ধাকে মুক্তাঞ্চলের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হবে। মুক্তাঞ্চল যতদিন গড়ে তোলা সম্ভব না হচ্ছে, ততদিন বন্ধুদের বাড়ি বা গেরিলা অঞ্চলের বাইরে কোনও বন্ধুদের বাড়িতে বা ডাক্তার বন্ধুর নার্সিংহোমে রেখে চিকিৎসা চালাতে হয়।

গেরিলা যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শল্য চিকিৎসকের, অস্থি বিশেষজ্ঞ ও অ্যানাসথেসিস্টের।

গেরিলা 'ঘাঁটি' অঞ্চলে যতদূর সম্ভব আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম থাকবে। বিভিন্ন গ্রুপের রক্তের স্টক ও অক্সিজেন অবশ্যই রাখতে হবে। আর মানসিকভাবে উদ্দীপ্ত করার মতো একজন মনোবিজ্ঞানী রাখতে পারলে সোনায় সোহাগা।

এ তো গেল গেরিলা যুদ্ধের বিস্তারিত তথ্য। চারু মজুমদারের আটটি দলিলে এসব প্রয়োজনীয় বিষয় লেখা নেই। কোনও দিন গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করেননি তিনি ও অন্যান্য কমরেডগণ। নকশালদের কেউই গেরিলা যুদ্ধ জানতেনও না।

সাম্যকামীরা প্রথম গেরিলা যুদ্ধ করেন ২০০৫ সালে জেহানাবাদে বন্দিমুক্তির জন্য। তাও এই তথ্যের ভিত্তিতে। ভারতে যেসব জায়গায় গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে, এই পদ্ধতিতেই হচ্ছে।

চে গেভারার গেরিলাযুদ্ধের তত্ত্ব অনেকদিন আগেই বাতিল হয়ে গেছে।

এই যুদ্ধের পাশাপাশি চলে নির্মাণ। জমি বাজেয়াপ্ত করা। এই জমির দ্বারা *'যৌথ খামার'* গড়ে ওঠে। এই জমির মালিক হয় স্থানীয় চাষিরা। চলে *সমবায়* পদ্ধতিতে। এইসব সমবায়ভিত্তিক চাষে ব্যবহার করা হচ্ছে উন্নত বীজ। নতুন নতুন শস্য ও সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে। অনেক ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বৃষ্টির জলকে ধরে রাখার পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে। জলবিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। এইসব *সমবায়* ও *কমিউন* চালাবার জন্য পার্টি-কর্মীদের এক থেকে দু'মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সমবায়ভিত্তিতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বস্ত্র তৈরি, মোমবাতি, সাবান, কাগজ, চামড়া তৈরির শিল্প ইত্যাদি গঠন করা ও উৎপাদন পরিচালনা চলে। এইসব কৃষি

ও শিল্প দ্রব্যের ক্রেতা গণমুক্তিফৌজ ও গণকমিটি। গণমুক্তিফৌজ ও গণকমিটিতে রয়েছে স্থানীয় মানুষ-ই।

খোলা হচ্ছে চিকিৎসাকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র, অরণ্যরক্ষক সহ সম্পদ রক্ষক ইত্যাদি। এসব-ই সমবায়ভিত্তিতে গড়া হয়। কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেই।

এইভাবেই গড়ে উঠেছে স্বয়ম্ভর গ্রাম। যাঁরা স্বয়ম্ভর গ্রাম চালাবে তাদের নির্বাচিত করেন প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষরা। ঠিকমতো কাজ না করতে পারলে বা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লে তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা থাকে নির্বাচকদের হাতে।

এই নির্মাণের কথাও চারু মজুমদারের আটটি দলিলের কোথাও নেই। এর সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কোনও পথের দিশা তিনি দেখাননি। কারণ সাংস্কৃতিক বাহিনী হল বিপ্লবের অগ্রবাহিনী।

এসব-ই চারু মজুমদারের চিন্তার সীমাবদ্ধতা।

অধ্যায় : সতেরো

যৌবনের নকশাল আন্দোলন

যুবক বয়সে আমি নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমার ভবঘুরে মন আমাকে টেনে নিয়ে যেত দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। নকশাল আন্দোলনের তাত্ত্বিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলাম বিভিন্ন জায়গায় স্টাডি ক্লাস নিয়ে। দেশের মানুষের প্রকৃত অবস্থা, তাদের দৈনন্দিন দীনতা এসব বিষয়ই হয়ে উঠল সেই সমস্ত গোপন স্টাডি ক্লাসের বিষয়বস্তু।

আন্দোলনের স্বার্থেই বিবাহিত জীবনের সূত্রপাত এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলত অভিযান। বড় বড় কাগজে দাপটে লেখার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ লেখা শুরু হল। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখাগুলোও জনপ্রিয় হতে থাকল।

সময়টা ১৯৭১-'৭৩। নকশাল আন্দোলন তখন ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে। প্রচুর বেনোজল দলে ঢুকে পড়েছে। সৎ ও ভালমানুষ চারু মজুমদার ছিলেন কিঞ্চিৎ কান পাতলা, রুগ্‌ণ শরীর। ওনাকে ঘিরে তখন অন্তর্দলীয় কোন্দল চলছে। আর অন্য দিকে গুন্ডা-মস্তানরা নিজেদের নকশাল বলে রাজ্যে অরাজকতা চালাচ্ছে সন্তর্পণে। আমি সবই লক্ষ করলাম এবং সেই সঙ্গে এও বুঝলাম সৎ ও সামগ্রিক কোনও মহৎ কাজ এই নকশালদের দিয়ে হবে না। দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম এবং উপলব্ধি করলাম "বিপ্লবের আগে, বিপ্লবের সময় এবং বিপ্লবের পরে সাংস্কৃতিক আন্দোলন কতটা জরুরি।"

এটা বুঝে নকশালদের সরাসরি বিরোধিতা না করে ধীরে ধীরে নকশাল দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলাম। কারণ, বিরোধিতা করা মানেই মৃত্যুকে আহ্বান করা। অনুভব করলাম শুধুমাত্র সংঘর্ষ দিয়ে সমাজ গড়া যায় না। দরকার সঠিক নির্মাণ ও যুক্তির। নচেৎ সাম্য থাকবে অধরা, কল্পকথার বিষয়।

তাই একটা নতুন দল তৈরি করলাম। উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানমনস্ক সৎ মানুষ গড়া আর একটা জোরদার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের। এভাবেই জানা গেল ক্ষুদ্রতর সামাজিক মূল্যবোধ থেকে এক বৃহত্তর সমাজ গড়ে তোলার কৌশল। 'আমাদের বঞ্চনার পিছনে রয়েছে কিছু মানুষের লোভ, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র। ঈশ্বর-আল্লার কৃপা পাওয়া বা না পাওয়ায় নয়'। চলল আন্দোলন। আড্ডার মতো করে বিভিন্ন

বিষয় নিয়ে আলোচনা তর্ক-বিতর্ক। তারই সঙ্গে হাতে-কলমে বুঝিয়ে দিতাম ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, আত্মা অবাস্তব, ভাগ্য বলে কিছু হয় না। এসবই শোষকদের পরিকল্পিত প্রচার।

যাই হোক, এভাবে কাজকর্মগুলো চলল। দলটাও বড় হতে লাগল। কত শত্রুর আক্রমণ, অত্যাচার, বিলাস বহুল জীবনের হাতছানি। সেই সঙ্গে সংযোগ হল বিশ্বাসঘাতকতা, কুৎসা, মেকি মামলা-মোকদ্দমা। তবে এসব সত্ত্বেও আমাকে কাজ থেকে বিরত করতে পারল না। সমাজতন্ত্র থেকে শুরু করে রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, দর্শন সব কিছুই ঘাটতে হয়েছে। চিন্তা থেকেই জন্ম নিল এক নতুন দর্শন ভাবনা—সৃষ্টি হল সমকালীন যুক্তিবাদের।

আমার দেখা নকশাল আন্দোলন

পার্টির সপ্তম কংগ্রেস-এর পরে দলে গোলমাল শুরু হল। পাশাপাশি গড়ে উঠল 'আন্তঃপার্টি' সংশোধনবাদ বিরোধী কমিটি'। চারু মজুমদার তাঁর দলিলগুলো লিখতে শুরু করলেন।

এই সময়েই গ্রাম-গঞ্জে শুরু হল বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, খাদ্য এবং কেরোসিন। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ কেরোসিন লাইনে পুলিশের গুলি চলল বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরে। মারা গেল এক ছাত্র। নাম নুরুল ইসলাম।

এই খবর ছড়িয়ে পড়ল গ্রাম থেকে গ্রামে, সারা বাংলায়। গ্রাম থেকে আন্দোলন এল শহরে। যুক্ত হল ছাত্ররা। শুরু হল অবরোধ। পুলিশের লাঠি, গুলি চলল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। ব্যাপক গ্রেপ্তার করেও আন্দোলন ঠেকানো গেল না। এগিয়ে এল নতুনরা। বাংলায় তখন আন্দোলনের দাবানল। কৃষ্ণনগরে পুলিশের গুলিতে শহিদ হলেন ছাত্র-মানুষ। পার্টি পাল্টা গুলি চালিয়ে পুলিশের রাইফেল ছিনতাই করল।

ইতিমধ্যে ইন্দিরা বন্দি নেতাদের মুক্তি দিলেন। নেতারা আসন্ন ১৯৬৭-র নির্বাচনে 'বুলেটের জবাব ব্যালটে' স্লোগান দিয়ে আন্দোলনটাকে নিয়ন্ত্রণ করলেন।

ওদিকে দার্জিলিং-এ গোলমাল চলছে অনেকদিন। সংগঠিত হচ্ছে নকশালরা। ধীরে ধীরে প্রভাবটা উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলিতে ছড়াচ্ছে। কেন্দ্রবিন্দু 'নকশালবাড়ি'। উত্তরবঙ্গের নেপাল সীমান্তে ছোট একটি গ্রাম। গ্রামবাসীদের মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যাই বেশি। নেতৃত্বে ছিলেন চারু মজুমদার, কৃষক নেতা জঙ্গল সাঁওতাল, কানু সান্যাল ও সৌরেন বসু।

১৯৬৭'-র এপ্রিলের শেষ দিকে দার্জিলিং জেলা ও শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষক নেতা ও কর্মীরা 'সিলিং' বহির্ভূত অর্থাৎ আইনমাফিক বেঁধে দেওয়া জমি রাখার সর্বোচ্চ সীমা বহির্ভূত বেআইনি জমি উদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ করল। ২০ থেকে ২২ মে নকশালবাড়ির জোতদারদের বেনামী জমি স্থানীয় কৃষকরা দখলে রাখল।

২২ থেকে ২৫ মে চলল সংগ্রামী কৃষকদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট পুলিশ বাহিনীর লড়াই। ১০ জন আদিবাসী কৃষকের মৃত্যু হল।

এই ঘটনার খবর সারা ভারতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। সিপিআইএম রাজ্য নেতৃত্ব চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু ও জঙ্গল সাঁওতালকে পার্টি থেকে বের করে দিল।

এবার শুরু হল সিপিআইএম ভাঙন প্রক্রিয়া।

তখন 'দেশহিতৈষী' ছিল সিপিআইএম-এর দলীয় মুখপাত্র। 'গণশক্তি'ও চলছে। এই দপ্তরেই সুশীতল রায়চৌধুরি, সরোজ দত্ত-রা প্রমোদ বাহিনীর হাতে মার খেলেন। উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদাররা নকশালদের বাঁচালেন। সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড।

যাক, সুশীতল রায়চৌধুরির পরিচালনায় শুরু হল 'দেশব্রতী'র পথ চলা। এর সঙ্গে ইংরেজি ও হিন্দিতে 'লিবারেশন' ও 'জনযুদ্ধ' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হল। নকশালবাড়ি সংগ্রামের কথা উঠে এল এই পত্রিকাগুলোতে।

তখনই গড়ে উঠল 'নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি'। এই গণফ্রন্ট গড়ে উঠল 'আন্তঃপার্টি সংশোধনবাদ কমিটি'র নির্দেশে।

এই গণফ্রন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বিশাল জনসভা হল কলকাতার রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। সভাপতি সুশীতল রায়চৌধুরি। বক্তব্য রাখলেন সিপিআইএম থেকে বহিষ্কৃত ও বেরিয়ে আসা বহু নেতা-কর্মী। ভিড় উপচে পড়া সভায় কলকাতা উত্তাল হল। শুরু হল নকশালদের ওপর সিপিএম-এর হামলা, খুন, গুম-খুন, বোমাবাজি ইত্যাদি।

ওই বছরই ১১ নভেম্বর কলকাতার ময়দানে এক বিশাল জনসভা হল। আয়োজক 'নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম-সহায়ক কমিটি'। এটাই চারু মজুমদারের শেষ জনসভা। হাজার পঞ্চাশের মতো মানুষ এই সভায় সমর্থন জানাল এই আন্দোলনকে। বজ্রনির্ঘোষ ছড়াল 'কমরেড চারু মজুমদার জিন্দাবাদ', 'নকশালবাড়ি জিন্দাবাদ'। কেঁপে উঠল কলকাতা।

চারু মজুমদার মঞ্চে উঠলেন। বললেন, "কমরেডস, এই সংগ্রামের নেতা আমি নই। নেতা কদম, খোকন, কানু..."। তাঁর কথা হারিয়ে গেল মাটি কাঁপানো 'জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে। ওই দুটি কথা বলে নেমে গেলেন চারু মজুমদার।

এর দু'দিন পর ১৩ নভেম্বর ভারতের বিপ্লবী কমরেডরা উল্টোডাঙায় বৈঠক করেন। গঠন হয় 'সারা ভারত কমিউনিস্ট বিপ্লবী'দের কো-অর্ডিনেশন কমিটি'। উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি নিয়ে গোলক ধাঁধায় ঘুরল কমিটি। তবু সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে।

'কৃষি সাম্যবাদ' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই সংগ্রামকে সমর্থন জানালেন মাও সে তুং। '৬৭-র ২৬ জুলাই, ২ ও ১৭ আগস্ট এবং ১৬ ডিসেম্বর চিন থেকে প্রকাশিত 'শিনহুয়া নিউজ এজেন্সি'র প্রতিবেদনে নকশালবাড়ি আন্দোলন সম্পর্কে মাও-এর

বক্তব্য প্রকাশিত হল। মাও এই লড়াইকে নিপীড়িত শোষিত মানুষদের যথার্থ লড়াই বলে ঘোষণা করলেন।

সশস্ত্র সংগ্রামের পাশাপাশি চলে পার্টি গঠনের প্রক্রিয়া। ২২ এপ্রিল ১৯৬৯-এ সিদ্ধান্ত হল, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)' নাম হবে পার্টির। কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভেঙে দেওয়া হল। 'কেন্দ্রীয় সংগঠন কমিটি' গড়া হল। সম্পাদক হলেন চারু মজুমদার। তৈরি হল পার্টির গঠনতন্ত্র এবং খসড়া কর্মসূচি। ঘোষিত নীতি—'কৃষি বিপ্লব', 'সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল' এবং 'সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা'।

এর আগে থেকেই রাজ্য-রাজনীতিতে ডামাডোল চলছে।

১৯৬৭ সালের ২৩ নভেম্বর এ রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে ন'মাসের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খারিজ করা হল। সমস্ত মেধাবী ছাত্ররা নকশাল আন্দোলনকে সমর্থন করতে এগিয়ে এল। তৈরি হল 'প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশন'। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাডিক্যাল ছাত্র আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠল।

ছাত্র আন্দোলন জোর চলছে। কলকাতায় ছাত্ররা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। 'শ্রেণিশত্রু' খতম অভিযান চলছে। 'শ্রেণিশত্রু' বলতে অবশ্য বড় চাষা, ছোট জোতদার, পুলিশ কনস্টেবল ইত্যাদিদের খতম চলছে। এরা কীভাবে 'শ্রেণিশত্রু' হিসেবে বিবেচিত হল তা আমার বোধগম্য হল না, আজও হয়নি।

স্কুল-কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে বোমা মারা চলছে। বিকল্প শিক্ষা কী হবে, দিশা নেই। কারখানায় লাল ঝান্ডা পুঁতে দখল করা যে যায় না, সেটা অনেক পার্টি কমরেডদের বোধগম্য ছিল না।

সমস্ত অশ্লীল সিনেমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ওসব চালানো বন্ধ করা হল। কলকাতার সিনেমা হলগুলোতে নাইট শো বন্ধ হয়ে গেল ব্যক্তিহত্যার ব্যাপকতায়। সন্ধের পরই কলকাতার রাস্তাঘাট শুনশান। এ'পাড়ার লোক ও'পাড়ায় যেত না, নকশালরা যদি ইনফরমার ভেবে খুন করে—এই ভয়ে।

নকশালদের উপর পুলিশি নজরদারি বাড়ছে। চারিদিকে ধরপাকড় চলছে। পুলিশ 'এনকাউন্টার'-এর নামে অনেককেই খুন করে চলেছে। পুলিশমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী তখন জ্যোতি বসু।

আমি পুলিশের মানসিকতা জানতাম। গ্রেপ্তারি এড়াতে ১৯৬৮-তেই বিয়েটা করে ফেললাম। আত্মগোপনের স্বার্থেই এই বিয়ে।

এল সেই দিন।

১ মে ১৯৬৯, কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে এক বিশাল জনসভা হল। জনসভা উপচে পড়ল। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কর্মী এসেছিলেন। জয়ধ্বনির

বজ্রগর্জনে কলকাতা কেঁপে উঠল। সিপিআই(এমএল) গঠনের কথা ঘোষণা করা হল। কর্মসূচিও ঘোষণা করা হল।

সিপিএম এতে ভূত দেখল।

এই সময়ে আমার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল তাত্ত্বিক ক্লাস নেওয়ার। ষষ্ঠ দলিলেই তাত্ত্বিক ভিত্তিকে গড়ে তোলার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন চারু মজুমদার। তখন নেতাদের একটা বড় ঘাটতি ছিল তাত্ত্বিক বিষয়ে। ছাত্র নেতা শৈবাল মিত্র, অসীম চট্টোপাধ্যায়দের মধ্যে দু-একটি ঘাটতি লক্ষ করেছিলাম। শৈবালের জ্যোতিষে বিশ্বাস, আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস ছিল। আর অসীম চট্টোপাধ্যায় ছাত্রদের বললেন, গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে 'জলে মাছের মতো মিশে যাও'। শহরের ছেলেরা গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে এমন মিশল যে, পটাপট ধরা পড়ে গেল পুলিশের জালে। আজিজুল হকের মধ্যে বিপ্লবী উগ্রতা ছিল। একই সঙ্গে ছিল তাত্ত্বিক অজ্ঞতা।

আমাদের ক্লাসে এসে বক্তব্য রাখছেন। শ্রোতাদের কয়েকজন প্রশ্ন করতেই প্রতিমা থেকে খড়ের কাঠামো বেরিয়ে এল। তারপর আমাকেই ঠেকনা দিতে হল।

অরিজিৎ মিত্র ভাগ্য ও আত্মার অমরত্ব দুটোতেই বিশ্বাস করতেন। নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রহরত্নের আংটিও পরতেন।

এদেরকে তৈরি করার চেয়ে নতুন কমরেডদের তৈরি করা অনেক সহজ মনে হয়েছিল। কারণ, পুরনো কমরেডদের 'ইগো' একটা বড় সমস্যা।

'যুক্তিবাদীর চোখে নারীমুক্তি' বইটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনেক বিখ্যাতরাই উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদারও এসেছিলেন।

জয়া মিত্র মঞ্চে উঠে আমাকে ফিসফিস করে বললেন, একটু উঠবেন আপনার সিটটায় বসব। তুষার তালুকদারের সঙ্গে একটু দরকার আছে।

অনুরোধে উঠলাম। উনি গুজগুজ ফুসফুস করলেন। গোটা দুয়েক বই উপহার দিলেন। তারপর তুষার তালুকদারই ওনাকে তুলে দিলেন।

তারপর এলেন অজিত পাণ্ডে। তিনিও তুষারবাবুর সঙ্গে ফিসফিস ফিসফিস।

তুষারবাবু বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন, এইসব বিপ্লবীরা আমার সঙ্গে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে হাত কচলে 'আমার বিষয়টা একটু দেখবেন' বলে অনুরোধ করতেন। আর বাইরে বেরিয়ে এইসব বেড়ালরাই হয়ে যেতেন বাঘ-সিংহ। কীভাবে আমাদের ঝাড় দিয়ে এলেন সেই গল্প বলতেন।

আর একটা ঘটনা, তখন নকশাল আন্দোলন যথেষ্ট থিতিয়ে গেছে। একটা দরকারে গিয়েছি একজন ডাকাবুকো নকশাল নেতার বাড়িতে। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাড়ি। দরজায় দাঁড়িয়ে তাকে ডাকতে দরজা খুলে দিল কেউ। নেতার কথা

জিজ্ঞেস করাতে বাড়ির মধ্যের মানুষটি চুপ। তারপর একজন ওই নেতাটিকে বললেন, আরে বেরিয়ে এসো, ইনি 'আমাদেরই লোক'। দেখলাম চৌকির তলা থেকে বোরখা পরে বেরিয়ে এলেন ডাকাবুকো নকশাল নেতাটি।

ওর এই অবস্থা দেখে তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনার উৎসাহই হারালাম।

আজিজুল হক গ্রেফতার হলেন। আঠারো বছর পর শৈবাল মিত্রের কৃপায় জেল থেকে মুক্তি পেলেন। তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিপিএমের ডাকাবুকো মন্ত্রী। শৈবাল মিত্র ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দুজনেই ছিলেন বন্ধু ও সেই সময়ের প্রেসিডেন্সির ছাত্রনেতা। ছাড়া পেয়ে আজিজুল হক সরকারের কাছ থেকে বউ-এর জন্য একটা চাকরি জোগাড় করলেন, একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করলেন এবং 'সিপিএমকে ভোট দিন' বলে মাইক ফুঁকতে লাগলেন। সত্যিই বিপ্লবী বটে!

জঙ্গল সাঁওতাল লড়াকু ছিলেন বটে, কিন্তু তত্ত্বের কিছুই বুঝতেন না, তিনি জেল থেকে বেরিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে 'বাস'-এর ব্যবসায় নেমে পড়লেন।

কানু সান্যাল মানসিক চাপে সশস্ত্র সংগ্রামকে ভয় পেতে শুরু করলেন। তিনি আবার নেতৃত্ব দিতে ভালবাসতেন। শেষ বয়সে এসে নৈরাশ্যজনিত কারণে আত্মহত্যা করলেন। তবে তিনি ছিলেন আমার দেখা একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট।

আমি ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু মাথাটা বাঁচাতে ব্যক্তিহত্যার বিরোধিতাও করতাম না। করলে আমিও 'শ্রেণিশত্রু' হয়ে যাব—এই ভেবে। বরং আমি আন্তরিকভাবে স্টাডি ক্লাস নেওয়ার মধ্যেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখলাম। এই সময়ে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, আমাদের বেশ কিছু তাবড় নাক উঁচু নেতারাও কুসংস্কারে আবদ্ধ। ভুল ধারণার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ব্যতিক্রম ছিলেন সরোজ দত্ত। আমার থেকে বছর তিরিশেক বড় হবেন। তাত্ত্বিকভাবে বলিষ্ঠ এবং কুসংস্কারমুক্ত একজন মানুষ। সরোজ দত্তর একটা ব্যাপার আমি মেনে নিতে পারিনি। তিনি মূর্তি ভাঙায় বিশ্বাসী ছিলেন এমনকী বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙাতেও। ধারালো ছিল তাঁর লেখনী। 'পরিচয়', 'স্বাধীনতা', ও 'দেশব্রতী' পত্রিকাগুলো সম্পাদনা করেছেন। নকশাল আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ।

'৭১-এর আগস্টের এক কাকভোরে পুলিশের প্রিজন ভ্যানে করে ময়দানে এনে গুলি করে তাঁকে হত্যা করে।

যাইহোক, মাও-এর সেই কথায় বিশ্বাস করতাম যে, একজন বিপ্লবী নিজেকে গোপন রেখেই নিজের দায়িত্বগুলো সুন্দরভাবে পালন করবে। সেইজন্য আমি কোথাওই আত্ম-প্রচারে থাকতাম না। বড় গোলমাল করতে চাইলে, ছোট গোলমাল এড়িয়ে যেতে হয়—এটাতেও বিশ্বাস করতাম। অথচ নকশাল আন্দোলনের অধিকাংশ নেতাই ছিলেন প্রচার-সর্বস্ব।

সাম্যের স্বপ্নকে সার্থক করতে প্রচুর ঘুরতে হত। ঘুরতাম মেদিনীপুর, ধানবাদ, গিরিডি, দুমকা, দেওঘর, ডেবরা, গোপীবল্লভপুর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি নানা জায়গায়। ডাকাবুকো বান্ধবীকে বিয়ে করেছিলাম। সেই বউ সীমা-ই হল আমার পাসপোর্ট।

সীমাকে নিয়ে অনেক ঘুরেছি। একবার দেওঘরে হোটেলে উঠেছি দুজনে। পুলিশ এসে হোটেল ঘিরে ফেলল। তাদের বললাম, হনিমুন-এ এসেছি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও ব্যাঙ্কের চাকরির পরিচয়পত্র দেখালাম। পুলিশ আমাদের ঘাঁটাল না। ফিরে গেল।

এই ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও ব্যাঙ্কের চাকরির পরিচয়পত্র বহু জায়গায় কাজে লেগেছে। আর সস্তায় হনিমুন করার কথা বলাতে প্রায় সব জায়গাতেই ছাড়া পেতাম।

আর একবার গিরিডিতে। সেখানে ধাবায় রাত কাটিয়েছি দুটো খাটিয়ায় শুয়ে। লরির ড্রাইভাররাও আমাদের ঘাঁটাত না। নওজোয়ান বাঙালিদের 'নকশাল' মনে করে ওরা চুপ থাকত। রাতে হাত দেখিয়ে লরি দাঁড় করিয়েছে সীমা। আর অমনি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতাম আমি। এই লরিতে চেপেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া চলত।

পুলিশি হানা হত আমাদের ওপর। কিন্তু, পুলিশ আমাদের কাছে কোনও দিনই অস্ত্র ও 'নিষিদ্ধ' বইপত্র পায়নি। কারণ, অস্ত্র ছিল জ্বলন্ত সিগারেট ও শারীরিক ক্ষিপ্রতা। আর বইপত্র সবই থাকত মগজে। কত রকম মানুষের সঙ্গে মিশেছি। কত শিখেছি।

ইতিমধ্যে, ১৯৬৯-এ চারু মজুমদারের 'খতমের নৈরাজ্যবাদী' লাইনের বিরোধিতা করে সাতটি সাম্যকামী গ্রুপ সিপিআই(এমএল) ছাড়ল। গড়ে উঠল নতুন নতুন গ্রুপ।

১৯৬৯ থেকে '৭১ পর্যন্ত কলকাতার চারু মজুমদার পন্থী নেতারা প্রায় সকলেই দলবাজি করতে থাকলেন। কলকাতার কফিহাউজে অসীম চট্টোপাধ্যায়, শৈবাল মিত্র, আজিজুল হক, জয়া মিত্র, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ নেতাদের বিভেদ ঘিরে এক একটা টেবিলে এক একটা গ্রুপ। চারু মজুমদার কানপাতলা মানুষ ছিলেন। সেই সুযোগে আদর্শহীনতা, দলবাজি মাথাচাড়া দিল কলকাতার নেতাদের মধ্যে।

এরপরেই নকশালদের মধ্যে ভাঙন প্রক্রিয়া শুরু হল। এর অন্যতম কারণ, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনুপস্থিতি।

নকশালবাড়ি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ সাংস্কৃতিক আন্দোলন

নকশালবাড়ি আন্দোলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোড়ন তুলল। নকশালবাড়ি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে এলেন বহু শিক্ষিত, মেধাবী মানুষও। সাহিত্য-নাটক-গান-চলচ্চিত্র ইত্যাদি

ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হল। বহু শিল্পী-সাহিত্যিক-চলচ্চিত্রকার-নাট্যকার-নাট্যপরিচালক-গীতিকার-বুদ্ধিজীবীরা যুক্ত হলেন। এদের অনেকেই নকশালবাড়ির সংগ্রামে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও, বেশিরভাগই নকশালবাড়ি সংগ্রামের সমর্থক, অনুরাগী। এদের নিয়ে পার্টি কোনও 'ফ্রন্ট'ও করেনি।

কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল 'তীর' নাটক। উপস্থাপনায়, পরিচালনায়, অভিনয়ে সার্থক নাটক 'তীর'-এ নকশালবাড়ি সংগ্রামের কথা উঠে এল। 'তীর' নাটকটি লেখার আগে উৎপল দত্ত নাটকের উপাদান সংগ্রহ করতে নকশালবাড়ি গেলেন। তখন এক চক্কর ঘুরলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত জনসভায় তিনি স্বভাবসিদ্ধ বাচনভঙ্গিতে বললেন, "একদিকে নকশালবাড়ি, আর একদিকে বেশ্যাবাড়ি। মাঝখানে গভীর নোংরা পাঁকের গাড্ডা। আজ ঠিক করে বেছে নিতে হবে শিল্পী-সাহিত্যিক- বুদ্ধিজীবীদেরকে, তাঁরা কোন বাড়িতে উঠবেন।" উৎসাহে উত্তাল হল সভা।

অজিত পাণ্ডে গান লিখলেন : "কৃষ্ণ কি আর কংস কারায় / বেঁধে রাখা যায়? / মাঠে মাঠে লক্ষ কৃষ্ণ / অগ্নি বাঁশের বাঁশি বাজায়।"

উত্তরবাংলায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ভাষায় একটি গান জনপ্রিয়তা পেল দারুণভাবে— "ও নকশাল নকশালবাড়ির মা / ওমা তোর বুগোৎ রক্ত ঝরে / সেই অক্ত আঙ্গা নিশান লয়্যা / বাংলার চাষি জয়ধ্বনি করে।"

গানটি লিখলেন দিলীপ বাগচী। আরও অনেক গায়ক ও গীতিকারই এগিয়ে এলেন এই কৃষক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে। যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্যামসুন্দর বসু, প্রতুল মুখার্জি, বিপুল চক্রবর্তী, নীতিকা রায়, কমলেশ সরকার, মেঘনাদ, অলোক সান্যাল, সুরেশ বিশ্বাস। অগ্রণী ভূমিকা নিল কিছু গোষ্ঠী। যাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য 'অপেরা গ্রুপ'—এই গ্রুপে আছেন অজিত পাণ্ডে; 'গণবিষাণ'—জলি বাগচী, পাখি রায়; 'নিশান্তিকা'—রমেন সাহা, পার্থ সেন, মানব সেন; 'অয়নিগোষ্ঠী'—অমিতেশ সরকার আছেন। এই গ্রুপগুলো দুরন্ত নাটক উপহার দিতে থাকল। নকশালবাড়ি সংগ্রামের কথা ছড়িয়ে যেতে থাকল নাটকের মাধ্যমে। এই সময় প্রচুর নাটক দেখলাম। মিনার্ভায় অভিনীত প্রায় সব নাটকই দেখলাম।

নকশালবাড়ির সংগ্রামের আগে পর্যন্ত গোটা গণনাট্য যুগে যত গান রচিত হয়েছিল, নকশালবাড়ি সংগ্রাম পরবর্তী দু'বছরের মধ্যেই তার চেয়েও বেশি গণসঙ্গীত রচিত হল। আর সেসব গান মুখে মুখে ফিরল। গ্রামে গ্রামে, শহরে জলসাতেও এইসব গান গাওয়া চলল।

আর, নাটক তো আছেই। মনোরঞ্জন বিশ্বাস লিখলেন 'পদাতিক'। ওনারই লিখিত ও অজস্রবার অভিনীত হল 'রণক্ষেত্রে আছি'। শ্যামলতনু দাশগুপ্ত লিখলেন 'শীতের আগুন', 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর', 'তীরবিদ্ধ শিকার'। জোছন দস্তিদার লিখলেন 'গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ'।

অমিতাভ গুপ্ত ওরফে মানস দত্তগুপ্ত লিখলেন 'হিমালয়ের চেয়ে ভারী'। অমল রায় রচনা করলেন 'ঘটোৎকচ', 'কেননা মানুষ'। সরাসরি নকশালপন্থী রাজনীতির কথা না থাকলেও বিপ্লবী রাজনৈতিক চিন্তাই হল এই নাটকদুটির ভিত্তিমূল। গৌতম মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'শৌভিক' নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে নাটকদুটি এক ইতিহাসই রচনা করে ফেলেছে এখন। অমল রায়ের 'হট্টমেলার হট্টগোল' ছোটদের নাটক হিসেবে অভিনীত হলেও রূপকের মোড়কে বিষয়বস্তু ছিল রাজনৈতিক। এই অমল রায়ের হাত থেকেই বেরিয়ে এর 'বিপ্লবের গান', 'বাস্তিল ভাঙছে', 'বিদ্রোহের থিয়েটার', 'শববাহকেরা', 'দ্রোণাচার্য' ইত্যাদি। সত্যেন ভদ্রের নাটক 'যবনিকা কম্পমান' তুলে ধরা হলো বিপ্লবী যুবকদের কারাগার ভাঙার কাহিনি। নীহার গুণ তাঁর 'মারীচ' নাটকে তীব্র আক্রমণ চালালেন সংশোধানবাদের ওপর। মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু'তে আমরা ধ্বনিত হতে দেখলাম 'শ্রেণিশত্রু খতম'-এর লাইন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'গিনিপিগ' ও 'রাজভক্ত' নাটকে রূপকের মধ্যে দিয়ে শাসকদের স্বৈরাচারী বর্বরতার রূপটাকে তুলে ধরলেন।

পার্টির সদস্য নন কিন্তু নকশালবাড়ির সংগ্রামে শ্রদ্ধাবান-সমর্থক শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি সংঘবদ্ধ শক্তিশালী সাংস্কৃতিক বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু এই অতি জরুরি কাজটি করতে চাইলেন না নকশাল কোনও নেতা।

রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাইলে সশস্ত্র আঘাত হানার জন্য সংগ্রামী মানুষের বাহিনী নামাবারও আগে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বাহিনীকে নামানো। একথা সমস্ত শ্রেণির পক্ষেই অতি বাস্তব সত্য। কিন্তু এই বাস্তব সত্যকেই অনুধাবন করতে অক্ষম হলেন চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু, খোকন মজুমদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সাংস্কৃতিক বাহিনীর সাহায্যে সাধারণের মগজ ধোলাই করে ময়লা সাফ করার যে কথা ইয়েনানে মাও সে তুং বলেছিলেন—নকশাল নেতৃত্ব সে কথাকে গুরুত্বই দিলেন না। বরং তাঁরা এইসব সমচিন্তার মানুষদের নিয়ে ফ্রন্ট গড়ার বদলে পার্টির বাইরের শিল্পী-নাট্যকার-সাহিত্যিকদের প্রতি যথেষ্ট বিরূপতাই প্রকাশ করলেন।

নেতৃত্বের এরকম অপরিপক্কতার এবং ভ্রান্তির জন্যই—সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার সাবলীল গতির প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হল। বিচ্ছিন্নভাবে একক প্রচেষ্টায়, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় যেটুকুও বা হল, তাও রুদ্ধ হতে থাকল সাতের দশকের পর।

অধ্যায় : আঠারো

কফিহাউজের আড্ডা

নকশাল আন্দোলনের গোড়া থেকেই কলকাতা কফিহাউজে আড্ডা দিতে যেতাম। কলেজ স্ট্রিট পাড়া তখন এখনকার মতো ভিড়ে ভিড়াক্কার নয়। এত দোকানও তখন ছিল না। ছিমছাম, ফাঁকা ফাঁকা। কফিহাউজও তখন এত সাজানো গোছানো ছিল না।

এখান থেকেই নকশাল আন্দোলনের খবর পেতাম। প্রেসিডেন্সি, বঙ্গবাসী, সুরেন্দ্রনাথ এই কলেজগুলোর ছাত্র সংগঠনের হালহকিকত জানতে পারতাম। এমনকী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরও পেতাম। এখানে আসতেন সাহিত্যিক, নাট্যকার, অভিনেতা, রাজনীতিক সকলেই। জমে উঠত আড্ডা।

আর, শ্যামবাজারে একটি কফিহাউজ ছিল। মোড় থেকে এপিসি রোডে ঢুকলে কয়েকটি চায়ের দোকানের পর বাঁহাতে এখনকার জামাকাপড়ের দোকানটাই শ্যামবাজার কফিহাউজ। এখানকার আড্ডায় খবর আসত উত্তর কলকাতার কলেজগুলোর ছাত্র সংগঠনের আন্দোলন সম্বন্ধে। মণীন্দ্র কলেজ ছিল আমার প্রাক্তন পাঠভবন। সেখানকার খবরও পেতাম। এখানেও আসতেন সাহিত্যিক, নাট্যকার, রাজনীতিক সকলেই। আড্ডাও ভালই জমত।

এই কফিহাউজ দুটিতে বিভিন্ন সময়ে অনেক রাজনীতিকরা আড্ডা মেরে গেছেন। নকশালরা আড্ডা যতটা জমাতে পারত, অন্য রাজনীতিকরা আড্ডা ততটা জমাতে পারত না। কংগ্রেসিদের কোনও দিন এখানে আড্ডা দিতে দেখিনি।

নকশাল আন্দোলনের সময়ে ও সাতের দশকের গোড়া পর্যন্ত কলকাতা কফিহাউজ সরগরম থাকত নকশালদের দলবাজিতে। এক একটা টেবিলে এক একটা গ্রুপ। তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে দলবাজি আর পারস্পরিক নিন্দা-মন্দ বেশি হত।

নকশাল নেতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আজিজুল হকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিতেন। কানু সান্যালের নাম শুনলেই আজিজুলের গায়ে জ্বালা ধরত। আজিজুল হক পরে সেকেন্ড সি সি-তে যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে সেখান থেকেও বিতাড়িত হন। কাকা ওরফে অসীম চ্যাটার্জি সি আর এল আই নামে নতুন একটা

নকশাল গ্রুপ তৈরি করেন। ১৯৯১-এ লেফট ফ্রন্ট-এর সাথে যুক্ত হন। আজিজুল হক বেশ কয়েকবছর হল সিপিআইএম-এর সঙ্গে আছেন। এই সুবাদে বউয়ের চাকরি, নিজের সরকারি ফ্ল্যাট সবই গুছিয়ে নিয়েছেন।

মাঝারি মাপের নকশাল নেতা পাচু রায় নকশালদের ছেড়ে সিপিএম-এ যোগ দেন। এখন আগুনখেকো তৃণমূলী।

একটি মেয়ের নাম মনে নেই; তার বয়কাট্ চুল, খুব সিগারেট খেত, পরের পয়সায় কফি খেত। আর সোচ্চারে স্বীকার করত যে, একজন কনস্টেবলের মুন্ডু কাটতে পারলেই মুন্ডুচ্ছেদের পরিমাণ কয়েকগুণ বাড়িয়ে প্রচারে নামতে হয়। এটা করত নাকি মানুষকে উদ্দীপ্ত করার জন্য।

এসব আড্ডার খবর নিতে আসত পুলিশ। সাদা পোশাকে তারা নজরদারি চালাত। আমরা ওদের বলতাম খোঁচড়।

মাঝে-মধ্যে বোমাবাজির আওয়াজ পেতাম—গাদাম, গাদাম করে। হার্ডিঞ্জ হস্টেল ও হিন্দু হস্টেল থেকে বোমা ছোড়া হত। এরপরই পুলিশ গুলি চালাত। বাইরে তখন হুলস্থুল কাণ্ড। কফিহাউজে উত্তেজনা ছড়াত। পরে এই বোমাবাজি নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে গেছিল। কফিহাউজও আর খুব একটা চমকাত না। যথারীতি আড্ডা চলত। সময় বুঝে যে যার বাড়ি বা অন্য কাজে চলে যেতাম।

একবার এই হার্ডিঞ্জ হস্টেল থেকে ধরা পড়ল একটি ছেলে ও মেয়ে। ছেলেটি তার রুমে মেয়েটিকে নিয়ে ইয়ে করছিল। কাজ শেষে ছেলেটির কয়েকটি স্টুডেন্ট বন্ধু ইয়ে করার শেয়ার চাইল। তাতেই হুলস্থুল কাণ্ড বাধল।

মেয়েটি ফর্সা, দেখতে সুন্দরী, স্লিম, মীনাক্ষী। সেও ঘাবড়ে গেল। হস্টেল সুপার ছেলেদের কলেজে মেয়ে ঢোকা বন্ধ করে দিলেন।

রাজনীতিকদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আমার বেশি ভাল লাগত। তবে সাহিত্যিক, নাট্যকারদের সঙ্গেও হইহই করে আড্ডা দিতাম। বিভিন্ন রকম ম্যাগাজিনের লেখা বিনিময় হয়। প্রকাশিত ম্যাগাজিনের কপি বিনিময় হয়। লেখাপত্র নিয়ে আলোচনা হয়। কফির পেয়ালায় চুমুকের সঙ্গে সঙ্গে আড্ডাও জমজমাট হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-অভাব-অভিযোগের খবরও শেয়ার করা হয় আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে। ঘনিষ্ঠতা, হৃদ্যতা বাড়ে। একটা প্রাণোচ্ছল আড্ডাবাজিতে কফিহাউজে সময় গড়িয়ে রাত হয়।

প্রতি শনি ও মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় সাহিত্যিকদের আড্ডায় আমিও মাঝে-মাঝে যাই। ওই আড্ডায় হাজির হন ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, ভগীরথ মিশ্র,

স্বপ্নময় চক্রবর্তী, বলরাম বসাক, শচীন দাস, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, তিলোত্তমা মজুমদার, অনীতা অগ্নিহোত্রী, আয়েশা খাতুন, অর্ণব বিশ্বাস, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, রমানাথ রায়, অভিজিৎ সেন, শেখর বসু, আফসার আহমেদ প্রমুখ।

এই আড্ডাটা এখনও চলে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার-রা ক্বচিৎ কদাচিৎ এখানে আসতেন। কফির প্রতি ওঁদের টান কম ছিল। ওরা নিয়মিত আড্ডা দিতেন খালাসিটোলায় দেশি মদের দোকানে।

অধ্যায় : উনিশ

আমার বইমেলা

মধ্য সত্তর। এরাজ্যে রাজনৈতিক ডামাডোল চলছে। এমারজেন্সি, খুন-খারাপি, বোমাবাজি, ইত্যাদি। এর মধ্যেই সুনীলদার কাছে খবর পেলাম বইমেলার উদ্যোগ নিচ্ছেন তাঁরা। সহযোগিতায় পাবলিশার্স ও বুকসেলাররা। সুনীলদা ও পরে শ্যামলদা আমায় বললেন, তুই আমাদের সঙ্গে থাকবি। আমিও থাকলাম।

সে সময়ের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় ময়দানের অংশ ছেড়ে দিলেন বইমেলার জন্য। ১৯৭৬-এ শুরু হল বইমেলা। প্রধান উদ্যোক্তা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, দিব্যেন্দু পালিত প্রমুখ। ৫৪ জন প্রকাশক ও বইবিক্রেতা বইমেলাটিতে অংশ নিয়েছিল। কলকাতার বুকে নতুনত্বের ছোঁয়া লাগল।

এই মেলায় যত না প্রকাশক, তার চেয়ে যেন লেখক বেশি। প্রচুর পাঠক-পাঠিকা আসত। প্রকাশক, লেখক, পাঠক-পাঠিকা মিলে জমজমাট আড্ডা চলত। পাঠক-পাঠিকারা লেখকদের হাতের কাছে পেয়ে কত না প্রশ্ন করতেন। প্রিয় লেখকদের পেলে ছেঁকে ধরতেন। লেখকরা হাসি মুখেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। চলত গল্পগুজব।

মঞ্চ বেঁধে লেখকদের আলোচনার আসর বসত। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল।

বনফুল আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে বললেন, আধুনিক কবিতা কিছু বোঝাই যায় না। অতি দুর্বোধ্য।

এরপরে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মঞ্চে উঠে বললেন, আধুনিক শিল্প-কলা বুঝতে গেলে ধারাবাহিকভাবে শিল্পকলা সৃষ্টির অগ্রগতি যেমন বুঝতে হয়, তেমন কবিতার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। পরম্পরাকে জানতে হয়, বুঝতে হয়। এখন কিছু নিতম্বপক্ক কবি এসেছেন, যাঁরা আধুনিক পরম্পরা না বুঝেই 'ওসব কবিতাই নয়' বলে চেঁচাচ্ছেন।

পেইন্টারদের জন্য একটা আলাদা জায়গা দেওয়া হয়েছিল। নাম 'মমার্ত'।

এখানে পেইন্টাররা ছবি আঁকতেন। দর্শকরা দেখতেন। কেউ কেউ নিজের ছবি আঁকাতেন। খোলামেলা জায়গায় শিল্প ফুটে উঠত। আর, এখন সারা মেলা জুড়েই মমার্ত।

এখানে বিনে পয়সায় মঞ্চ পাওয়া যেত। মঞ্চে লিটল ম্যাগাজিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হত। হত শিল্প-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা।

লিটল ম্যাগাজিন বসত এক একটা বড় ছাতার তলায় চারটে করে টেবিল পেতে। সামনে খোলামেলা অনেকটা জায়গা। সেখানে বসত আড্ডা। এছাড়াও বেশ কিছু লেখক তাঁদের লেখা ছোট বই, পত্রিকা ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন।

আর এখন লিটল ম্যাগাজিনের জায়গা সংকীর্ণ হতে হতে এমন হয়েছে যে পাছা ঘোরাবার জায়গাই নেই। পাঠক-পাঠিকারা যে সুস্থ মতো ঘুরে ঘুরে দেখবেন সেসবের সুযোগই নেই। স্থান কমল সল্টলেকে এসে। শেষে এখন মিলন মেলায় এসে লিটল ম্যাগাজিনের মিলন সুখ আর নেই-ই।

ঘুরে ঘুরে পত্র-পত্রিকা বিক্রি করা নিষেধ হয়ে গেছে।

তখন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাহিত্য-শিল্পকলার মানুষদের রমরমা। বলতে গেলে মেলার শুরু থেকে শেষ যাবতীয় সব কিছুতেই লেখক, পেইন্টার, নাট্য ব্যক্তিত্বদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ঘণ্টা বাজিয়ে উদ্বোধন হত। এখনও ঘণ্টা বাজিয়ে উদ্বোধন ও সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২০০৬ পর্যন্ত ময়দানেই হল বইমেলা। কলেবর বৃদ্ধি পেল। নিয়মকানুন যুক্ত হতে লাগল। সহজ-সরল ভাবটা, নির্ভেজাল আড্ডাবাজিটা উধাও হতে থাকল। আয়োজন থেকে উদ্বোধন, পরিচালনা থেকে সমাপ্তি, মেলায় আসা যাওয়া ও আড্ডা—সবেতেই লেখক, শিল্প-সাহিত্য জগতের মানুষরা কমতে থাকল। এখন বইমেলায় রাজনীতিকদের রমরমা প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। রাজনীতিকদের খপ্পরে পড়ে বইমেলা লাল থেকে সবুজ হয়ে গেল। পাবলিশার্স ও বুকসেলারদের বুকপকেটে ঢুকিয়ে নিল রাজনীতিকরা। লেখকরা হল অপাংক্তেয়। মেলা হারাল শিল্প-সাহিত্যের লেখক-পাঠকের উন্মুক্ত মিলনস্থান, প্রকৃত মিলনমেলা।

অব্যবস্থার নিদর্শন ছিল ধুলো ওড়া সহ অনেক কিছুতেই। ১৯৯৭ সালে বইমেলায় আগুন লাগল। প্রচুর সম্পত্তি নষ্ট হয়। ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রকাশক, বুকসেলারদের। এখন ধুলো নেই। কিন্তু 'বইমেলা বইমেলা' ব্যাপারটা অনেক কমে গেছে।

২০০৭-এ বইমেলা হল সল্টলেক স্টেডিয়ামে। তাও নির্ধারিত সময়ের অনেক পর ফেব্রুয়ারি-মার্চে। ২০০৮-এ এখানেই হল।

২০০৯ থেকে এখনও পর্যন্ত হচ্ছে 'মিলনমেলা' নামক ছোট একটা জায়গায়।

বইমেলায় যুক্তিবাদী সমিতির বই প্রকাশিত হত অডিটোরিয়ামে। বহু লেখক সমাবেশ হত। বহু বিশিষ্ট লেখক ও গুণিজনেরা উপস্থিত থাকতেন।

দু-একটি তথাকথিত 'অলৌকিক' ঘটনা ঘটানো দেখিয়ে আমাদের নতুন বই প্রকাশ হত। এটা ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত হয়েছে।

তারপর হত আমাদের লিটল ম্যাগাজিনের এলাকাতে।

'৮৬ থেকেই যুক্তিবাদী সমিতির স্টল নিতাম। কিন্তু স্টলে সমিতির ছেলেমেয়েরাই ঢোকার জায়গা পেত না। দর্শকদের ভিড়ে-ভিড়াক্কার অবস্থা হত। সুবিধার জন্য লিটল ম্যাগাজিন টেবিলে জায়গা নিলাম। খোলামেলা জায়গা। সামনে সবুজ ঘাসে বসে জমজমাট আড্ডা দিতাম। কাগজ পেতে মুড়ি-চানাচুর মেখে তেলেভাজা সহযোগে খাওয়া চলত। আড্ডার তালে তালে মুঠো মুঠো মুড়ি শেষ হত।

প্রতিবারই বইমেলার একটা বিশেষ সংখ্যা বেরত যুক্তিবাদীর। প্রচুর বিক্রি হত। এখনও বের হয়। আমাদের ওয়েবসাইটেও প্রতিটি ইস্যু দেওয়া হয়। প্রতিটি ইস্যুই ডাউনলোড হয় প্রায় হাজার দশেক। বইমেলাতে লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে আমাদের বইপত্রই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়ে আসছে।

২০১২-র বইমেলাতে ২০০ লিটল ম্যাগাজিন ও ৬০০ বইবিক্রেতা ছিল। মোট বিক্রি ১৬ কোটি টাকার ওপরে। আমাদের পত্রিকা বিক্রি হয়েছিল সন্দেহাতীতভাবে বেশি। ২০১৪-তেও ৬০০ প্রকাশক ও ২০০ লিটল ম্যাগাজিন বসেছে। যতদূর খবর পেলাম লিটল ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে আমাদের বইপত্রই বেশি বিক্রি হয়েছে।

একদিন বইমেলায় আমরা জনা চার-পাঁচেক দল বেঁধে ঢুকছি। একজন এগিয়ে এসে বললেন, প্রবীরদা আপনার সব বই পড়েছি, দারুণ লেগেছে।

বললাম, আমার লেখা বিদেশে বিবেকানন্দ পড়েছ?

—হ্যাঁ, দারুণ লেগেছে।

—আর কালো ভ্রমর?

—হ্যাঁ, দারুণ।

আমার সঙ্গীসাথীরা কেউ হাসতেও পারছে না। তারপর আমি গম্ভীর হয়ে ওকে বললাম, আচ্ছা ভাই তুমি এসো, তোমার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল।

আর একবার গণদর্পণের ব্রজ রায় কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির হলেন। ঝোলা থেকে একটা বই বার করে আমাকে দিয়ে বললেন, এই নিন আপনাকে বইটা দিলাম।

বইটি সাদরে গ্রহণ করে বললাম, ধন্যবাদ।

তিনি বললেন, দেড়শো-টা টাকা দেবেন।

বললাম, ও বাবা, আপনার বই আপনিই নিন। কেন বললেন, বইটা দিলাম? এ তো আমিই পয়সা দিয়ে কিনছি। ধন্যবাদটা উইথড্র করে নিচ্ছি বলে দেড়শো টাকা দিয়ে দিলাম। উনি নির্বিকার চিত্তে টাকাটা নিয়ে নিলেন।

মেয়েটির নাম মিলি। আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ বইমেলায়। ফর্সা, মোটাসোটা, তরুণী। ডবল এম এ বা ট্রিপল এম এ কিছু একটা হবে।

সেই যে আলাপ হল, সে তো জোঁকের মতো আমার গায়েই লেগে রইল।

একদিন বলল, একটা ঘর ভাড়া নিচ্ছি, মাঝে-মধ্যেই তুমি আমার বাড়িতে এসে থাকবে।

সেদিনই আমি মিলির দুর্গাপুরের বাড়িতে ফোন করলাম। ওর মা আর বোনকে জানালাম গোটা ব্যাপারটা। তারপর থেকে মিলি আমার সঙ্গে দেখাও করতে আসে না, কথাও বলে না।

আমিও বেঁচে গেছি।

এই বইমেলাতেই পরিচিত হলাম আমার বহু পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে।

২০১২-তে আমাকে একজন ফোন করে বললেন, প্রবীরবাবু, আমার ছেলে আপনার খুব ফ্যান। আপনি ওকে ২০০৭-এ অলৌকিক, নয় লৌকিক বইটা প্রেজেন্ট করেছিলেন। নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন 'সুনীলকে শুভেচ্ছা সহ প্রবীর ঘোষ'।

বললাম, না, আমার একটুও মনে নেই। প্রতি বইমেলাতে হাজার হাজার মানুষ আমার বই কেনেন। তাতে তাদের অনুরোধে এরকম কথা লিখেও দিতে হয়। তার মানে এই নয় যে, আমি কাউকে প্রেজেন্ট করেছি।

বাংলাদেশে নববর্ষের অনুষ্ঠানে ঢাকায় গিয়েছি। ও-দেশের এক বিখ্যাত গায়িকা আমার পরিচয় পেয়েই বললেন, আপনি আমার খুব প্রিয় লেখক।

আমি সত্যি কথা বললাম, আপনিও আমার প্রিয় গায়িকা।

বললেন, আপনি কোথায় উঠেছেন?

বললাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউজে।

—তাহলে চলুন একসঙ্গে কয়েক ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে ফিরব।

আমি একতরফা ভাবে ওনাকে এড়াবার পরও কলকাতায় ফিরে ওর একটা দীর্ঘ চিঠি ও বেশ কিছু ছবি পেয়েছিলাম।

আমার প্রিয় বন্ধুকে চিঠিটা পড়তে দিয়েছিলাম। তারপর চিঠি ও ছবিগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।

কলকাতার বইমেলা ছাড়াও বিভিন্ন জায়গার বইমেলাতেও আমাকে যেতে হয়েছে অতিথি হয়ে। এখন তৃণমূল সরকার আসার পর, শুধু রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীরা বইমেলায় জাঁকিয়ে থাকেন। আমরা অপাংক্তেয়।

এখন তো প্রতিটি জেলায় বইমেলা হয়। আমাদের সমিতি বিভিন্ন বইমেলাতে অংশ নেয়।

আর রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের শুরুতেই লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলা হয় রবীন্দ্রসদন চত্বরে। ছোট ছোট স্পেসে বসতে হয়। তবে হইহই ভালই হয়। এখন এই মেলারও দখল নিয়েছে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা।

পূর্ব-পাকিস্তানে নকশাল আন্দোলন

১৯৭০-'৭১ থেকেই খবর পাচ্ছিলাম—পূর্ব-পাকিস্তানের কিছু সাম্যকামীরা দেশটিকে স্বাধীন করতে অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তখনকার রাজনৈতিক দলগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়—(১) পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে বিশ্বাসী ও (২) যারা বুর্জোয়া নির্বাচনে বিশ্বাস করে না, গোপনে কাজ করে। দ্বিতীয় দলে পড়ত কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) এবং পূর্ব-বাংলার সর্বহারা পার্টি। এর মধ্যে প্রথম দুটি পার্টি ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত একই ছিল। তারপর আলাদা হয়ে গেল।

পূর্ব-পাকিস্তানের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলদুটি তখন ও-দেশের জনগণকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। 'কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী' দলের নেতা ছিলেন মোহাম্মদ কোয়াহা। আর, 'পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)'র নেতা ছিলেন আলাউদ্দিন মতিন।

পূর্ব-পাকিস্তান তখন আধা সামন্ততান্ত্রিক-আধা উপনিবেশিক দেশ। ওই দুটি নকশাল দলের সঙ্গে ভারতের নকশাল দলের যথেষ্ট মিল ছিল। ওরাও শহরাঞ্চলে ক্রমাগত অ্যাকশন—মূর্তি ভাঙা, স্কুল পোড়ানো আর ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি শুরু করেছিল। কিছু দুর্নীতির কারণে গরিবির তলানিতে পৌঁছনো পূর্ব-পাকিস্তানের এই লড়াকু মানসিকতাকে সমর্থন জানিয়েছিল বহু সংখ্যক পূর্ববাংলার মানুষ। এই দুটি বিপ্লবী দলের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তাত্ত্বিকভাবে তাদের তৈরি করার জন্য সামান্য কিছু প্রয়াস নিয়েছিলাম। কিন্তু 'পূর্ব-বাংলার সর্বহারা পার্টি' (সিরাজ শিকদার)-এর সঙ্গে আমার কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না।

তখন আমার মনে হয়েছিল, দুই নকশাল দলই পাকিস্তান সেনাদের শাসন থেকে পূর্ব-বাংলাকে মুক্ত করবে। একই কথা মনে হয়েছিল রাশিয়া এবং আমেরিকারও। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিকসন তার প্রতিনিধি হিসেবে ম্যাকনামারাকে পাঠালেন নয়াদিল্লিতে। তিনি ইন্দিরার সঙ্গে বসলেন। বোঝালেন, পূর্ব-পাকিস্তান কিন্তু পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর সেখানে রাজ করবে নকশালরা।

আপনি তৈরি থাকুন, আমাদের সবুজ সঙ্কেত পেলে সেনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন পাকিস্তানি সেনাদের ওপর। ও-দেশের নকশালদের ঝাড়ে-বংশে শেষ করুন। ইন্দিরা জানতে চেয়েছিলেন, আপনাদের সঙ্গে পাকিস্তানের যে যুদ্ধ চুক্তি আছে। পাকিস্তান আক্রান্ত হলে তো আপনারা ওদের সাহায্য করতে সেনা পাঠাবেন।

ম্যাকনামারা অভয় দিয়ে বললেন, কোনও চিন্তা নেই। আমাদের সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে ঘোরাঘুরি করবে। কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে কিছু করবে না।

ইন্দিরা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বললেন। প্রেসিডেন্ট জানালেন, হ্যাঁ অবশ্যই ঝাঁপাবেন। নচেৎ চিনপন্থী নকশালরাই ওখানে ক্ষমতা দখল করবে।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ মুজিবর রহমান আবেগপূর্ণ ভাষণে লাঠি, হাতা, খুন্তি নিয়ে জনগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। এদিকে মুজিবর রহমান পাকিস্তানের শাসক ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলি ভুট্টো-র সঙ্গে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে গেলেন। তাঁর দাবি, আমাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হোক। তাহলেই দেখবেন পূর্ব-পাকিস্তানে শান্তি বিরাজ করবে।

'প্রচারে জাতির জনক মুজিব' তখন এক অসাধারণ পরিকল্পনা নিলেন। মুজিব তাঁর বাড়িতেই থেকে গেলেন। পাকিস্তান বাহিনী ২৫ মার্চ রাতেই মুজিবকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করল বিনা বাধায়। সামরিক বাহিনী বিপ্লবী ও নিরীহ মানুষদের ওপর আক্রমণ চালাল। ভারত সরকার পাকিস্তানে সেনা পাঠাবার আগে থেকেই পূর্ব-বাংলার জনস্রোত আছড়ে পড়ল এপার বাংলায়। পূর্ব-বাংলার অস্থায়ী রাজধানী পশ্চিমবঙ্গের মুজিবনগর। মুজিবনগর আকাশবাণী থেকে প্রচারিত হতে লাগল রেডিওর খবর। এপার বাংলার গায়করা বিপ্লবী গান গাইছেন। আর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগঘন কণ্ঠে বক্তব্য রেখে মাতিয়ে দিচ্ছেন। মুজিব কন্যারা তখন বাঙ্গুর এভিনিউয়ের পিছনের দিকে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়ির পাশেই থাকতেন।

সে কী যুদ্ধ হল রে বাবা। ভারতীয় সেনারা পূর্ববঙ্গে পা রাখতেই দমদমের বড় মস্তান থেকে কচিকাঁচা-কুচো মস্তানরাও পূর্ববঙ্গে দৌড়ল। সেখান থেকে বিড়ি-সিগারেট কিনে এনে দেখাতে লাগল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তু হয়ে এপারে এল। তাদের ভরণপোষণের জন্য ভারত সরকার UNO থেকে মোটা অর্থ সাহায্য পেল। কংগ্রেস ও সিপিএম ক্যাডাররা ওষুধপত্র ও 'ডোল' দেওয়ার দায়িত্ব নিল। আর এসব স্বেচ্ছাসেবীদের একটা বড় অংশই ওই উদ্বাস্তু নারীদের নেকড়ের মতো খুবলে খেতে লাগল ডোলের বিনিময়ে।

তারপর পূর্ব-বাংলাকে স্বাধীনতার নামে ভারতের উপনিবেশ করল ইন্দিরা।

১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি মুজিব বাংলাদেশে পদার্পণ করলেন এবং নিজেই হয়ে গেলেন স্বঘোষিত 'জাতির জনক'। এটা স্বঘোষিত 'জ্যোতিষ সম্রাট'দের মতোই ঘটনা আর কী!

ইন্দিরা ও সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের কংগ্রেস ও জ্যোতি বসুর সিপিএম পার্টি জোটবদ্ধভাবে এপার বাংলার নকশাল নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সেই সময় দেখলাম দমদম পার্ক স্কুলে মিলিটারি ক্যাম্প। একদিন সকালবেলায় হইহই করে একদল সেনারা আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলল। সারা বাড়ি তোলপাড় করেও মার্কস-লেনিন-মাও-এর কোনও বই পেল না, কোনও অস্ত্রও পেল না। দেখল, আমি একটি কচি বউকে নিয়ে সংসার করছি, আর স্টেট ব্যাঙ্কের চাকরি করি তার পরিচয়পত্র। দেখার পরও আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। বলল, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেবে। মা-দিদি-বোন তাদের চেল্লামেল্লির মধ্যেই বউ সীমা অজ্ঞানের অভিনয় করে ধুপ্পুস করে পড়ে গেল। এ'সব দেখে ও সিপিএম-রা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা খবর দিয়েছে ভেবে সেনারা ফিরে গেল। বাড়ির লোক স্বস্তি পেল।

আমার বই কখনও বাড়িতে থাকত না, থাকত আমার মগজে।

নকশালনীতির ভ্রান্তি

নকশালদের পরিকল্পনাহীন ব্যক্তি সন্ত্রাস লাইনের মধ্য দিয়ে যে সাম্য আসবে না, তা নিশ্চিত হয়েছিলাম। ভাঙতে গেলে পরিবর্তে কী গড়ব তারও একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। সেই পরিকল্পনাহীনতার জন্য নকশাল দলে প্রচুর সমাজবিরোধী ও পুলিশের ইন্‌ফরমার ঢুকে গেল বা ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোনও প্রয়োজনীয়তাই নকশাল নেতারা ভাবলেন না।

আমার মধ্যে একটা দৃঢ় প্রত্যয় ছিল—"বিপ্লবের আগে, বিপ্লবের সময় ও বিপ্লবের পরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই।"

এই কথাটা আমার নয়, মাও-এর।

কানু সান্যাল, খোকন মজুমদার পিকিং গিয়েছিলেন মাও-এর সঙ্গে দেখা করতে। মাও তাঁদের সঙ্গে দেখাই করেননি, আমি যতদূর জানি। আমরা আমজনতা জানি, তাঁদের মতো আরও অনেকেই পিকিং গিয়েছিলেন মাও-এর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু মাও যে তাঁদের প্রায় কারও সঙ্গেই দেখা করেননি, সে কথাটা আমজনতা জানতে পারেনি। এ-সেই 'অশ্বত্থামা হত, ইতি গজঃ'র মতো ব্যাপার।

চারু মজুমদার গ্রেপ্তার হলেন ১৬ জুলাই ১৯৭২ এবং পুলিশ হেপাজতে মারা

যান ২৮ জুলাই ১৯৭২ সালে।

১৯৭২'-৭৭ নকশালদের উপর ত্রিমুখী আক্রমণ হানা হয়। সিপিএম, কংগ্রেস এবং পুলিশ ও আধাসেনা মিলিতভাবে নকশাল নিধনে মেতে উঠে। এই ঠান্ডা মাথায় গণহত্যা ছিল স্পষ্টতই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। যার নেতৃত্বে ছিলেন জ্যোতি বসু, সিদ্ধার্থশংকর রায় ও ইন্দিরা গান্ধী।

সারা বাংলা জুড়েই নকশাল নিধন চলতে থাকল। বরাহনগর-কাশীপুর, বেলেঘাটা, কৃষ্ণনগর সহ বহু জায়গায় নকশাল নিধন করেছে এই ত্রিমূর্তি।

বহু চেনা মুখ, বন্ধু আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেল। সে বর্ণনা দিতে গেলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।

এই নিধন যজ্ঞের অন্যতম তান্ত্রিক জ্যোতি বসুর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করছি

জ্যোতি বসু দীর্ঘ সময় ধরে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তাঁর পার্টির মস্তানির জোরে। তাঁর কৃপাধন্য ও পার্টির কৃপাধন্য তোষণকারীদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। পার্টি ক্ষমতা হারালেই তাঁর জনপ্রিয়তা কর্পূরের মতো উবে গেল কেন?

জ্যোতি বাবুর মহৎকর্ম গ্রামাঞ্চলে ভূমি সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া। এই ভূমি সংস্কারের কারণেই তাঁর পার্টি গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের কাছে 'অনাথের নাথ' হয়ে উঠেছিল। তবে তা মাত্র পাঁচ বছরের জন্য। বণ্টন করা হয়েছিল মোট খাস করা জমির মাত্র ১৩ শতাংশ। এই কাজ পাঁচ বছরের মধ্যে বন্ধ করে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ক্যাডার নির্ভর প্যারালাল প্রশাসন গড়ে তুললেন। পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব, পাড়া, সমিতি, মন্দির কমিটি, পূজা কমিটি, ইদ কমিটি, স্থানীয় পুলিশ দপ্তর, সমবায়, ইস্কুল, কলেজ, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান থেকে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সমস্ত জায়গায় সমস্ত স্তরে পার্টির ইনফর্মার ঢুকিয়ে ছিলেন। সব জায়গাতেই সিপিএম। শুধু সিপিএম। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিল পার্টির লাল চোখের দাপট।

পাড়ায় কে এল, তো খবর চলে গেল পার্টির অফিসে। কে কাকে বিয়ে করবে বা বিচ্ছেদ করবে, কে কোথায় ভাড়া থাকবে, কার বাড়িতে ভাড়াটে উচ্ছেদ হবে কারটা হবে না, কার জমিতে কী বোনা হবে ও তা কোথায় বিক্রি করতে হবে, স-ব সামলাত পার্টি ইনফর্মারদের থেকে খবর নিয়ে। এমনকী কার বাড়িতে কী রান্না হয়, বা কার বাড়িতে সুন্দরী মেয়ে আছে, কার বউ দুপুরে বা রাতে একা থাকে—এসব খবরই পার্টির লোকাল তান্ত্রিকদের জানতে হত। সেই মতো যা কিছু জল-স্থল-অন্তরীক্ষের সবকিছুকেই পার্টির থাবার তলায় রাখতে হবে না! নচেৎ লুটেপুটে খাবে কী করে 'কামরেড'-রা!

এটাই ছিল জ্যোতি বসুর প্রথম ভুল।

শুরু হল পার্টি সন্ত্রাসের যুগ। পঞ্চায়েত রাজনীতিতেও লাগামছাড়া দুর্নীতি ও পার্টি ডিক্টেটরশিপের কলঙ্কের নায়ক জ্যোতি বাবুই। সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের উপর বর্বরোচিত রাষ্ট্রীয় ও পার্টি সন্ত্রাস নামালেন জ্যোতি বসু।

এর আগে দেশ বিভাগের কারণে আগত উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানোর তীব্র বিরোধিতা করেছিল কমিউনিস্টরা।

বাংলাভাষী উদ্বাস্তুদের এই বঙ্গেই রাখতে হবে—এই দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। এও বললেন, ২৪ পরগনার সুন্দরবনে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। সুন্দরবনের বনজ সম্পদ ও মাছ ওদের স্বনির্ভরতা দেবে।

১৯৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি দণ্ডকারণ্যের কাছে ভিলাইতে একটি সভা করতে গিয়েছিলেন জ্যোতি বসু। সেখানে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু নেতাদের ডেকে পাঠান। তাঁদের বলেন—সিপিআইএম ক্ষমতায় এলে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে। সুন্দরবনে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

১৯৭৮ সালে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের বহু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে এবং সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে চারটি করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে মাথায় দরমার চাল বানিয়ে আস্তানা গড়ে তোলেন। তাঁদের ভরসা ছিল জ্যোতিবাবু ও তাঁর কমিউনিস্ট সরকারের উপর। দণ্ডকারণ্যে সরকারি 'ডোল' বা খয়রাতি সাহায্য পেতেন উদ্বাস্তুরা। সুন্দরবনে এলেন, ডোল বন্ধু। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনও 'ডোল' দিল না। উদ্বাস্তুরা ঠিক করলেন—নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেবেন।

যেমন ভেবে এসেছিলেন, তেমনটি ঘটল না। বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সাফ জানিয়ে দিলেন, তোমাদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে হবে। উদ্বাস্তুরা ভাবলেন, জ্যোতিবাবু ওসব 'কথা'র কথা বলছেন। সরকারে থাকলে অমনটা বলতে হয়। আসলে তিনি চান আমরা এখানেই থাকি। 'ডোল' বন্ধু। খাবার নেই একদানা। নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করার সামান্য পুঁজি নেই। অভুক্ত মানুষগুলোর আর্তচিৎকারে খাবার, পানীয়, ওষুধ ও কাপড়-চোপড় নিয়ে হাজির হল ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও রামকৃষ্ণ মিশন। উদ্বাস্তুরা স্বয়ম্ভর হবার জন্য তখন মাছ ধরা, মধু সংগ্রহ ও কাঠ সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। মাথা উঁচু করে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকলেন।

বামফ্রন্ট সরকার বাধ্য করল ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও রামকৃষ্ণ মিশনকে ওখান থকে চলে যেতে। উদ্বাস্তুরা কোনও বাজারেই যাতে কেনা-বেচা না করতে পারে, তার জন্য অবরোধ তৈরি করল।

১৯৭৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বামফ্রন্ট সরকার বড়সড় পুলিশি অভিযান চালাল। উদ্বাস্তুদের ২০০টি মাছ ধরা নৌকো ডুবিয়ে দিল। খাবার-দাবার ও জ্বালানি কাঠে আগুন ধরিয়ে দিল। বাঁধ দিয়ে মাছ চাষের জন্য ভেড়ি তৈরি করেছিলেন

উদ্বাস্তুরা—তা কেটে দিল বনবিভাগের কর্মী ও পুলিশ।

এরপর নিরস্ত্র, অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষগুলোর উপর নেমে এল বন্দুকের গুলি ও বেয়নেটের কোপ। কেউ কেউ বাঁচলেন পালিয়ে। ছড়িয়ে পড়লেন বারাসাত, কদম্বগাছি, বনগাঁ লাইনে।

স্বয়ম্ভর গ্রামগুলোকে উদ্বাস্তু বানালেন জ্যোতি বসু। এ তার ক্ষমাহীন দ্বিতীয় ভুল।

জ্যোতিবাবুর সময়ে হাজার হাজার ছোট ও মাঝারি কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায় ভয়াবহ লোডশেডিং ও সিপিএম পার্টির জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নের অত্যাচারে। *এটা হল তৃতীয় ভুল।*

জ্যোতিবাবুর চতুর্থ ঐতিহাসিক ভুল—স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি তুলে দেওয়া।

পঞ্চম ঐতিহাসিক ভুল—মন্দির কমিটি, ক্লাব, স্কুল, ইউনিভার্সিটি সবকিছুকেই গায়ের জোরে দখল করা। মধ্যমেধার অনুপযুক্তদের প্রতিটি সরকারি উচ্চপদে বসিয়ে পার্টির চাকর বাকর তৈরি করা। এসবই করেছে পার্টি এবং তিনি মুখ্য প্রশাসক হয়েও কিচ্ছুটি করেননি। প্রশাসনকে সৎ করতে চাননি। অসৎ-ই রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি শুধু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন সিপিএম এর মুখ্যমন্ত্রী।

একটি ঐতিহাসিক ঠিক কাজ তিনি করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ফাঁদে পা দেননি বা দিতে পারেননি।

জ্যোতি বসু ভারতের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের একজন আদর্শ রাজনৈতিক চরিত্র। তিনি বুঝেছিলেন, শ্রেণিবিভক্ত এই দেশে ধনীদের টাকায় ভোট লড়তে হবে। গরিবদের ভোটে গদি দখল করতে হবে। লক্ষ্য গদি, সাম্য নয়।

অধ্যায় : একুশ

আমার জীবনের সাত-এর দশক

১৯৭৪ সাল। বাংলায় ডামাডোল চলছে। একদিকে নকশাল নিধন। অন্য দিকে সিপিএমের জঙ্গিপনা। সে এক অরাজক অবস্থা। নাভিশ্বাস উঠছে জনসাধারণের। এমন একটা ভয়ঙ্কর সময়ে লেডি ডাফরিন হাসপাতালে সীমাকে ডিউডেটের কিছু আগে ভর্তি করালাম। সীমার প্রেসার অনবরত বেড়ে যাচ্ছিল, কিছুতেই কন্ট্রোলে আসছিল না। লেডি ডাফরিনের সুপার আমার আত্মীয়া। ওনার কথা অনুযায়ীই, সীমাকে ডিউ ডেটের দশ দিন আগে ভর্তি করিয়েছিলাম। ওই হাসপাতালে আত্মীয় ছাড়া অন্য কাউকে Attendant রাখা যায় না। ডাক্তার গ্রিন সিগন্যাল দিলেন। বললেন, মনে হচ্ছে দু-একদিনের মধ্যেই আপনার সন্তান জন্ম নেবে। একজন Attendant-এর ব্যবস্থা করুন। আমার মা, বড়দি, মেজদি কেউই থাকতে রাজি হলেন না। তখন আমার পরম সু-হৃদ গণেশ হালুই-এর স্ত্রী ডলি বউদি আনন্দে রাজি হলেন এবং খুব ক্রিটিকাল সময়ে উনি তিনদিন Attendant হয়ে থাকলেন। এর মধ্যে আমার প্রথম ও একমাত্র ছেলে জন্মাল কলকাতার লেডি ডাফরিনে। সময়টা কালীপুজোর রাত।

পরদিন সকালে হাসপাতালে যেতেই ডাক্তার বললেন, আপনি বাড়ি চলে যান। বাড়িতে এসে দেখি কয়েক'শ লোকের ভিড়। কী? না, থানা থেকে পুলিশ ম্যাসেজ নিয়ে গেছে— ছেলে মারা গেছে।

আমার বন্ধু-বান্ধব, পড়শিরা অনেকে মিলে হাসপাতালে গেলাম। শুনলাম ছেলের মুখ দিয়ে ও মলদ্বার দিয়ে কালো রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাইতে অনুমান করেছিল ছেলের মৃত্যু অবধারিত। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ছেলে বাঁচল।

ধীরে ধীরে বড় হল। আমার অশান্ত জীবন দেখে ছেলে ভয় পেত। ভাবত যে-কোনও দিন 'বাবা'কে হত্যা করা হবে। ওর এই ভয় কাটাতে ললিত সাউ-এর ক্যারাটে ক্লাসে ভর্তি করে দিলাম। তখন ও ক্লাস সিক্স। দমদম সেন্ট মেরিজ স্কুলে পড়ে।

খাই-না-খাই ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াবই, এটা ঠিক করে নিয়েছিলাম অফিস জীবনে।

তখন বিল ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। একজন বড়বাজারের ব্যবসায়ী একটা মোটা টাকার ঘাপলা করল। বিল কালেক্টররা পটিয়ে পাটিয়ে তাকে এখানে নিয়ে এল। চোর ধরা পড়েছে। ইনচার্জ তাকে বেআইনি কাজের জন্য পুলিশে দেবেন হুমকি দিতে, সে এমন তুখোড় ইংরাজি বলতে লাগল যে, ইনচার্জ দু'খিলি পান মুখে পুরে চিৎকার করতে লাগলেন, 'লাস্ট ওয়ার্নিং লাস্ট ওয়ার্নিং গেট আউট গেট আউট'।

তখনই ঠিক করে ফেললাম, খাই-না-খাই ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াব।

তখন আমি দেবীনিবাসে থাকি। '৭৮-এর বন্যার পরেই চলে এসেছিলাম দমদম পার্কের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে। কারণ, দিদি এবং বোনেরা এত সুন্দর ব্যবহার করতেন যে আর টিকতে পারিনি।

দেবীনিবাসে তখন আড্ডা মারার মতো বন্ধু জোটাতে পারিনি। বলা ভাল জোটাতে চাই-ই নি। কারণ, রাজনীতি, অফিস, খেলার জগৎ, নাট্যজগৎ, লেখালেখি, পড়াশুনা, সাহিত্যসভা, বইমেলা, বিভিন্ন জায়গায় আড্ডা, গুরুবাজিদের শিকার অভিযান—এসব নিয়েই সময় চলে যেত। আমার বাড়িতে আড্ডা বসত। রবিবারের আড্ডায় আসতেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ। হইহই আনন্দ, আলোচনা, গল্পে সময় কেটে যেত। সমৃদ্ধ হতাম সকলেই।

বাকি সময়টা ছেলের পিছনে যেত। ছেলে পিনাকীর তখন বছর পাঁচেক বয়স। বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে।

পিনাকীর ছোট্ট বয়স থেকে ঘুরতে যেতাম। আমি, সীমা ও পিনাকী। তবে সেটা আর পাঁচটা সাধারণ ঘোরার মতো নয়। রথ দেখা ও কলা বেচা দুটোই করতাম।

একবার আমরা তিনজন চিড়িয়াখানায় গেছি। চিড়িয়াখানার ভিতরে আমার কোলে পিনাকী। হঠাৎ সে তারস্বরে চিৎকার শুরু করল। সে আর থামে না। এই দেখে আমার চারপাশে ছোটখাটো জটলা জমে গেল। লোক ভাবল আমি ছেলেধরা। পিনাকী আমার কোলে ছটফট করছে। জটলার কিছু লোক আমাকে এই মারে তো, ওই মারে। জটলা থেকে কৈফিয়ত চাওয়ার সুরে প্রশ্ন গর্জন ধেয়ে এল—ছেলেটা কে?

বললাম, আমার ছেলে।

—তাহলে অত চেঁচাচ্ছে কেন?

—ওর মা জল আনতে গেছে। মা-কে না দেখে চেঁচাচ্ছে।

—সব বাজে কথা। কেউ সঙ্গে নেই। বাচ্চা নিয়ে পালাচ্ছিল ব্যাটা, ধরা পড়ে বলছে নিজের ছেলে। মা-কে না দেখে চেঁচাচ্ছে। এর সঙ্গে খিস্তি খেউড়ও চলছে। চলছে হুমকি শোরগোল।

ভিড় বাড়ছে। কেউ কেউ পুলিশ ডাকার কথা ভাবছে। এমন সময় সীমা ফিরল জলের বোতল হাতে। ওকে দেখে পিনাকী শান্ত হল। ভিড়ও হাওয়া।

পিনাকীকে নিয়ে অনেক সাহিত্য সভা, আড্ডায় যেতাম। যেতাম বইমেলায়, পত্রিকা দপ্তরে।

পরে বহু জায়গায় 'অলৌকিক, নয় লৌকিক' অনুষ্ঠানে আমার সহকারী হিসেবে ছিল।

চারু মজুমদার ও দল বিভাজন

১৯৭০ সাল পর্যন্ত নকশালদের মধ্যে চারু মজুমদারের কর্তৃত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন ছিল না। গণআন্দোলন গড়ে তোলা, গণসংগঠন বাতিল করা, স্কুল-কলেজে আগুন জ্বালানোর প্রশ্নে চারু মজুমদার ছিলেন শেষ কথা। কিন্তু চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর কানু সান্যাল কিছু অতিরঞ্জিত তথ্য দিয়ে নকশালবাড়ির সংগ্রামী ইতিহাসের তথ্যবিকৃতি ঘটিয়েছিলেন।

কানু সান্যাল একটা চিঠি লিখে খোকন মজুমদারকে জানান, দীপক বিশ্বাস চারু মজুমদারের চ্যালা। আবার এই দীপক বিশ্বাসকে দিয়ে কলকাতা কমিটির সম্পাদক কমলেশ সান্যাল ও অগ্নি রায়কে হত্যা করিয়েছিলেন। এই খুনের বদলা হিসেবে কিছু কমরেড আজিজুল হককে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। আজিজুল হক-এর সম্বন্ধে ওদের মত ছিল, হক্ কমিউনিস্ট মতাদর্শ বিরোধী।

এভাবেই খুনোখুনি চলতে থাকে। অন্তর্দলীয় কোন্দল, পরস্পরের প্রতি বিষোদগার চলতে থাকে। অবিশ্বাসের বাতাবরণ ব্যাপকতা পায়।

পরে, সৌরেন বসুর একটি চিঠি উত্তরবঙ্গ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

"জেলে যাবার পর কানুবাবুরা এলিট হিসাবে বন্দি ছিলেন। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর কানুবাবুরা পার্টির সমস্ত বৈদেশিক যোগাযোগের গোপন তথ্য পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন..."

"কমরেড জঙ্গল সাঁওতালের রাজনৈতিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা কানুবাবুরা ব্যবহার করেছেন। শ্রেণি সংগ্রামে অবিচল পথে কানুবাবুরা সন্দেহ আর অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন। জনতা এবং অসংখ্য কর্মীদের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতারণা করেছেন। কানুবাবুর মতাবলম্বীরা শাসক শ্রেণিকে দিয়ে বিপ্লবীদের জেলে হত্যা করার ইন্ধন দিয়েছেন (হাওড়া জেলের হত্যাকাণ্ড), আর কমঃ চারু মজুমদারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে শাসক শ্রেণির কাঁধে চড়ে আলাদা দল গড়েছেন।"

৩০ অক্টোবর, ১৯৬৮। কানু সান্যাল মুই বস্তি থেকে গ্রেপ্তার হন। কানু সান্যাল ছাড়া পাওয়ার পর এতদিনকার ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে আলোচনা না করেই OCCR গঠন করে। তারপরে সিপিআই (এমএল) তৈরি করেন। এর আগে ১৯৭০-'৭১

থেকে সিপিআই (এমএল)-এ ভাঙন দ্রুত হচ্ছিল। ১৯৭২-এর ১৬ জুলাই চারু মজুমদার গ্রেপ্তার হলেন। এন্টালি অঞ্চল থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর গতিবিধি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং তাঁর দলবলই কেউ পুলিশকে খবর দেয় যে, তিনি এন্টালি অঞ্চলে আছেন। সুনির্দিষ্ট খবরে দ্রুত পুলিশ এল এবং চারু মজুমদারকে ধরে নিয়ে চলে গেল। এই পুলিশি হেপাজতেই তিনি মারা গেলেন ২৮ জুলাই ১৯৭২ সালে। যদিও তিনি অসুস্থ ছিলেন, তবু নকশাল নেতাদের অনেকেই মনে করেন যে, তাঁকে স্লো পয়জন করে খুন করা হয় পুলিশি হেফাজতে।

শেষ হল একটা যুগ। ছত্রখান হতে শুরু করল নকশালরা। কারণ, চারু মজুমদার জীবিত থাকাকালীন তাঁর কথাই ছিল নকশালদের শেষ কথা। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পার্টির পরিস্থিতি জটিলে মোড় নিল। দ্রুত থেকে দ্রুততর হল ভাঙন প্রক্রিয়া।

এর সঙ্গে চলল নকশাল নিধনযজ্ঞ। ১৯৭২ থেকে '৭৭ পর্যন্ত নকশালদের উপর ত্রিমুখী আক্রমণ হানা হয়।

বরাহনগরে রাতের অন্ধকারে শ'য়ে শ'য়ে তরুণদের খুন করে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে লাশগুলো গঙ্গায় ভাসানো হয়েছিল। সে সময়ে তরুণ-যুবকরা সন্ধ্যার পর বাইরে থাকাটা নিরাপদ মনে করত না। যে কোনও বাড়িতে যে কোনও সময়ে পুলিশি হানা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই গণহত্যা শিকার তরুণদের বাড়ি চিহ্নিত করেছিল সিপিএম-এর ক্যাডার বাহিনী। বাড়ি থেকে তুলে এনে খুন এবং গুম খুন তখন জলভাত। কেউ বাড়ি না ফিরলেই বাড়ির লোক ভেবে নিতেন—বোধহয় খুন হয়ে গেছে তাঁদের ছেলে। আমাকে মাঝে-মধ্যে গভীর রাতে ফিরতে হত। তবে কোনও দিনই আক্রান্ত হইনি। একদিন এতটাই রাত হয়েছিল যে, মা ভাবলেন নিশ্চয়ই আমি খুন হয়ে গেছি।

যাই হোক, এই নকশাল নিধনযজ্ঞের পিছনে রয়েছে একটি ইতিহাস যা পাঠক-পাঠিকাদের পূর্বেই বলেছি।

এদিকে ১৯৭৩ সাল থেকে আলাদাভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে একটা গ্রুপ, যারা বিহার নির্ভর। এই সিপিআই (এমএল)(লিবারেশন) দলটির নেতৃত্বে ছিলেন চারু মজুমদারের অনুগামী জহর ওরফে সুব্রত দত্ত এবং কানপুর থেকে দুর্গাপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসা বিনোদ মিশ্র। গোপন সংগঠনটি বিহারের ভোজপুর, পাটনা, জেহানাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার চেষ্টা করে। নেতারা ছিলেন আত্মগোপন করে। কারণ পার্টি নিষিদ্ধ ছিল।

এর আগে ১৯৬৯-এ চারু মজুমদারের খতমের রাজনীতিকে হঠকারী পদক্ষেপ, বিপ্লব ও সাম্যের লাইন নয় মনে করে অন্ধ্রের ও পশ্চিমবাংলার যারা সাম্যকামী বিপ্লবী, তারা সাতটি বিপ্লবী গ্রুপ গড়ে তোলে। তাদেরই একটা গ্রুপ

'দক্ষিণ দেশ' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নিজেদের শোধনবাদ ও হঠকারী বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল।

১৯৭৫-এ এই 'দক্ষিণ দেশ' গ্রুপই 'মাওইস্ট কমিউনিস্ট সেন্টার' সংক্ষেপে 'এমসিসি' নামে পরিচিত হয়। এই পার্টিতে নেতৃত্বে ছিলেন অমূল্য সেন, কানাই চট্টোপাধ্যায়, শিবেনজি, রামধর সিং।

কৃষকদের পক্ষে সশস্ত্র সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয় এমসিসি। তারা তিন হাজার একর জমি জোতদারদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে। ওরা গেরিলা মিলিশিয়া এবং ওদের গণআন্দোলনকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চলতে সচেষ্ট থাকেন। ওদের কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলার জঙ্গলমহল ও বিহারের গয়া অওরাঙ্গাবাদ জেলাতে।

১৯৭৭-এ নকশালপন্থীরা গোটা চল্লিশ উপদলে বিভক্ত হল। প্রতিটি উপদলই অন্যকে মুছে ফেলতে চাইল।

১৯৭৫-এর জুন-এ ইন্দিরা গান্ধি বেআইনিভাবে গদি আঁকড়ে থাকার ইচ্ছায় গতি বাঁচাতে জরুরি অবস্থা জারি করেন। এই ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয় নানা মহলে। বিরোধীদের ধরে ধরে জেলে পোরেন ইন্দিরা। নকশালরা তো ছিলই এই দলে। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকদেরও ধরে ধরে জেলে ঢোকালেন ইন্দিরা।

এই ফ্যাসিস্ট সরকারকে উৎখাত করতে ১৯৭৫ সালে কয়েকটি নকশাল গোষ্ঠী একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলে। এই নকশাল ফ্রন্টের নাম 'আন ইন্ডিয়া জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অফ কমিউনিস্ট রেভিলিউশনারিস'।

এই ফ্রন্টে যে সব দল ছিল তারা হল—সেন্ট্রাল অর্গানাইজিং কমিটি অফ সিপিআই (এমএল) ইউনাইটেড কমিটি অফ কমিউনিস্ট রেভিলিউশনারিস অফ ইন্ডিয়া (এম এল), কমিউনিস্ট ইউনিটি কমিটি (এম এল), সিপিআই (এম এল), সত্যনারায়ণ গোষ্ঠী।

১৯৮০-র ২০ এপ্রিল সীতারামাইয়ার নেতৃত্বে অন্ধ্রে তৈরি হল 'পিপলস ওয়ার গ্রুপ'। সংক্ষেপে 'পি ডব্লিউ জি'। বাংলায় বলা হয় 'জনযুদ্ধ গোষ্ঠী'।

১৯৮২ থেকে বিহারনির্ভর নিষিদ্ধ নকশাল গ্রুপ 'সিপিআই (এম এল) (লিবারেশন) জনসংযোগ বাড়াতে একটা প্রকাশ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলে। নাম, 'ইন্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্ট'। সংক্ষেপে 'আই পি এফ'। সিপিআই (এমএল) (লিবারেশন)-এর বর্ষীয়ান নেতা নাগকৃষ্ণণ পট্টনায়ককে আইপিএফ-'র সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে মূল সংগঠনের নেতা জহরের মৃত্যু হয়। এরপর বিনোদ মিশ্র হল সে দলের নেতা। ১৯৮৯ সালের ১০ মার্চ পাটনার গান্ধী ময়দানে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে আইপিএফ। এখানে বিনোদ মিশ্র আত্মপ্রকাশ করেন

ও ভাষণ দেন। এদিন তিনি জানালেন, তাঁদের শাখা সংগঠন 'আইপিএফ' নির্বাচনে দাঁড়াবে। কারণ পার্টি মনে করে ভারতে 'বিপ্লবের পরিস্থিতি নেই'।

১৯৯৪ সালের ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি 'আইপিএফ'-কে ভেঙে সিপিআই (এম এল) (লিবারেশন) এর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয় এবং নির্বাচনে অংশ নিতে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি চায়।

১৯৯৫ সালে ভারতের নির্বাচন কমিশন ওই দলকে সংসদীয় দল হিসেবে অনুমতি দেয়।

১৯৮২ থেকে '৯২-এ অবশ্য আইপিএফ দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। ১৯৮৯-এ বিহারের 'আড়া' কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হিসেবে একটি সিট জয় করে তারা।

তখন থেকেই ভারতের বিভিন্ন নকশাল গ্রুপ আইপিএফ এবং সিপিআই (এমএল)(লিবারেশন) গ্রুপকে 'সংশোধনবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করে।

ওদিকে 'জনযুদ্ধ গোষ্ঠী' বিভিন্ন গণসংগঠন গড়ে তোলে ১৯৮৪ সাল থেকে। যাদের কাজ ছিল কুসংস্কার মুক্তির জন্য 'ভান্ডাফোড়' অনুষ্ঠান, বেশ্যাবৃত্তি ও মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা।

১৯৯০ সালের মধ্যে 'জনযুদ্ধ গোষ্ঠী'র নেতৃত্বে আশি হাজার একর কৃষি জমি ও এক লক্ষ কুড়ি হাজার একর বনভূমি কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয় বলে 'জনযুদ্ধ গোষ্ঠী' দাবি করে।

১৯৯১ সালের আগস্টে সীতারামাইয়ার জায়গায় নেতৃত্বে আসেন গণপতি। গণপতি গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে ব্যাপক হত্যায় মেতে ওঠে লাগাতারভাবে।

১৯৯৮-২০০২ এই সময়ে এমসিসি ও পিডব্লিউজি একে অপরকে দেখতে পেলেই গুলি করত। চার বছরে দুই দলের চারশ জন নিহত হয় স্রেফ বিহারেই।

২০০১ সালে আমি ও কোর বডির মধ্যে কয়েকজন মিলে 'নিওসোসালিজম' বা 'নব্য সমাজবাদ' নামক তত্ত্বটি বিস্তারের জন্য আলোচনা করতাম বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে। সেই আড্ডা বিশাল জমজমাট হত। আলোচনা ছেড়ে কেউ বাইরে বেরোত না। আমরা প্রথম মিটিং করি হলদিয়ায়। তারপর শান্তিনিকেতন এবং আরও বহু জায়গায়।

মোম জ্বেলে গোপনে অন্ধকারের মধ্যে আলোচনা করার থেকে খোলামেলা জায়গায় আলোচনাতে আমি বিশ্বাসী ছিলাম। তার ফলে পুলিশের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হত কম।

২০০৪ থেকে 'নিও-সোসালিজম' বা 'নব্য সমাজবাদ' নামক তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্যতা পেতে থাকে বিভিন্ন নকশাল গ্রুপের কাছে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে ভারতে।

প্রায় তিন বছর কথাবার্তা চলার পর ২০০৪ সালে এমসিসি ও পিডব্লিউজি

গ্রুপ দুটি মিলিত হয়ে একটি দল তৈরি করে 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাওইস্ট)।

এই 'মাওইস্ট' বা মাওবাদীরা চারু মজুমদার প্রতিষ্ঠিত নকশালদের ঘোষিত নীতির দ্বারা পরিচালিত নয়। 'নকশাল'দের নীতি বা এজেন্ডা ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল। মাওবাদীদের মধ্যে এমন কোনও নীতি বা এজেন্ডা নেই।

এরা 'স্বয়ম্ভর গ্রাম ও সমবায়' তত্ত্ব অনুযায়ী 'নব্য সমাজবাদ' প্রতিষ্ঠা করছে। অস্ত্র সমর্পণ নয়, অস্ত্র সম্বরণ করছে। শুধুমাত্র আক্রান্ত হলেই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অস্ত্র রাখছে।

চারু মজুমদারের জীবিত অবস্থাতেই পার্টি ভেঙেছিল। সেই সময়েই পার্টিতে তীব্র ব্যক্তি সংঘাত দেখা দেয়। দলের সদস্য সুশীতল রায়চৌধুরি একটি দলিল রচনা করেন, যা সেই সময়ে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি করেছিল। খুব তাড়াতাড়ি ব্যক্তি সংঘাতের কারণে অথবা কোটিং চাপিয়ে বলা যায়—রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে পার্টি ভাঙতে শুরু করে ও দ্রুত ব্যাপ্তি পায়।

চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, সৌরেন বসু—এদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কথা বলে মনে হয়েছে—এরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আদৌ গুরুত্ব দিতে রাজি নন।

এই অবস্থায় আমার দল ছাড়া মানে ব্যক্তিহত্যার শিকার হওয়া, এটা অনুধাবন করেই কয়েক বছরের জন্য আন্দোলন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। কিন্তু দলগুলোর সমস্ত খবরাখবর রাখতাম।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ার ভাবনা থেকেই যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা। উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত করা এবং তারপর ধীরে ধীরে স্বয়ম্ভর গ্রাম গড়ার দিকে হাত দেওয়া। এজন্যে লেখাকেই হাতিয়ার করলাম আটের দশক থেকে। অবশ্য লেখার জগতে পরিচিতি ভাল ছিল। লেখালেখি করছি বহু বছর ধরে।

অধ্যায় : বাইশ

লেখার জগৎ, যা ফুরোয় না

কলেজে ভর্তি হবার পর ফার্স্ট-ইয়ার থেকেই পুরোদমে ফিচার লেখার শুরু। সেই সময়কার বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবং দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় ফিচার লিখতাম। তখন জনপ্রিয় পত্রিকা মাত্র তিনটি—আনন্দবাজার, দৈনিক বসুমতী, ও যুগান্তর।

সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে ওদের কিছু ফিচার লিখে দিয়েছি। কোথাও না কোথাও সে-সব ছাপা হত। লেখার আনন্দে লিখতাম।

কলেজ জীবনের পর লিখতাম টেলিগ্রাফ, যুগান্তর, অমৃতবাজার, বঙ্গলোক, অমৃত, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, সানন্দা, আনন্দমেলা, আনন্দবাজার, পরিবর্তন ইত্যাদি নানা পত্রিকায়। আনন্দই ছিল লেখার উৎস। বেশকিছু গল্প লিখলেও প্রবন্ধই লিখেছি বেশি। কবিতাও লিখেছি। অলৌকিক নয়, লৌকিক প্রবন্ধ গ্রন্থটি লেখার পর প্রবন্ধের বই ছাড়া খুব একটা অন্য কিছু লিখিনি।

একটি সাপ্তাহিকে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল সম্পাদকের নামে। আরেকটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকার ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। একটুকুও পরিবর্তন না করে লেখা আত্মসাৎ করে নিলেন সম্পাদক।

লেখার সূত্রে পত্রিকা দপ্তরগুলোতে যাতায়াত শুরু। আড্ডাও শুরু।

যুগান্তরের আড্ডা

তখন আমি বড় পত্রিকা 'যুগান্তর'-এ যাতায়াত করছি। যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক ছিলেন অমিতাভ চৌধুরি। খুব বড় মাপের ছড়াকার এবং রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রবিবারের পাতা দেখতেন। তরুণ তরুণীরা আশু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস বলতে পাগল।

স্বাস্থ্যবান শ্যামলা চেহারা, সবসময় হাসি-খুশি। মানুষটার পরনে একটা ধুতি-পাঞ্জাবি। বিকেলে ওনার লেখার টেবিলে কয়েকটা খবরের কাগজ বিছিয়ে প্রচুর মুড়ি, ছোলাভাজা, বাদামভাজা মিশিয়ে বসতেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এবং বসতেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ওখান থেকে মুঠো করে মুড়ি মুখে

চালান করতেন। সবসময় হাসিখুশি মানুষটির একমাত্র ছেলে দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। দুঃখটা হাসিখুশির আড়ালে ঢেকে রাখতেন, বুঝতেও দিতেন না। মিশতেন হইহই করে।

যুগান্তরে তখন কাজ করতেন প্রফুল্ল রায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রফুল্ল রায়ের ছিপছিপে চেহারা, দীর্ঘদেহী, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। তাঁকে তোয়াজ করার জন্য তরুণ লেখকদের অভাব ছিল না। তাঁর মধ্যে কিন্নর রায় এবং শচীন দাস এই দু'জনের নাম প্রথমেই করতে হয়। এরা প্রফুল্ল রায়ের সঙ্গে চিটেগুড়ের মতো লেগে থাকত। প্রফুল্ল রায়ের জনপ্রিয়তা ভাল।

কিন্নর রায়-এর বউ একটা সরকারি চাকরি করতেন। আর, কিন্নর চাকরির চেষ্টা না করে 'যুগান্তর', 'অমৃতবাজার' ও প্রকাশকদের সঙ্গে নিজেই গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। খুব উপর-চালাক ছেলে।

শচীন দাস ছোটখাটো একটা চাকরি করত। আর মাঝে-মাঝে যুগান্তরে গল্প লিখত।

'অমৃত' পত্রিকা অফিসে তখন সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দবাজারের সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষকে মেরে 'কলার বোন' ভেঙে দিয়েছিলেন। কেন এমনটা করেছিলেন তা আর এক ইতিহাস।

আসলে ওঁকে টপকে সুনীল গাঙ্গুলিকে প্রোমোশন দেওয়াতে উনি ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তাতেই এই কাণ্ড।

সে সময়কার অত্যন্ত শক্তিমান লেখক ছিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি লেখার ব্যাপারে অনেক সময় ডিকটেশন দিতেন। তিনি একটু নরমসরম, স্থূলকায়, স্বামী বিবেকানন্দের মতো চোখ। হিউমার সেন্স দারুণ। একটু ধীরে-সুস্থে কথা বলেন। নানান অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিলেন শ্যামলদা। তাঁর বাড়িতে আমরা সপরিবার গিয়েছি, জমিয়ে আড্ডাও দিয়েছি।

শেষ জীবনে ক্যান্সার হয়েছিল। তখনও তাঁর মুখের হাসি একইরকম, অনবদ্য।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় জাহাজে কাজ করতেন। ছেড়ে যুগান্তরে চাকরি নিলেন। কেষ্টপুরে বাড়ি করলেন। সুদর্শন, বিনয়ী, মিষ্টভাষী। অসাধারণ উপন্যাস লিখতেন। বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন ক্লাসিক হিসেবে স্মরণীয় থাকবে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' ও 'অলৌকিক জলযান'— এই দুটো উপন্যাস।

আর নলিনী বেরার উপন্যাস লেখার হাত ক্লাসিক। তাঁর উপজীব্য হল আদিবাসী সমাজ জীবন। 'শবর চরিত' উপন্যাসটি অনবদ্য।

ভাল লাগত তারাপদ রায়কে। প্রচুর হাসির গল্প লিখতেন। চুটকি লিখেছেন। ঝরঝরে লেখা।

যষ্টিমধুর আড্ডা

সেই সময়ে আরেকটি আড্ডা বসত, 'যষ্টিমধু' পত্রিকাকে ঘিরে। 'যষ্টিমধু'তে ছাপা হত হাসির গল্প, রম্য রচনা, কার্টুন। আর সকাল দশটা থেকে চলত আড্ডা। অনেক লেখক আসতেন। সকাল থেকেই মুড়ি, কচুরি, লুচি-আলুরদম, চা অঢেল পরিমাণে সাপ্লাই দিতেন বউদি অর্থাৎ কুমারেশ ঘোষ-এর স্ত্রী। আর কুমারেশদার ছেলের বউও খাবারদাবার সাপ্লাই দিতেন। ওঁদের বাড়িতে চাকরবাকরের অভাব ছিল না।

কুমারেশদা একজন শিল্পপতি মানুষ। থাকতেন কাঁকুড়গাছিতে। তিনি যষ্টিমধু-র সম্পাদক ও অর্থবিনিয়োগকারী।

একবারের ঘটনা। আমি, বনফুল ও কুমারেশদা মোটরকারে পুরুলিয়াতে একটা সাহিত্য সভায় যাচ্ছি। পথে বাঁকুড়ায় গাড়ি থামল একটা হোটেলের সামনে। দুপুরের খাওয়াটা এখানেই সারব ঠিক করলাম। এই সময়েই একজন হতদরিদ্র লোক আমাদের কাছে ভিক্ষা চাইলেন, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

কুমারেশদা বললেন, এসো। একটা চেয়ার টেবিলে বসতে বললেন। বললেন, তোমাকে ভাত দিতে বলে দিচ্ছি। যতটা পারো, খাও।

তারপর, সে যা হল—নুন আনতে পান্তা ফুরবার মতো অবস্থা। ওর খাওয়ার পরিমাণ দেখে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ।

কিন্তু কুমারেশদা ও বনফুল খুব তৃপ্তি পেলেন ওকে খাইয়ে। বনফুল বললেন, এটা খুব পুণ্যির কাজ করলাম। তাই আমিও আধা খরচ দিচ্ছি। এই বলে দু'জনেই ওই খাবার খরচ মেটালেন।

আনন্দবাজারের আড্ডা

আনন্দবাজারে যখন একটু আধটু লিখি, তখন সম্পাদক ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। তিনি প্রবল রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। বাংলা পত্রিকার লেখার স্টাইলটাই বদলে দিলেন তিনি। চলতি ভাষায় সাংবাদিকতা শুরু করে দিলেন। তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস সবই অসাধারণ। প্রচুর মদ্যপান করতেন। খামখেয়ালিও ছিলেন। ধুতি-পাঞ্জাবিই পরতেন। প্যান্টশার্ট পরতে কোনও দিনই দেখিনি।

তিনি ছিলেন এক অসাধারণ রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ।

তখন একটা ছোট গল্পের সংকলন সম্পাদনা করি আমি। নাম 'বিশ শতকের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প'। দু'খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে ভূমিকা লিখেছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। দ্বিতীয় খণ্ডে ভূমিকা লিখলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। মিত্রঘোষের কর্ণধার ভানুদা আমাকে বললেন, বাহঃ, তুমি একটা অসাধ্য সাধন করেছ। দুই খণ্ডের

ভূমিকা দু'জনকে দিয়ে লেখালে কী করে? এটা ভেবে অবাক হচ্ছি! তোমার সততার প্রতি দুই ভূমিকা লেখকের পূর্ণ আস্থা আছে। তাই এটা পারলে।

এই আনন্দবাজারের সংবাদ বিভাগে কাজ করতেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তিনি ছিলেন একটু কৃশ। জীবনে কত কিছু যে তিনি করেছেন, ভাবাই যায় না। গানের দলে, যাত্রা দলে কাজ করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের মানুষ। তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। অসম বয়সের একটা গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে। তিনি ছিলেন একজন বোহেমিয়ান। আর একজন খাঁটি বোহেমিয়ান ছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। গৌরদা পরতেন হাফহাতা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি।

বাঁকুড়া খ্রিশ্চান মিশনারি কলেজ থেকে দু'জন অধ্যাপক ওদের একটা অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন কোনও একজনকে। উদ্দেশ্য ওই কলেজে একটা সাহিত্য অনুষ্ঠানে আলোচনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। সিরাজদা ওই ভদ্রলোকটিকে আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। আমার পরনে জিন্সের প্যান্ট, টকটকে লাল ফুলস্লিভ গেঞ্জি, পায়ে নস্টার। অধ্যাপক দু'জন আমার কাছে এলেন। বললেন, আপনার অলৌকিক নয়, লৌকিক খুবই অনবদ্য। এই বই পড়েই আপনার কাছে আসা। উদ্দেশ্য সাহিত্য সভায় নিয়ে যাওয়া। একটি অনুরোধ সেদিন সভায় ধুতি-পাঞ্জাবি বা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে আসবেন। হাত জোড় করে বললাম, মার্জনা করবেন। এটাই আমার স্বাভাবিক পোশাক। এটা ছাড়া আমি যেতে পারব না।

এরপর আমি আর আমন্ত্রণ পেলাম না।

গৌরকিশোর ঘোষ তখন আনন্দবাজারে। ইন্দিরা গান্ধী এমারজেন্সি ঘোষণা করলেন। গৌরদা আর বরুণদা (সেনগুপ্ত) এই দু'জনকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে ইন্দিরা জেলে পাঠালেন।

সেই সময়ে বরুণদাও আনন্দবাজারে। আনন্দবাজারের মালিক তখন কিন্তু ওদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন প্রতি মাসে। জেলে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে পাঠাতেন ওঁদের সঙ্গে দেখা করে খোঁজ খবর নিতে।

তাই বিনিময়ে আনন্দবাজারের পিছনে পুলিশ, ইনকামট্যাক্স, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ সবাইকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন ইন্দিরা।

গৌরকিশোর ঘোষ ইন্দিরার গণতন্ত্র হত্যার প্রতিবাদে মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন।

গৌরদার ছেলের বিয়ে। আমন্ত্রণপত্রে লিখে দিলেন শুধু আশীর্বাদ করবেন, কোনও রকম উপহার নিয়ে আসবেন না।

এই আমন্ত্রণপত্রের প্রতিটি ছত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কারও উপহার গ্রহণ

করেননি। আর, খাওয়া-দাওয়ার বিপুল আয়োজনও করেননি। গৌরদা নন্দাঘুন্টি পাহাড়ের অভিযানে অভিযাত্রীদের সঙ্গী হয়েছিলেন।

'নন্দাঘুন্টি' অভিযানে আরেকজন অংশগ্রহণকারী ছিলেন সুবিমল দে। থাকতেন দমদম পার্কের পাঁচ নম্বর ট্যাঙ্কে।

সুবিমলদা খুব স্বাস্থ্যবান। উঁচু সরকারি বড় পদে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু, যদিও বয়সে একটু বড়। তিনিও তাঁর বিয়েতে কফি, বিস্কুট, চানাচুর ছাড়া কিছুই খাওয়াননি এবং কারও উপহারই গ্রহণ করেননি। যদিও তিনি পোশাকে-আশাকে ছিলেন পুরো দস্তুর সাহেব।

বরুণ সেনগুপ্তকে আনন্দবাজারেই প্রথম দেখি। তখন উনি স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট। তাঁর লেখার জনপ্রিয়তা ছিল ব্যাপক। দীর্ঘদেহী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। খুব স্পষ্ট বক্তা।

ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর কলম সোচ্চার হল। ফল, কারাবাস।

প্রেস ক্লাবে গেলে তাঁকে ঘিরে অনেক সাংবাদিকই ভিড় করতেন। বড় পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। হ্যাঁ, দেখেছি প্রচুর মদ্যপান করতে পারতেন। কিন্তু বেসামাল হতে দেখিনি কখনও। আর, তাঁর মতো সৎ সাংবাদিক খুব কমই দেখেছি।

এই বরুণদার কাছে শুনেছি উনি এবং জ্যোতির্ময় দত্ত দু'জনে সাংবাদিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মদ্যপান করতে পারতেন। কিন্তু ওরাও নাকি জ্যোতি বসুর কাছে নিতান্ত শিশু।

খুব মনে পড়ে আনন্দবাজারের সেই সময়ের মালিক অভীক সরকারের কথা। একবার আমি ও আমাদের সমিতি খুব বিপদগ্রস্ত হয়ে ওনাকে ফোন করেছিলাম। ফোনটা পি এ ধরেছিলেন। অভীকবাবুকে আমার নাম বলাতে, তিনি ধরলেন।

সমস্যাটা একটু বলে নেই।

১৯৮৭-তে **'আলোকপাত'** পত্রিকার জন্য সাক্ষাৎকার দিতে হবে আমাকে। বিষয় ফোটো সম্মোহন। পত্রিকা প্রতিনিধির সঙ্গে গেলাম জ্যোতিষ-তান্ত্রিক গৌতম ভারতীর সম্মোহনের বুজরুকি ধরতে। আমার ছদ্মবেশটা গৌতম ধরতে পারল না।

গৌতম ভারতীর ভান্ডাফোড়ের কাহিনিটি প্রকাশিত হল 'আলোকপাত' পত্রিকার নভেম্বর '৮৭ সংখ্যায়। সঙ্গে আমার ছদ্মপরিচয়ে চিনতে না পারা আমাকে আশীর্বাদরত গৌতম ভারতীর একটি ছবিও ছিল।

গৌতমের ভান্ডাফোড় বিশালভাবে নাড়া দিল জনমানসকে। গৌতমের ভক্তবৃন্দ ভেঙে পড়ল। গৌতমের রমরমা শেষ হতে চলল। গৌতমের মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

বিপুলভাবে প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়ে তিনি হাজির হলেন '৮৯-এর ফেব্রুয়ারিতে। ১৯ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকা ও ২১ ফেব্রুয়ারি আজকাল পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিল গৌতম। আলোকপাতের সেই ছবিটি এই বিজ্ঞাপন দুটিতে ব্যবহার করল সে। বিজ্ঞাপনে লিখল, প্রবীর ঘোষ গৌতম ভারতীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পরাজিত হয়েছেন এবং তার শ্রীচরণে মাথা নত করতে ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে বাধ্য হন ইত্যাদি আরও কিছু।

এই খবর চতুর্দিকে রটল। এর সঙ্গে আরও কিছু যুক্ত হয়ে অপপ্রচার চালাতে থাকল কিছু ভন্ড বিজ্ঞান-আন্দোলনকারী। আমাদের সমিতির অবস্থা তখন সংকটের আবর্তে পাক খাচ্ছে। আমাদের উপর তখন লাগাতার আক্রমণ চলছে। দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়া হচ্ছে। পোস্টার ছিঁড়ে দিচ্ছে। কুৎসা রটানো হচ্ছে। ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে। অপমানিত হলাম আমরা। আন্দোলন বন্ধের হুমকি দেওয়া হল আমাদের। ফল, কয়েকদিনের জন্য আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে গেল। চিঠির পাহাড় জমল আমাদের দপ্তরে।

আমরা সাধারণ মানুষের কাছে সত্যকে তুলে ধরার প্রথম চেষ্টা করলাম আনন্দবাজারে। একটি প্রতিবাদপত্র তুলে দিলাম 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগের সম্পাদক হীরেন দেবনাথের হাতে। তিনি জানালেন, মিথ্যে বিজ্ঞাপনের দরুন কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের প্রতি তাঁর সমস্ত রকম সহানুভূতি আছে। তবুও আমাদের প্রতিবাদপত্রটি ছাপাতে তিনি অপারগ। কারণ, বিজ্ঞাপনদাতার বিরুদ্ধে কোনও চিঠি ছাপা যায় না।

নিরাশ না হয়ে তখনই অভীক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ফোনেই সমস্যাটা তাঁকে জানালাম। তিনি পুরোটা শুনলেন এবং বললেন, বিষয়টা তাঁর জানা।

তিনি একজন সাংবাদিক পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ওই সাংবাদিক আমার ও গৌতমের সাক্ষাৎকার নেবেন এবং একটি প্রতিবেদন তৈরি করে দেবেন। সেই রিপোর্টটি আনন্দবাজারে ছাপা হবে।

বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে এই ধরনের ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নেবেন শুনে খুব খুশি হলাম।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আনন্দবাজারের প্রতিনিধি দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরি এলেন। আমার সাক্ষাৎকার নিলেন। গৌতমের কাছেও গেলেন ও সাক্ষাৎকার নিলেন।

প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হল আনন্দবাজারে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯। প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম জুড়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন।

ভাঙল বুজরুকদের অপপ্রচার, আক্রমণ, ষড়যন্ত্র। গতি পেল আমাদের আন্দোলন।

এইজন্য সত্যিই আনন্দবাজারের মালিক অভীক সরকারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ রয়েই গেলাম।

একবার একটি পত্রিকার হয়ে গেছি বনফুল-এর বাড়িতে ইন্টারভিউ নিতে। সেই ইন্টারভিউ ছাপা হওয়ার পর খুব আপ্লুত প্রশংসা করেছিলেন। তারপর ঘনিষ্ঠতা বাড়ল দ্রুত। আজীবন সম্পর্ক রয়ে গেল। তিনি আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আমি তাঁর বাড়িতে যেতাম। আড্ডা হত। একটু তোতলা ছিলেন। কিন্তু আড্ডা দিতে পারতেন খুব ভাল। মাসে দু'একবার ওনার সঙ্গে আড্ডা দিতে যেতাম।

বনফুল তখন আমাদের ছোটগল্পের রাজা। মিষ্টি খাওয়ারও রাজা। একদিন ওনার বাড়িতে গেছি। বউদি তখন শয্যাশায়ী। ভিতরে খবর পাঠালেন, প্রবীর এসেছে, রাজভোগ পাঠিয়ে দাও। দুটো রেকাবিতে রাজভোগ এল, চারটে করে।

জানতাম, বনফুলের হাই-ব্লাডসুগার। কিন্তু, চারটে রাজভোগ পটাপট খেয়ে, আমার সামনেই একটা ইনসুলিন নিলেন। মিষ্টির প্রতি তাঁর ভালবাসা দেখে অবাক হলাম।

বনফুলকে নিয়ে আর একটি গল্প বলেছিলেন সমরেশ বসু। আমার প্রিয় ঔপন্যাসিক তিনি। গল্পটার কেন্দ্রীয় চরিত্র বনফুল ও তারাশঙ্কর।

নৈহাটির সাহিত্য সভায় বনফুল ও তারাশঙ্কর দু'জনকেই নিয়ে গেছেন সমরেশ বসু। তারাশঙ্কর তাঁর বক্তব্যে বললেন, রাশিয়ার সাহিত্যিকরা যে বিপুল সম্মান পান সেই সম্মান এদেশের রাজনীতিকরা দিতে শেখেনি।

বনফুল তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনফুল প্রসঙ্গ সরিয়ে তারাশঙ্কর প্রসঙ্গ টেনে বললেন, আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা পায়ে তেল মারে পুরস্কার পাওয়ার লোভে। আর, রাশিয়ায় যাঁরা সাহিত্য পুরস্কার পান, তাঁরা সাহিত্য গড়েই পান।

সমরেশ বসু দৌড়ে গেলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি তখন একটা ঘরে বিশ্রাম ও আড্ডায় ব্যস্ত ছিলেন। তারাশঙ্কর সবটা শুনে বললেন, ওকে আমি গাড়ি করে এনেছি। দাঁড়াও দেখছি। আমি চললাম আমার গাড়িতে। ও বাসে, ট্রেনে যাতে খুশি করে আসুক।

এই সমরেশ বসু ছিলেন সাহিত্য জগতের উত্তমকুমার। বোহেমিয়ান চরিত্রের মানুষ ছিলেন। ওনার দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে মাঝে-মাঝে গিয়েছি। তন্ত্র বিষয়ে জানার খুব আগ্রহ ছিল। তাই আমার সঙ্গে তন্ত্র নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। ওনার উপন্যাস ও কালকূট ছদ্মনামে ভ্রমণ কাহিনি দুর্দান্ত লাগত।

আর এক প্রিয় লেখক সমরেশ মজুমদার-এর স্কুল জীবন উত্তরবঙ্গে। কলকাতায় কলেজ জীবন। নকশালদের সমর্থক ছিলেন, আবার রামকৃষ্ণ

বিবেকানন্দরও ভক্ত। সরকারি চাকরি পেয়েও পুলিশ ভেরিফিকেশনে আটকে গেছিলেন, একটা পয়সাও ঘুষ না দেওয়ায়। শেষ পর্যন্ত অনেক লড়াই এবং জয়।

যেমন দীর্ঘদেহী। তেমন স্পষ্টবক্তা। তাঁর কিছু কিছু লেখার মধ্যে নিজের জীবনের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়।

একবার বাংলা অ্যাকাডেমিতে আমাদের সমিতির অনুষ্ঠান। সেখানে সমরেশ মজুমদার মঞ্চে উঠে বললেন, প্রবীরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বলেছিলাম যাব। তারপর কয়েকটা অজানা ছেলে আমার বাড়ি এসে বলল, আপনি যাবেন না, গেলে ভাল হবে না।

স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম, যাচ্ছি। যা পারেন করুন।

হলসুদ্ধ হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল সেদিন। আর ধিক্ ধিক রবে ধিক্কার জানিয়েছিল ষড়যন্ত্রকারীদের।

আর এক অনুষ্ঠানে একটা কাণ্ড ঘটেছিল। ঘটালেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তিনি অতি অসাধারণ শক্তিমান কবি। আবৃত্তিও ছিল অসাধারণ।

গুয়াহাটিতে বইমেলা উপলক্ষে সাহিত্য সভা। সভা শুরু হতে দেখা গেল, শক্তি চট্টোপাধ্যায় নেই। ব্যবস্থাপকরা হইহই করে বেরিয়ে পড়ল। চারদিকে চলল খোঁজ খোঁজ।

শেষে শক্তিদাকে ধরে আনা হল। টালমাটাল শক্তিদাকে স্টেজে তোলাও হল। তাঁর ভাষণে শক্তিদা অসমের এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় লেখকের বিরুদ্ধে এমন কিছু কথা বললেন যে, হইহই বেঁধে গেল। সভা পণ্ড। সে সভায় আমি ছিলাম হাজির।

আর একজন তরুণ কবি হলেন ব্রত চক্রবর্তী। ব্রত কোথা থেকে খবর পেয়েছিলেন যে, তিনি এবছর 'আনন্দ পুরস্কার' পাবেনই। আনন্দ পুরস্কারের পাঁচ লাখ টাকা পাওয়ার পর একটা বিয়েও করবেন। চাকরি করতেন আজকাল পত্রিকায়।

শেষ পর্যন্ত পুরস্কার পেলেন না। সেই মানসিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারালেন।

একদিন শচীন দাস আমার ব্যাঙ্কে এসে হাজির। কী হয়েছে?

শচীনের কথায়, আমার ছেলের অন্নপ্রাশন। টাকা পাব দু-তিনদিন বাদে। শর্ট টার্ম লোন স্যাংশন হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও যেহেতু হাতে টাকাটা পাইনি, তাই দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আজই তুমি হাজার পাঁচেক টাকা দাও, প্লিজ।

আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স প্রায় শূন্যের কোটায়। ওকে বললাম, টাকার যখন অভাব আছে অন্নপ্রাশন না-ই বা করলে।

শচীন বলল, না, সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত ওর টাকা জোগাড় করতে বেরোলাম। তুমুল বৃষ্টিতে আমহার্স্ট স্ট্রিট ডুবে গেছে।

আমহার্স্ট স্ট্রিটে সিটি কলেজের উল্টোদিকের গলিতে থাকেন আমার একজন পরিচিত প্রকাশক।

প্রফুল্ল পাত্র তখন বাড়িতেই ছিলেন। কারণ, কলেজ স্ট্রিট তখন ডুবে গেছে। প্রফুল্লদার সঙ্গে শচীনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, ওর সমস্যার কথা এবং ওর জন্য পাঁচ হাজার টাকা ধার চাইলাম।

প্রফুল্লদা আমাকে বললেন, আমি আপনাকে চিনি, ওনাকে চিনি না। আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিচ্ছি। টাকাটা কবে ফেরত পাব?

শচীন বলল, তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে।

তারপর একমাস গেল। দু'মাসের মাথায় চিঠি পাঠালাম, খামে। *শচীন টাকাটা দাও, আমি যে একজনের কাছে ঋণী হয়ে আছি।*

এইভাবে পাঁচ মাসে পাঁচটা খাম পাঠালাম। *তুমি বেহায়া নাকি?* কোনওটারই কোনও উত্তর নেই। শচীনেরও দেখা নেই আর।

এরপর একটা পোস্টকার্ড পাঠালাম। তার মোটামুটি বিষয়বস্তু ছিল ছেলের অন্নপ্রাশনের জন্য ধার চাইলে। আমি জল-ঝড় মাথায় করে তোমাকে নিয়ে প্রকাশক প্রফুল্ল পাত্রের বাড়িতে গিয়ে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করে দিলাম। ছয়মাস গড়িয়ে গেল, একটা ফোনও করো না, জবাবও দাও না। আমাকে তাড়াতাড়ি টাকাটা দেওয়ার ব্যবস্থা করো, আমি বিপদে আছি।

চিঠিটা পাঠাবার দিন-তিনেক পরে আমার অফিসে এসে হাজির। আমার উপর চোটপাট শুরু করল। কারণ, আমি কেন পোস্টকার্ডে চিঠি লিখলাম।

বললাম, শেষ চেষ্টা হিসেবে খোলা চিঠি দিলাম, যাতে বউ পড়ে এবং বাধ্য করে টাকাটা ফেরত দিতে।

এরকম টাকা মারার আর একটি ঘটনা হল 'বিশ্ববাণী'। গত শতকের সাত-এর দশক। তখন 'বিশ্ববাণী'র অনেক নাম। মালিক ব্রজ মণ্ডল। অনেক টাকা। সুনীলদা, শক্তিদার মুখে শুনেছি, বই ছাপে, কিন্তু টাকা দেয় না। ওর সল্টলেকে বড় বাড়ি, গাড়ি।

শক্তিদা আমাকে বলেছিলেন, ওর এক-একটা প্রকোষ্ঠের নাম দেওয়া যায়—সুনীল প্রকোষ্ঠ, সমরেশ প্রকোষ্ঠ, শক্তি প্রকোষ্ঠ ইত্যাদি। শক্তিদা আরও বললেন, ওর কাছ থেকে টাকা আদায় করার সুন্দর পদ্ধতি হল—রাত-দুপুরে ট্যাক্সি করে হাজির হয়ে শোরগোল বাধিয়ে তোলা— এই ব্রজ বেরিয়ে আয়। টাকা দে।

তাতে কাজ হত। যাই হোক কিছু তো দিত।

টাকা মেরে কতদিন আর ব্যবসা চলে! শেষপর্যন্ত ব্রজর ব্যবসা লাটে উঠল।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়িতে আড্ডা দিতাম আমরা। আমরা মানে—আমি, গণেশ হালুই, লালুপ্রসাদ সাউ, এল পি শিকদার। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আড্ডা চলত।

লালুপ্রসাদ শান্তিনিকেতনে চারুকলা বিভাগের প্রফেসর ছিলেন। আমার থেকে বয়সে অনেকটা ফারাক হলেও সম্পর্কটা ছিল বন্ধুর মতো।

এল পি শিকদার থাকতেন বাঙ্গুরেই। ছবি আঁকতেন মোটামুটি। 'এল পি'র পুরোটা কী, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, পরে আপনাকে বলব। পরে জানিয়েছিলেন, তাঁর বাবা-মা'র-সন্তানরা স্বল্পায়ু ছিল। তখন আত্মীয়দের পরামর্শে আমার এমন একটা বিদঘুটে নাম রাখলেন, যাতে আমি যমেরও অরুচি হই। নাম দেওয়া হল—'ল্যাংটা পোদা'।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী থাকতেন বাঙ্গুর অ্যাভিনিউতে ভিআইপি রোডের কাছাকাছি। তাঁর সহজবোধ্য অসামান্য কবিতার মতোই অ. . টানত তাঁর রহস্য উপন্যাস। আমার প্রিয় কবি তিনি। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান সবেতেই তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ছিল। তাই আড্ডাটাও জমত দারুণ।

তিনি 'আনন্দমেলা' সম্পাদনা করতেন। সেটা ছিল এক অসাধারণ পত্রিকা।

আর একজন প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। তিনি তখন আকাশবাণীর সায়েন্স প্রোডিউসার। আমাদের বাড়ির কাছেই 'সুরের মাঠ'-এ থাকেন। তিনি এলে বা তাঁর কাছে গেলে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কথা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। কত বিষয়ে যে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী তা বলার নয়। আমার কথা জানতে চাইলে আমি আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁর কথা শুনতেই একটু খোঁচাতাম।

আজকালের কথা

গৌরকিশোর ঘোষ আনন্দবাজার ছেড়ে এলেন আজকালে, সম্পাদক হয়ে। তুখোড় সাংবা , প্রগাঢ় জ্ঞান। এইরকম সৎ, নির্লোভ, বোহেমিয়ান চরিত্রের মানুষ আমি আর দেখিনি।

একবারের ঘটনা। একটি চা-বাগানের দুর্নীতি নিয়ে লেখার দায়িত্ব দিলেন জ্যোতির্ময় দত্তকে। ধারাবাহিক লেখা দু-তিন কিস্তি সবে বেরিয়েছে। পত্রিকার মালিক গৌরকিশোর ঘোষকে ডেকে বললেন, ওই লেখাটা বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ, ওটা আমার বন্ধুর চা-এর বাগান।

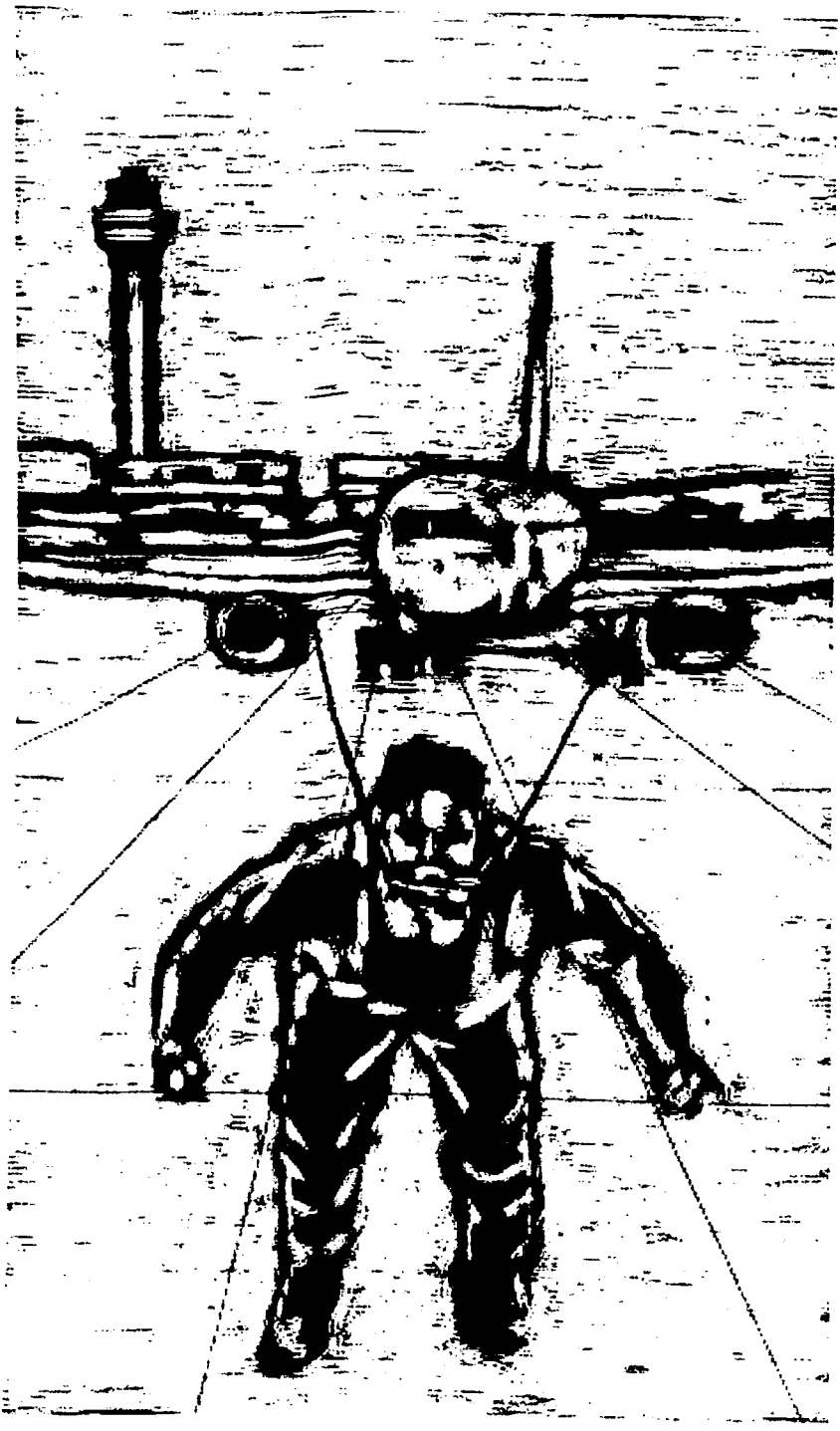

গৌরদা ওই শর্তে রাজি না হয়ে, তার চেয়ে চাকরি ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয় মনে করলেন।

এরপর সম্পাদক হিসেবে এলেন অশোক দাশগুপ্ত। তখন আমি 'আজকাল'-এর একজন নিয়মিত লেখক। সে-সময়ে দেখেছি অন্য প্রায় সব পত্রিকার মতোই 'চাপা' ও 'ছাপা'র রাজনীতি।

'আজকাল' পত্রিকাতে অনেক বুদ্ধিজীবী কাজ করেছেন। এই পত্রিকা একটা টিভি প্রোগ্রামও শুরু করল। তাতে অনেক ভন্ড বাবাজি-মাতাজিদের হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছি।

একজন চুম্বক চিকিৎসার মধ্য দিয়ে ফুসকুড়ি টু ক্যানসার সারিয়ে দিচ্ছে। পত্রিকায় বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখে ভাল ভিড় হচ্ছে। যথেষ্ট দামে ওসব হইহই করে বিক্রিও হচ্ছে।

সেখানে গেলাম এবং বুজরুকিটা ধরার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ দিলাম, তিনজন রোগী দেব, তিনমাস সময় দেব।

বাবাজি জানালেন, এই লেখাটা না লিখলে আমাকে দুই লাখ টাকা দেবে।

সেটাও আমি গোপনে রেকর্ড করলাম। বললাম, না এটা আমি লিখবই।

মেটালবাবা জানালেন, আপনি রাজি হলেন না বেশ। কিন্তু এ লেখা বেরবে না এবং আপনার অর্ধেক টাকা দিয়ে লেখা ছাপা বন্ধ করে দেব।

সত্যিই তিনি লেখাটা ছাপা বন্ধ করে দিতে পেরেছিলেন। কম্পোজ হয়ে যাওয়া লেখার ব্রোমাইডটা দেখেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়নি।

আর একবারের ঘটনা। 'লাল দন্ত মাজন' এর বিজ্ঞাপন হিসেবে একজন দাঁত দিয়ে একটা আস্ত প্লেন টেনে নিয়ে যাবে। স্থান দমদম এয়ারপোর্ট। বিভিন্ন মিডিয়াকে ওই স্নো-পাউডার বহুজাতিক কোম্পানি এয়ারপোর্টে ঢোকার ও ছবি তোলার পাস দিয়ে দিয়েছে।

আমি, আজকালের ঋতব্রত ভট্টাচার্য এবং একজন চিত্র-সাংবাদিক এয়ারপোর্টে ঢুকলাম। সাংবাদিকরা আমাকেই ছেঁকে ধরল। আপনি কেন? এখানে কোনও একটা চিটিংবাজি হবে?

মুভিতে ছবি তোলা চলছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও, যে প্লেনটা টানবে, সেই পালোয়ানের দেখা নেই।

ঋতব্রত আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জানালেন, আপনি ওদের কাজে ব্যাঘাত না ঘটালে পাঁচ লাখ টাকা আজকেই পেয়ে যাবেন।

চক্রান্তটা বুঝে নিতে দেরি হল না। যে প্লেনটা টানা হবে তার ককপিটে বসে থাকা পাইলটকে তলা থেকেই চেঁচিয়ে বললাম, প্লেনের চাকা একটুও ঘুরিয়েছেন কি, ফ্রড করার অপরাধে আপনাকে জেলে পুরব। দেখছেন ছবি তোলা হচ্ছে।

পালোয়ান এলেন। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে প্লেনের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা টানলেন। প্লেনটাকে একটুও চালাতে পারলেন না।

সাংবাদিকরা আমাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞাসা করল, ও চালাতে পারছে না। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

বললাম, আমি যতক্ষণ থাকব উনি চালাতে পারবেন না।

তারপর রহস্যটা যখন আজকাল দপ্তরে গিয়ে উন্মোচন করলাম, তখন প্রত্যাশাই করিনি ফিল্মটা চেপে দেওয়া হবে। তখন দ্বারস্থ হলাম আর এক সাংবাদিকের সঙ্গে যিনি দেশে বিদেশে ওয়েবসাইটের হয়ে লেখেন এবং ওই দিন এয়ারপোর্টে ছিলেন। নাম চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য।

একদিন অপেক্ষা করার পর যখন দেখলাম আজকাল ফিল্মটি দেখাল না, তখন চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্যকে ফোন করলাম এবং প্লেন টানার কৌশলটা তাঁকে জানালাম। তিনি সেটা সেদিনই ওয়েবসাইটে তুলে দিলেন। পৃথিবীময় রটে গেল স্নো-পাউডার-ভোজ্য তেলের বহুজাতিক কোম্পানির কীর্তিকাহিনি। হইহই কাণ্ড বাধল।

তখন 'আজকাল' পত্রিকার রবিবারের পাতাটা দেখতেন জ্যোতির্ময় দত্ত। বিদেশে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে। কলকাতায় এসে বাংলা লেখেন। বাংলা সাহিত্যেও তাঁর হাত ছিল দারুণ। তিনি ঘুষ-টুস পছন্দ করতেন না যেটা সাংবাদিকদের একটা বড় ব্যারাম।

বিয়ে করেছিলেন বুদ্ধদেব বসুর মেয়ে প্রতিভা বসুকে। জ্যোতির্ময় দত্ত স্মার্ট, টকটকে ফর্সা। আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় শুধু বাংলায় কথা বলতেন। ইংরাজি শব্দ উচ্চারণ করতেন না। ইংরাজির বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করতেন। তবে মদ্যপানে আগ্রহ ছিল প্রচুর। কিন্তু মাতাল হতেন না।

প্রচুর আড্ডা দিয়েছি তাঁর সঙ্গে। তিনি আমাকে একটু বেশিই ভালবাসতেন। বিভিন্ন সময়ে দেখেছি, 'ধান ভানতে শিবের গান'-এর মতো আমার প্রশংসায় ভরিয়ে দিতেন।

পরিবর্তনের আড্ডা

১৯৮২ থেকে 'পরিবর্তন' পত্রিকাতে লেখা শুরু করি। ওটা তখন সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

পার্থদা দীর্ঘদেহী, টকটকে রং। সুভাষ বোসের সঙ্গে মুখের মিল এতটাই যে, চোখ বুজে সুভাষ বোস চরিত্রে অভিনয় করানো যায়।

এই পত্রিকাতে 'লৌকিক-অলৌকিক' শিরোনামে সব অলৌকিক দাবিদারদের ভাণ্ডাফোড়ের কাহিনি লিখতাম। হু হু করে বিক্রি বেড়ে গেল 'পরিবর্তন'-এর।

এখানে জমিয়ে আড্ডা দিতাম। পার্থদার এখানেই বিশ্বনাথ রায়ের সঙ্গে আলাপ। বিশ্বনাথদা তখন একটা বড় ওষুধ কোম্পানির ডিরেক্টর। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে 'আনন্দবাজার'-এর কাছেই তাঁর অফিস। প্রচুর জনপ্রিয় সিনেমার কাহিনিকার তিনি। বিয়ে করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েকে। প্রতিদিন গাড়িতে করে বিশ্বনাথদার অফিসে যেতেন বউদিও। আমি ওনার অফিসে গেলে ওর আর্দালি ভিতরে ঢুকে অনুমতি নিয়ে এসে আমাকে বলত, আসুন।

আমি ভিতরে ঢুকলেই বাইরে লাল আলো জ্বলত। আর বউদি বসে থাকতেন বাইরে, একটা চেয়ারে। বিশ্বনাথদা একটা বেল বাজাতেন। বেয়ারা আসত। তাকে দুটো ডাব আনতে দিতেন। ডাব আসত জল ফেলে দিয়ে হুইস্কি ভরা। বিশ্বনাথদা দুটোই শেষ করতেন গলায় ঢেলে।

একবার, পার্থদা রাশিয়া ভ্রমণ সেরে ফিরলেন। ওখানে দেখেছিলেন মাদাম কুলাগিনারের টেলিপ্যাথি। সেই নিয়ে জমিয়ে গল্প বললেন। শুনলাম। শেষে আমি বললাম, ওটা টেলিপ্যাথি নয়, কৌশল।

প্রথমটায় কেউই বিশ্বাস করল না। বললাম, আমিও অমন টেলিপ্যাথি দেখতে পারব। শুনে পার্থদা পরিবর্তন পত্রিকার তরফে 'লৌকিক-অলৌকিক' নামের একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ প্রদর্শনী হল। টেলিপ্যাথির কিছু 'খেলা' ছিল অন্যতম আকর্ষণ। আমি যা দেখতে পাচ্ছিলাম, চোখ বাঁধা পিনাকীর কাছেও তা দৃশ্যমান হয়ে উঠছিল। কেউ কোনও একটা নোট বের করে আমাকে দেখালে আমি আমার চিন্তাশক্তির দ্বারা পিনাকীকে বলতাম এবং পিনাকী নোটের নাম্বারগুলো বলে দিত। অনুষ্ঠান প্রায় শেষ। আমার একপাশে বসলেন পার্থদা। অন্যপাশে বসল আমার ছেলে পিনাকী। পার্থদা একটা কয়েন বার করে বললেন, এই কয়েনটার সাল পিনাকী বলতে পারবে?

বললাম, কেন পারবে না? আপনি কী ভেবেছেন, যিনি টাকা দিয়েছিলেন তিনি আমার দলের কেউ?

পার্থদা সালটা আমাকে দেখিয়ে কয়েনটা মুঠিবদ্ধ করলেন।

আমি পিনাকীকে প্রশ্ন করতেই ও সালটা বলে দিল। স্বভাবতই পার্থদা অবাক!

এরপর 'পরিবর্তন' পত্রিকাতেই টেলিপ্যাথির রহস্য ফাঁস করে লিখলাম।

দে'জ পাবলিশিং

মালিক সুধাংশু দে বড় প্রকাশক ও বুকসেলার। তাঁর বাবার গড়ে তোলা ছোট্ট বইয়ের দোকানকে বিশাল আকার দিয়েছেন। বহু লেখকের লেখাই তিনি ছেপেছেন। তবে কাঁথি অঞ্চলের লেখকদের একটু বাড়তি সুযোগ দিতেন। তাদের

বই বেশি ছাপতেন। বিজ্ঞাপন দিতেন ভাল। কারণ তিনি কাঁথির কাছেই থাকতেন। ইহা হইল 'গাঁয়ের প্রেম'।

তবে সুধাংশু'র সুন্দর ব্যবহারের জন্য লেখকরা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর ওখানে আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ, নবকল্লোল, অমৃত সমস্ত পত্রিকার লেখকরাই আসতেন। সুধাংশু তাঁদের প্রত্যেককেই সসম্মানে স্থান দিতেন।

১ বৈশাখ-এ লেখকদের নক্ষত্রসভা বসত এই দে'জ-এ। কে না থাকতেন সেখানে।

একদিনের ঘটনা—টেবিল ঘিরে বসেছি আমরা কয়েকজন। কিন্নর সুধাংশুকে বলল, প্রবীরের বরাহনগরের বাড়িতে কয়েকবার গিয়েছি।

বললাম, বরাহনগরে কোনও দিনই থাকতাম না। আর আমার দমদম পার্কের বাড়িতে কোনও দিনই যাওনি।

ও গলাবাজি করে প্রমাণ করতে চাইল আমি বরাহনগরেই থাকতাম।

আমার সমবয়স্ক চার লেখক বন্ধু ছিলেন রমানাথ রায়, বলরাম বসাক, সুব্রত সেনগুপ্ত ও শেখর বসু। সুব্রত আজকালের 'রবিবাসরীয়' পাতাটা দেখত। সুব্রতর সঙ্গেই বন্ধুত্বটা খুব জমেছিল।

দিব্যেন্দু পালিত ও বুদ্ধদেব গুহ হলেন আমার শ্রদ্ধেয় দুই লেখক। দিব্যেন্দু পালিত অসাধারণ ছোটগল্প লিখে গেছেন। আর বুদ্ধদেব গুহ হলেন একজন নিপাট ভদ্রলোক। কল্পিত দেবতার মতো চেহারা। অতি বন্ধুবৎসল। কোনও অনিবার্য কারণে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারলে তিনি ফোন করে আগাম জানিয়ে দিতেন। আর আগাম অনুমতি না নিয়ে কেউ এলে তার সঙ্গে দেখা করতেন না।

একজন ভাল বন্ধু ছিলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। যদিও তিনি আমার প্রায় বাবার বয়সি। কিন্তু ওনার সঙ্গে বন্ধুত্বটা খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। মেদহীন, দীর্ঘদেহী। খগেনদা জাতীয় শিশু সাহিত্য পুরস্কার পাওয়ার পর, তাঁর ইচ্ছা হল আঙুলে গোনা কয়েকজন বন্ধুকে আমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন। আমাদের বাড়িতে এসে আমন্ত্রণ করে গেলেন। বললেন, তুমি ও সীমা যাবে। অমুক দিন একটা ছোটখাটো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা রেখেছি।

ওই দিনটি আসার দিনকয়েক আগে খগেনদা আমাদের বাড়িতে এলেন এবং ঝরঝর করে কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদার বিষয়টা পরে জানলাম যে, তিনি আমন্ত্রণ বাতিল করতে এসেছেন। কারণ ছেলে ও ছেলের বউরা খগেনদার বন্ধুবান্ধবদের পিছনে টাকা উড়াবার সম্পূর্ণ বিরোধী।

খগেনদার বিভিন্ন পুরস্কার পাওয়া রুপোর মেডেল-টেডেলগুলো এবার তাঁর ছোট ছেলে সোনার দোকানে বিক্রি করছে। দেখে, এবার আমার চোখে জল এল। আমার ছেলেও আমার বেলায় এরকমটা করবে না তো?

খগেনদা মারা গেছেন খবর পেয়েই তাঁর বাড়িতে হাজির হলাম। বাড়িতে

তখন চরম ব্যস্ততা। ছেলেরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়াকে খবর দিচ্ছে। ছবি তোলার অনুরোধ করছে। বাড়ির বউরা ব্যস্ত—শোক শোক সাজ করতে।

খগেনদার একটা ক্লাসিক সৃষ্টি হল 'ভোম্বল সর্দার'। আর 'বাংলার ডাকাত'ও দারুণ লেগেছে। কী অসাধারণ লেখা। তাঁর বই যারা পড়েনি তারা যে কী মিস্ করেছে, কী বলব!

প্রিয় লেখকদের মধ্যে আর একজন হলেন মতি নন্দী। প্রিয় সাংবাদিকও। অনেক অসাধারণ ছোটগল্প এবং খেলা নিয়ে উপন্যাস লিখে গেছেন। যে কোনও কারণেই হোক আমাকে খুব ভালবাসতেন। সময় পেলে আড্ডা দিতেন।

আর একজন প্রিয় লেখক হলেন সুনীলদা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতা, প্রবন্ধ, ফিচার সবই ছিল অসাধারণ। তবে সুন্দরী দেখলে প্রেমের আগল যেত খুলে। তিনি আমার সুন্দরী বউ-এর প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য বন্ধুরা তাঁকে সাবধান করে দিলেন। তাঁরা বললেন, খবরদার ও কিন্তু প্রবীর ঘোষের বউ। প্রবীর জানতে পারলে তোর গলা কেটে উড়িয়ে দেবে।

প্রচুর মদ্যপান করতেন। শক্তিদার দোসর ছিলেন তিনি।

একজন বিখ্যাত লেখিকা মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য বা মহাশ্বেতা দেবী আমাকে খুব স্নেহ করতেন। পরিচয় দীর্ঘকালের। আমার চোখে তিনি ক্লাসিক লেখিকা ছিলেন না। যতখানি আদিবাসী প্রেম দেখাতেন ততটা সত্যি নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন জেনেই আমার এই অভিজ্ঞতা।

তাঁর ছেলেও ক্যামোফ্লেজ করে থাকতেন। খুব সাধারণ মানের লিখেও ভাল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন মহাশ্বেতা দেবীর কল্যাণে। বেশ্যাবৃত্তিকে আইনি করার চেষ্টার পাশাপাশি তার থেকে রোজগারের পন্থাও বার করে নিয়েছিলেন।

এখন খুব জনপ্রিয় লেখক বলে শুনতে পাই—অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী ও রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম। এদের লেখা কেচ্ছাকাহিনি পড়তে গেলে আমার বমি আসে।

লেখার জগতের একটি স্মরণীয় ঘটনা—তখন স্টেট ব্যাঙ্কের স্ট্র্যান্ড রোডে কাজ করি। সদ্য নাম ছড়াচ্ছে। দমদম ক্যান্টনমেন্টের মিনিবাসে অফিসের কাছ থেকে উঠতাম। অবশ্য সোজা যখন বাড়ি ফিরতাম, ক্যান্টনমেন্টের এই মিনিবাসেই ফিরতাম। বাসে উঠে গেট দিয়ে পিছনের দিকে ঘুরলে দ্বিতীয় সিটটা ছিল জেনারেল সিট। সেটাতে আমি বসেছি। একদিন আমার সামনের সিটে দুটি যুবতী বসলেন। একজনের হাতে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'-এর ২য় খণ্ড। পাশের মেয়েটি বললেন, ও তো বেলেঘাটায় আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকত। খুব গরিব ছিল রে। ওকে তো মাঝে-মধ্যেই রুটি-তরকারি দিয়ে আসতাম।

এমনই গল্প চলছে যুবতী দুটির মধ্যে। ওরা শ্যামবাজারে নামার জন্য উঠি

উঠি করছে। অমনি আমার পাশের সিটের সঞ্জয় উঠল ও গেটের সামনে গিয়েই বলল, আপনাদের ঠিক পিছনের সিটেই বসে আছেন এই বইটির লেখক প্রবীর ঘোষ। ওকে চিনতে পারেন?

সঞ্জয় আমার সহকর্মী। ওর এমন কথা শুনে যুবতী দুটি আমার দিকে কাঁচুমাচু করে তাকিয়ে নেমে গেল।

এমনই বহু ঘটনা রয়েছে লেখার জগতে যা ফুরোয় না।

অন্যের লেখা ছাপানোর তদ্বির করার অনুরোধ প্রচুর এসেছে। যেন আমি বললেই প্রকাশকরা ওনাদের লেখা ছাপিয়ে দেবে, বই প্রকাশ করে দেবে এমনটাই ভাবতেন সেই না-লেখকরা। তাই উপদ্রব সহ্য করতে হয়েছে। তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে অক্ষম হওয়ায় আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন অনেকে।

আমাদের সঙ্গে চাকরি করেন মণি দালাল। প্রবীণ ব্যক্তি। তিনি আমাকে বললেন, তাঁর লেখাগুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছা[illegible]। আমার সাধ্য কী যে, ছাপাব?

বললাম, পত্রিকায় পাঠিয়ে দিন। তাদের পছন্দ হলে ছাপাবে।

মণি দালাল রটিয়ে দিলেন—আমার শ্বশুরমশাই নাকি আমার লেখা ছাপিয়ে দেন। অথচ তিনি জানেনই না, যে আমার শ্বশুরমশাই কী করেন, কোথায় থাকেন। তিনি যে রাঁচিতে কন্ট্রাক্টরের কাজ করেন এবং লেখার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই।—একথাও মণিদা জানতেন না।

আরেকটা ঘটনা—দেবীনিবাসে আমাদের ভাড়া বাড়ির আর এক ঘর ভাড়াটে ছিলেন। আশিস মুখার্জি। আমারই সমবয়স্ক হবেন। আমার বই-এর পর বই বেরোচ্ছে দেখে তিনি বললেন, আমার একটা বই ছাপাবার ব্যবস্থা করে দিন।

করে দিতে পারিনি। তাই আমার সঙ্গে কথাই বন্ধ করে দিলেন তিনি।

দেবীনিবাসে আমাদের ঠিক বাঁপাশের বাড়িতে থাকতেন মুখার্জি মেসো, মাসি ও তাঁদের এক ছেলে। অবস্থাপন্ন পরিবার। মাসি-মেসো মাঝে-মধ্যেই আমাদের বাড়িতে আসতেন। মাসি এসে শোনাতে শুরু করলেন কবিতা। সে মনে হচ্ছে যে, ওনাকে থামাতে পারলে আমি বাঁচি। এত বাজে কবিতা কেউ যে লিখতে পারে সেটা আমি জানতাম না।

এই মাসি ও মেসো বললেন, এই কবিতার বইটা একটু ছেপে দাও। কত রয়ালটি দেবে?

বললাম, আপনি বড় বড় পত্রিকায় কবিতা না লিখে প্রথমেই কবিতার বই ছাপাতে গেলে কেউ ছাপাতে রাজি হবে না। আমি এইটুকু পারি, যাঁরা বইপত্র ছাপে তাঁদের দু-একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। তাঁদেরকে দিয়ে বইটা ছাপিয়ে, 'দেশ'-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে সব বই বিক্রি করতে পারলে, পুরোটাই আপনার রয়ালটি।

মেসো বললেন, তাহলে আর তোমার কাছে এলাম কেন?

বললাম, প্রতিবছর যা বাংলা বই প্রকাশিত হয়, তার কম করে নব্বই ভাগই লেখকরা নিজেদের টাকায় প্রকাশ করেন।

এই মাসিই একদিন পাঁচিলের ওপর থেকে 'সীমা সীমা' বলে মোলয়েম করে আমার বউকে ডাকলেন। সীমা গেলেই মাসি ওকে দুটো পাটিসাপটা পিঠা প্লেটে করে দিলেন। আমরা ওগুলো খেয়ে প্লেটটা ফেরত দিতে যেতেই মাসি বললেন, দুটো পাটিসাপটার দাম বারো টাকা! এভাবেই মাঝে-মধ্যে আচার, জেলি খাইয়ে বিক্রি করে গেছেন মুখার্জি মাসি।

আবার লেখার কথায় আসি। আমার ছোটমামার ছেলে উৎপল আমাকে অনুরোধ করল 'দেশ'-এ ওর একটা লেখা ছাপাবার ব্যবস্থা করে দিতে।

বললাম, আমার সাধ্য নেই।

ও বলল, তুমি যদি আমার লেখা না-ই ছাপতে পারলে তাহলে তুমি কী 'ঘোড়ার ডিম'-এর লেখক?

এই ধরনের অবস্থা মিডিয়া জগতে হয়।

মিডিয়া-নাটক-চলচ্ছবি

চলচ্চিত্র ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া জগতেও ঘুরে বেরিয়েছি। যদিও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এল এই তো সেদিন।

বহু চলচ্চিত্র অভিনেতা-অভিনেত্রী-পরিচালকদের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

আমার সবচেয়ে কাছের চলচ্চিত্র অভিনেতা হলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি যুক্তিবাদী।

এই শুভেন্দুদাকে নিয়ে একবার গেলাম 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠানে। স্থান বাংলাদেশ সীমান্তের একটি গ্রাম। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের অনুরোধেই শুভেন্দুদাকে নিয়ে গেলাম। অনুষ্ঠান তো হল। এরপর প্রচুর ছেলেমেয়ে শুভেন্দুদার সঙ্গে ছবি তুলল। আয়োজক নেতাটি এর জন্য প্রতিটি ছেলেমেয়ের কাছ থেকে কুড়ি টাকা করে তোলা নিয়েছিল। এই দেখে আমি বললাম হেমামালিনীও আমাদের সদস্যা। খরচা দিলে তাঁকেও নিয়ে আসতে পারি। শুনে ব্যবস্থাপকদের নেতা শশাঙ্ক বৈরাগ্য বলল, কত খরচা পড়বে?

বললাম, চার-পাঁচ লাখের মধ্যে। ওদের কয়েকজন স্মাগলার আন্দোলনকারী বলে দিল, ঠিক আছে তুলে দেব, কোনও চিন্তা নেই।

বুঝলাম, শশাঙ্কর নেতৃত্বে যুক্তিবাদী আন্দোলন চিতায় উঠবে।

তবে শুভেন্দুদা অনুষ্ঠানটা দেখে মজা পেয়েছিলেন।

স্মার্ট, ফিটফাট, খুব ভদ্র, মার্জিত মানুষ। তাঁর দূরদর্শন কেন্দ্র লাগোয়া ফ্ল্যাটে আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি। শুভেন্দুদা আমাদের বাড়িতে আসতেন ফিয়াট

গাড়িটা চালিয়ে। আমাদের সমিতির উপদেষ্টা ছিলেন। দমদমের স্টাডি ক্লাসেও আসতেন। শুভেন্দুদার ছেলে শাশত চট্টোপাধ্যায় অভিনয় জগতে বেশ নাম করেছে।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর থিয়েটার পরিচালনা ছিল অসাধারণ। তিনি সবসময়ে আমন্ত্রণ করতেন নাটক দেখার জন্য। তাঁর মতো পরিচালকের নাটক দেখে ধন্য হয়েছি।

উৎপল দত্তের নাটকে একটা কমিন্টমেন্ট থাকত। দক্ষ অভিনেতা। তাঁর অভিনয় দারুণ লাগত। ওনার স্কুলিং-এর সমীর মজুমদারের অভিনয়ও খুবই সুন্দর।

ছোট গ্রুপের অসাধারণ অভিনয় দেখেছি গৌতম মুখার্জির পরিচালনায়। তার তুলনা মেলা ভার। আমাদের সমিতির কনফারেন্সে ওনার পরিচালনায় একাধিক নাটক অভিনীত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল একজনের কথা। মতিঝিল কলেজের এক বন্ধু দেবু ওরফে অমিত সেন। দাদু নামেই সে বেশি খ্যাত ছিল। পরবর্তীকালে স্টেট ব্যাঙ্কে কাজ করার সময় ওকে দেখি। তখন বাটা কোম্পানির অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। থাকত হেস্টিংস হাউজের কাছে। কলেজে পড়তে একটু 'ল্যাবা' ছিল। কিন্তু কর্পোরেট হাউজে কাজ করতে গিয়ে একটু বেশি চালাক-চতুর হয়ে গেল। যাকে বলা যায় উপর চালাক। তাও ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভালই ছিল। কারণ, ও যাই-ই বলুক তা নিয়ে কোনও দিনই তর্কে যাইনি।

ওর বউ নন্দা ছিলেন হাসিখুশি, অতি সহজ সরল।

দেবু প্রায়ই আমাদের বাড়িতে এসে শোনাত, ও নাকি অনেক বিখ্যাত অভিনেতাদের আঙুল ধরে তুলেছে। অভিনয় শিখিয়েছে ওনাদের।

সুযোগ পেলে আমার পরিচিত বিশিষ্ট অভিনেতাদের কাছে ওর প্রসঙ্গ টেনেছি। নাহ্, ওনারা কেউই দেবুকে চিনতে পারেনি। সেকথা অবশ্য কোনও দিনই দেবুকে বলিনি।

মেঘনাদ ভট্টাচার্য, শাঁওলি মিত্র, অশোক মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, চৈতালী ঘোষাল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ রায়, জগন্নাথ বসু, কৌশিক সেন, খেয়ালি দস্তিদার, রজতাভ দত্ত, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, শিলাজিৎ মজুমদার, সোহিনী সেনগুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল এবং এখনও শ্রদ্ধার এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। সকলেই আমার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটি পড়েছেন।

চলচ্চিত্রের কালী ব্যানার্জি, দীপঙ্কর দে প্রমুখের সঙ্গে শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল এবং আছে। ভাল বন্ধুত্ব আছে পরিচালক গৌতম ঘোষের সঙ্গে। উনি তো 'অন্য ভুবন' নামে একটি টিভি অনুষ্ঠানে জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে আমাকে নিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনাও করেছিলেন। ট্যালেন্টেড পরিচালক।

তখন এ টি এন চ্যানেল যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। চ্যানেলটিতে সত্য কাহিনি অবলম্বনে অপরাধের নেপথ্য কাহিনি তুলে ধরা হত। অনুষ্ঠানটির শিরোনাম ছিল 'নিউজ পোস্টমর্টেম'। পরিচালনা করতাম আমি। এডিটিং করতাম 'আজকাল

পত্রিকা' অফিসের এডিটিং হাউজে। অনুষ্ঠানটা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

তারপর ওই ধরনের অনুষ্ঠান নিয়ে হাজির হল 'খোঁজ খবর'। 'খোঁজ খবর'-এর বহু বিখ্যাত এপিসোড আমারই সত্যানুসন্ধান-এর ফসল। কিন্তু সেখানে একটা ধাক্কা খেলাম। পাওনা টাকার অঙ্কটা কেবল বাড়তে থাকল। টাকা আর কোনও দিনই পেলাম না।

এমন ঘটনা আরও আছে। সুমন চট্টোপাধ্যায় তখন 'স্টার আনন্দ'-র এক নম্বর লোক। বর্ধমানের বেনাগ্রামে ভূতের উপদ্রবে বাড়িগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। মানুষজন নেই। সুমনবাবু আমাকে পাঠালেন ওবি ভ্যান নিয়ে রহস্য উদঘাটনের জন্য। তিন রাত, তিন দিন থেকে রহস্য উন্মোচন করলাম। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেল।

নিজের টাকায় গেলাম। কিন্তু ফিরে এসে একটা টাকাও পেলাম না।

হিন্দি বা ইংরেজি চ্যানেলগুলোতে কাজ করলে ভাল টাকা দেয়। এটা ওদের বৈশিষ্ট্য। আর বাংলা চ্যানেলগুলো টাকা দেবে বলেও দেয় না। এটা ওদের বৈশিষ্ট্য।

বিদেশি বেশ কিছু চ্যানেলে কাজ করেছি। তারা খুব ভাল পেমেন্ট দিয়েছে। বিবিসির চ্যানেল ফোর, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, জার্মান টিভি ইত্যাদি।

অনেক টিভি চ্যানেল আমাদের সমিতিকে নিয়ে ডকুমেন্টারি তুলেছে। আমাকে নিয়েও অনেক ডকুমেন্টারি তুলেছে।

আমিও বেশ কিছু ডকু-ফিচার তৈরি করেছি। মণিপুর নিয়ে 'উত্তাল মণিপুর'। আর নানা রকমের বুজরুকি ফাঁস নিয়ে ডকুমেন্টারি করেছি। এ সমস্ত ডকুমেন্টারি অনেক বিখ্যাত ও বিদেশি চ্যানেলে দেখানো হয়েছে। আমার কাহিনির উপর নির্ভর করে নাটক, চলচ্চিত্র, যাত্রাও হয়েছে।

একবার, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন পরিচালক সুব্রত সেন। 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' সিনেমা করবেন। তাতে অনেক অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার আছে। তারাতন্ত্রে তারা মূর্তি কেমন হবে সে ব্যাপারটা ওদের জানা নেই। সেটা আমাকেই কিনে দিতে হবে। আরও যেসব জিনিসপত্র কিনতে হবে, সেসব দায়-দায়িত্ব আমার। আমি সব জিনিস কেনার পর সুব্রত সেন আমায় টাকা দিয়ে দেবে। দিলাম সব জোগাড় করে।

সিনেমার শুটিং শেষ হল। এডিটিং শেষ। ছবি রিলিজও করে গেল। আমাকে একটা পয়সাও দিল না।

সিনেমা লাইনে কত রকম যে প্রতারণা চলে, এটা তারই একটা উদাহরণ।

কিন্তু আমার লক্ষ্য সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে।

অধ্যায় : তেইশ

সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

লেখাকে হাতিয়ার করে সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নামলাম। 'পরিবর্তন' পত্রিকা হল জনসংযোগ মাধ্যম। লেখায় হাত দেওয়ার পিছনে আরও কয়েকটি কারণ ছিল। এভাবে প্রবন্ধের একটা নতুন ঘরানা তৈরি করা, যাতে সাম্যের লড়াইয়ের সমস্ত উপাদান থাকবে আড়ালে। লেখা জনপ্রিয়তা পেলে সাংস্কৃতিক আন্দোলন এগিয়ে নেওয়া যাবে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম, এ-দেশের অসাম্যের জগদ্দল ব্যবস্থাকে বাস্তবিকই পাল্টাতে হলে সমাজের কিছু মানুষের আন্তরিক সমর্থনের প্রয়োজন। আইন করে জ্যোতিষ চর্চা, ধর্মের নামে পশুবলি, দেহব্যবসা, পণপ্রথা ইত্যাদি বন্ধ করা যায়নি জন-সচেতনতার অভাবে। আবার আগে সমস্ত মানুষের বিবেকের পরিবর্তন ঘটাব, তারপর সমস্ত বিপ্লব ঘটাবার কাজে হাত দেব— এটাও অত্যন্ত ভুল ধারণা। হাতের সামনেই উদাহরণ রয়েছে। আটের দশকের শুরুতেই রাশিয়াতে প্রতিবিপ্লব ঘটবে এমন একটা অবস্থা তৈরি হচ্ছিল। সামান্য কিছু নেতারা বুঝে নিয়েছিল, তাদের প্রতিবিপ্লবকে কেউই প্রায় প্রতিরোধ করবে না। কনিউনিস্টদের জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ধারণা, মন্দির-মসজিদ-গির্জায় জোর করে প্রার্থনা বন্ধ করে দেওয়া, উঁচু মহলে দুর্নীতি— এসবই সাধারণ মানুষের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। জনগণের মধ্যে এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছিল। বার-ড্যান্স, ক্যাবারে, ব্লু-ফিল্ম, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি ভোগসর্বস্বতা রুশ সমাজে ঢুকে গিয়েছিল। অলৌকিকতার পক্ষে নানা গাল-গপ্পোকে 'সত্যি' বলে চালাতে চাইছিল রুশ সরকারি পত্র-পত্রিকা। কমিউনিস্টদের এই 'ঘোমটার তলায় খেমটা নাচ' দেশবাসীরা কী চোখে দেখছে, তা বোঝার সামান্য চেষ্টাও করেনি রাশিয়ার গদিতে বসা কমিউনিস্টরা। বুঝেছিল কমিউনিস্টদের ছুড়ে ফেলতে এগিয়ে আসা কিছু নেতা। তারপর তো ইতিহাস হল।

সমাজকে পাল্টে দেওয়ার পথ একটা নয়। বহু। প্রয়োজনে মানুষকে সচেতন করতে হয়। সমাবেশিত করে চালিত করতে হয়। কখনও গণ-হিস্টিরিয়া তৈরি করে কার্যোদ্ধার করা হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে হিস্টিরিক

করে তুলে 'ধর্মগুরু' বা 'ধর্মযোদ্ধা'রা মানুষদের আত্মঘাতী বাহিনী তৈরি করে ফেলে। আবার আদর্শের জন্য উচ্চমেধার মানুষদের আত্মবলি দিতে দেখলাম ছয় ও সাতের দশকে নকশাল আন্দোলনে।

সমাজকে পাল্টাবার স্বপ্ন দেখা মানুষরা তাদের সংগৃহীত জ্ঞান থেকে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রয়োগ করতে পারে। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল কি বর্তমান সময়ে আদৌ সম্ভব? সংঘর্ষ বিনা কি সাম্যের সমাজ গড়া সম্ভব? সাম্যের শত্রুরা কি বিনা বাধায় কাজ করতে দেবে? সবগুলো প্রশ্নের উত্তর 'না'। সাম্যের সমাজ গড়তে গেলে আক্রমণের মোকাবিলায় প্রতি আক্রমণ করতেই হবে। অসাম্য ভাঙতে, সংঘর্ষ ও সাম্য আনতে নির্মাণ জরুরি।

বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে নিয়ে এক একটি পৃথক উন্নততর সাম্যের সমাজ গড়ার পরিকল্পনা নিলে তা হবে বাস্তব-সম্মত। যেমন, ওড়িয়াভাষী অঞ্চল, বাংলাভাষী অঞ্চল (যার মধ্যে থাকবে পশ্চিমবাংলা, বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চল, অসম ও ত্রিপুরার বাংলাভাষী অঞ্চল ও বাংলাদেশ), বিহার, অন্ধ্র, ছত্তিশগড়, পূর্ব ভারতের সাতটি প্রদেশ—প্রত্যেকেই পৃথক দেশ হলে অসুবিধা কোথায়? কোথাও নেই। ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলো স্বাধীন দেশ হয়ে মাথা উঁচু করে যদি বাঁচতে পারে, তবে বাংলা, বিহার, ওড়িশা, অসম, ত্রিপুরা কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। তাত্ত্বিকভাবে পারবে। বাস্তবেও পারবে।

যাঁরা সাম্যের সমাজ গড়ায় নেতৃত্ব দেবেন, তাঁদের নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। শোষিত জনগণের মধ্যে যদি কাজ করতে হয়, তবে তাঁদের পাশে বন্ধুর মতো দাঁড়াতে হবে। পরিবারের একজন হতে হবে। তাঁদের ভালবাসা, তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। হতে হবে তাঁদের ভরসাস্থল। তবে না মানুষগুলো নেতার কথায় জীবন দিতে পারবে অবহেলায়। এই নেতারা তো শূন্য থেকে হঠাৎ করে জন্মায় না। এরা একটু একটু করে গড়ে ওঠে। বরং বলা ভাল—একজন ভাল খেলোয়াড়কে গড়ে তোলার মতোই নেতা গড়ে তুলতে হয়। তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাত-লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নেতা পরিশীলিত ও মার্জিত হয়।

এজন্যই লেখার মধ্য দিয়ে জনসংযোগ গড়ে তোলা এবং জনসমাবেশিত করার কাজে হাত দিলাম।

তখন বাংলার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পরিবর্তন'। সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আমি 'লৌকিক-অলৌকিক' শিরোনামে কলাম লিখতাম সেখানে। তখন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন সাম্যকামীরা। আড্ডা হত আমার বাড়িতে।

সব খেলারই নিজস্ব কিছু নিয়ম বা কৌশল থাকে। কেউ-ই শুরুতেই আস্তিনের সেরা তাসগুলো ফেলে না। সেরা দল বা খেলুড়ে সে-ই, যে প্রয়োজন বুঝে তাস বের করে।

অলৌকিক নয়,
লৌকিক

শুরুতেই সব তাস ফেলিনি। শুরু করেছিলাম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিকে আমরা লেখা বছর তিনেক এমন একটা জনপ্রিয়তা পেল যে শহর, মফস্‌সল, গ্রাম থেকে আমন্ত্রণ আসতে লাগল। 'থ্রি মেনস্ আর্মি' নিয়ে শুরু হল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা। আমি, আমার বউ সীমা ও শিশুপুত্র পিনাকী। প্রথমে সীমা গান ধরতেন। তারপর আমি আর পিনাকী নানা বাবাজি-মাতাজিদের 'অলৌকিক ক্ষমতা'র রহস্য ফাঁস করতাম। সেটা ১৯৮৫-'৮৬ সাল। তারপর সংগ্রামের সাথী হলেন অরুণ মান্না, গুপী ও সঞ্জয়।

কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে মত বিনিময় শুরু করেছিলাম ১৯৮২-'৮৩ সাল থেকেই। আড্ডা, আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক সবই হত। গড়ে উঠল যুক্তিবাদী সমিতি।

১৯৮৫। অভাবনীয় এক মানসিক আঘাত পেলাম। ব্রেন-এ স্ট্রোক হল। '৮৫ সালে বড় বড় নার্সিংহোম গড়ে ওঠেনি। আমাদের পাড়ার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ দীপক চন্দ্র আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, কোনওরকম ভাবে ব্রেন-এ অপারেশন করতে যেও না। তার থেকে যেমন আছো, থাকো।

আমি পরে জেনেছিলাম যে, মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলো মারা গেলে তা আবার জন্মায় না। কিন্তু তার আশেপাশের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোতে ধারণা সঞ্চারের মাধ্যমে সক্রিয় করা যায়। এবং সে দিয়ে এই অকেজো হয়ে যাওয়া মস্তিষ্কের কাজকর্মগুলো চালানো যায়, যেটাকে বলা হয় হিপনোটিক সাজেশন দিয়ে সক্রিয় করা। আমি সেভাবে শুয়ে শুয়ে নিজেকে হিপনোটিক সাজেশন দিতাম। ধীরে ধীরে বাঁ অঙ্গ পরিচালিত হতে লাগল। এবং এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

এরপর পুরোটাই সমিতির ইতিহাস। আমার ব্যক্তিগত বলতে গেলে প্রায় কিছুই নেই। সবটাই যুক্তিবাদী সমিতির কাজকর্ম। সেসব ছড়িয়ে আছে মোট গোটা ৬৫টি বইতে। লিখেছি বাংলায় এবং অনুবাদ হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়।

অধ্যায় : চব্বিশ

বাংলাদেশের জাতীয় উৎসব দেখতে যাওয়া

সালটা ইংরাজির ১৯৯৮, বাংলায় ১৪০৫। ১ বৈশাখ ১৪০৫-এর দু'দিন আগে বাংলাদেশ গেলাম, ঢাকায়। উৎসব আয়োজন চলছে মহা উৎসাহে হইহই করে। আমন্ত্রণ করেছিল 'বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ'।

নববর্ষ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাতীয় উৎসব। এবার সেই উৎসবে নিজেও গেলাম ভেসে।

ঢাকায় নববর্ষ দিনটি বড় করে পালিত হয়, শোনা ছিল। কিন্তু অনুধাবন করতে পারিনি এর বিশালতার কথা এবং সর্বজনীনতার কথা। মুসলিম ও হিন্দুরা এই দিনটিতে স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গেই ভুলে যান তাঁদের ধর্ম পরিচয়। মিলিত হন ধর্মহীন উৎসবে মধ্যরাত থেকেই।

প্রত্যেকেই নেমে পড়েন রাস্তায়। নানা রঙের শাড়িতে এবং ফুলে সেজে ওঠেন নারীরা। পুরুষরা পরেন পাজামা-পাঞ্জাবি বা ধুতি-পাঞ্জাবি। নতুনত্বের গন্ধ। নারী-পুরুষের হাতে গোলাপের তোড়া। ফুল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে হচ্ছে শুভেচ্ছা বিনিময়। নারী-পুরুষের মাথায় বাঘ, হাতি, পেঁচা ইত্যাদি আঁকা রঙিন মুকুট। মুকুটে লেখা 'উৎসব ১৪০৫'। হাতে হাতে কাঠির মাথায় ঘুরছে মুখোশ। মিছিল, গান, কবিতা পাঠ, হালখাতা, পান্তা-ইলিশ—সব মিলিয়ে অনন্য ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব।

প্রতি বছরই ১৪ এপ্রিল-এ বাংলাদেশে নববর্ষ হয়। ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ সংস্কার কমিটির প্রস্তাব মতো ১৯৮৮ সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা করা হয় বাংলাদেশে। তবে পশ্চিমবাংলায় নববর্ষ উদ্‌যাপন হয় কিন্তু সেটা স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের নববর্ষের একদিন পর।

রমানা পার্ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা ইনস্টিটিউড, বাংলা আকাদেমি—সর্বত্রই অফুরন্ত উৎসবের আয়োজন। ঐতিহ্য ও আয়োজনে একটু এগিয়ে রমানা পার্ক। বিরাট বটগাছের তলায় তেত্রিশ বছর ধরে নববর্ষ বরণের উৎসব করে আসছে 'ছায়ানট' সঙ্গীত বিদ্যালয়। বিশাল রমানা পার্কে উপচে পড়েছে মানুষের ভিড়। চলছে নানা কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রকবিতা-আবৃত্তি। সকাল থেকে বিকাল প্রায় পুরো সময় জুড়েই চলছে এমন।

নজরুল জন্মশতবর্ষের কথা ভেবে কিছু নজরুগীতিও হচ্ছে। বাজছে অতুলপ্রসাদ, পল্লিগীতি, দেশাত্মবোধের গান। গান মেলা, মেলা গান।

রমানা পার্ক ঘিরে বসেছে কত না দোকান। নকশিকাঁথা, পাঞ্জাবি, খোল-করতাল, একতারা, দোতারা, নানান কারুশিল্প, খাদ্য-পানীয় সবই মিলছে এখানে। পান্তা-ইলিশের পসরা নিয়ে অনেক দোকান। গদিতে বসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে পোড়ামাটির সানকিতে খাওয়া যায় পান্তাভাত, ইলিশ ভাজা, কাঁচালঙ্কা ও কাঁচা পেঁয়াজ। কী সুস্বাদু খাওয়া! দুই সানকি খেয়ে ফেললাম।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক দমনপীড়নের প্রতিবাদ হয় এখানে ১৯৬৫-তে অর্থাৎ ১৩৭২ বঙ্গাব্দে। রমানা পার্কে বিশাল বটগাছের তলায় সেদিন আয়োজিত হয়েছিল এই প্রতিবাদ এবং পুরোপুরি বাঙালিয়ানায় নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান। সেই দিন থেকে এই ১৪০৫ পর্যন্ত প্রতিবারই নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান হয়েছে একটি দিন বাদে। সেটি ১৯৭১ সালে অর্থাৎ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ; উত্তাল সময়ে।

বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ

যাঁরা মনে করেন বাংলাদেশে কট্টর মুসলিম ধর্মীয় মানুষ এত বেশি যে, সেখানে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ার আন্দোলন কোনও দিনই করা যাবে না—এটা তারা ভুল মনে করেন। বাংলাদেশে মৌলবাদীরা যেমন আছেন, তেমনই আছেন প্রগতিশীল, মুক্তমনের যুক্তিবাদী মানুষ। মৌলবাদীরা সংখ্যায় বেশি হতে পারেন, কিন্তু সাচ্চা মুক্তমনের মানুষের দেখাও তো কম পেলাম না। একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের জেলায় জেলায় নিষিদ্ধ বইয়ের মতো গোপন কাগজ মুড়ে বিক্রি হতো 'অলৌকিক নয়, লৌকিক'। আজ 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' পর্যন্ত জেলায় জেলায় শো-কেসে, র‍্যাকে দাঁড়িয়ে আছে বুক চিতিয়ে। মাত্র কয়েকটা বছরে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেছে। নির্মোহভাবে বলতে গেলে বলতেই হয়—সাচ্চা মুক্তমনের যুক্তিবাদী মানুষ এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় অনেক বেশি।

ঢাকার অভিজাত এলাকায় 'আজিজ মার্কেট'। এই মার্কেটের তিনতলায় 'বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ'। ছিমছাম অফিস। দেওয়ালে টাঙানো বাংলাদেশের কিংবদন্তি যুক্তিবাদী আরজ আলী মাতুব্বর এর ছবি। কিছু পেইন্টিং, যুক্তিবাদী স্লোগান লেখা কিছু পোস্টার। যুক্তিবাদী বই-পত্তরে ঢাকা পড়ে গেছে তিনদিকের দেওয়াল।

একটা পত্রিকা প্রকাশ করে 'বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ'। নাম 'বিজ্ঞান চেতনা'। নিজেদের কম্পিউটারে কম্পোজ করা। দামি কাগজে সুন্দর করে ছাপা। চোখ টানে প্রচ্ছদটিতে। সুদৃশ্য ও দামি কাগজের প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদ থেকে শেষ পর্যন্ত সুরুচির সাক্ষ্য বহন করে পত্রিকাটি।

পরিষদের ঝাঁ-চকচকে অফিস, পরিপাটি সাজসজ্জা, কম্পিউটার ঘর, সুসজ্জিত পত্রিকা দেখে প্রথমটা চমকে গেছিলাম। এতো অর্থ কোথা আসছে? প্রশ্ন জেগেছিল মনে। বিদেশি অর্থ সাহায্যপুষ্ট 'এনজিও' নয়তো এই পরিষদ? আমরা ফান্ডেড এনজিও অর্থাৎ বাইরে থেকে অর্থ সাহায্যপুষ্ট এনজিও-র দর্শনের বিরোধী। কারণ, দর্শনগতভাবেই মনে করি—'স্বনির্ভরতা' যখন উন্নতির চাবিকাঠি, তখন 'সাহায্য', 'অনুদান', 'নির্ভরশীলতা'-র দর্শন শেষ পর্যন্ত মানুষের উন্নতির বিরোধী হতে বাধ্য। উন্নয়ন একটা দাবি, একটা অধিকার। আমরা নেমেছি ভিক্ষার দর্শনের আগ্রাসন প্রতিরোধে। এমনই এক সময়ে পরিষদ নামক ফান্ডেড এনজিও-র আমন্ত্রণে এখানে হাজির হইনি তো?—এমন অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

খবর নিলাম। জানলাম, বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ অন্য সব ক্লাব বা সংগঠনের মতো নয়। চার সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ড পরিষদ পরিচালনা করে। এই বোর্ডটিই পরিষদের আর্থিক দায়িত্ব বহন করে। প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ হয় মাসে। পরিষদের মূল চালিকা শক্তি এবং পুরো সময়ের কর্মী হলেন আইয়ুব হোসেন। পদটি সমন্বক। আইয়ুবের পারিবারিক সংসারের আর্থিক দায়িত্ব বহন করে পরিষদ।

বহু জেলাতেই তৈরি হয়েছে পরিষদের শাখা। আজিজ মার্কেটের অফিসটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়। এখানে ফি-হপ্তায় বসে পাঠচক্রের আসর। মহিলারাও অংশ নেন এই পাঠক্রমে। দু'বছরেই সাড়া ফেলে দিয়েছে পরিষদ।

বিজ্ঞানকর্মীদের প্রতি পরিষদের চারটি আবেদন : (১) জিজ্ঞাসার মাধ্যমে প্রতিটি জ্ঞানের উন্মেষ ঘটান। (২) সমস্ত গোঁড়ামি কুসংস্কার ও অলৌকিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। (৩) প্রতিটি অলৌকিক ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই ও উদ্‌ঘাটন করুন। (৪) মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদী চর্চার মাধ্যমে অগ্রসর চিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলুন।

তিনদিনের কর্মশালা

১৬, ১৭ ও ১৮ এপ্রিল কর্মশালা হল। আয়োজক পরিষদ। হল ঢাকার বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র বা সায়েন্স ল্যাবরেটরির অটিটোরিয়ামে। মূলত এইজন্যই ঢাকা গেছি।

কর্মশালায় ছুটে এসেছিলেন 'বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ' ও 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র সদস্যরা। তাঁরা কিছু শিখতে চান। 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'রই সহযোগী সংস্থা 'বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'। ওঁরা এসেছিলেন বিভিন্ন জেলা থেকে। কেউবা দুর্গম অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। নিজের খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থার পরও কর্মশালায় অংশ নিতে যে পরিমাণ

অর্থ জমা দিয়েছেন, তা জেনে নির্বাক হয়ে গিয়েছি। ওঁদের অসাধারণ উৎসাহকে জানিয়েছি কুর্নিশ।

১৬ তারিখের অধিবেশন ছয়টি ভাগে বিভক্ত। ১৭-তে হল চারটি ভাগে। প্রচুর অংশগ্রহণকারী এবং তাঁদের প্রবল উৎসাহ ও আন্তরিক শেখার আগ্রহ আমাকে আপ্লুত করেছে। ১৭ থেকে ৭০ বছরের মানুষ ছিলেন এই উদ্দীপনায়। প্রতিটি মানুষের থেকে উঠে এসেছে জিজ্ঞাসা কখনও তাত্ত্বিক কখনও বা কোনও পির-ফকির বা তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা নিয়ে। জিজ্ঞাসা ছিল যুক্তিবাদী সমিতির প্রক্রিয়ার মধ্য থেকেও কীভাবে কয়েকজন লোভী হয়ে উঠল এবং তৎসহ সমিতিকে সাম্রাজ্যবাদীদের জো-হুজুর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা করার চক্রান্ত করল? আরও কত প্রশ্ন। কোনও প্রশ্নই এড়িয়ে যাবার নয়। উত্তর দিয়েছি প্রতিটি প্রশ্নের। চেষ্টা করেছি প্রতিটি জিজ্ঞাসাকে মর্যাদা দিতে।

এই কর্মশালায় পেয়েছি তরুণ চিকিৎসক রেজাউল করিম চৌধুরিকে। নিবেদিত প্রাণ সংগঠক তিনি। পেয়েছি টগবগে প্রবীণ ম. আলফাতুর রহমানকে। তিনি বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সুনামগঞ্জের সংগঠক। পেলাম ডাঃ টি হোসেনকে। লন্ডন থেকে এফ আর সি এস করা অতি প্রবীণ কিন্তু অতি সচল এবং অসাধারণ মানুষ তিনি। ছিলেন দীর্ঘদেহী ভরাট গলায় গায়ক সাফাত আহমদ চৌধুরির মতো সিংহ হৃদয়ের মানুষ, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশিদ, আলাভোলা কবি বেলাল মহম্মদ। 'লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী' মঙ্গলচন্দ্র মণ্ডলের গান শুনলাম। উপহার পেলাম মঙ্গলচন্দ্রের লেখা বই 'ঋষি'। ডাঃ ইউ আহমেদের কাছ থেকে থেকে উপহার পেলাম 'বাক্যালাপ'। ওনার নেশা লেখা। আমিও পড়েছি এক নিশ্বাসে। ছোট ছোট 'জোক' দিয়ে তামাম 'অলৌকিক ক্ষমতাধর' ও 'জ্যোতিষী'দের চুটকি বাজিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। বিজ্ঞান চেতনা পরিষদের নেত্রী এবং কবি ও সাংবাদিক রোকসানা আফরিনের তুলির কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার। আমি অভিভূত হলাম। আমার প্রিয় জাদুকর জুয়েল আইচ, জাদুকর পরী বিপাশার সঙ্গে দেখা হল বেশ কয়েকবছর পর। দেখা পেলাম আমাদের সমিতির পুরনো সদস্য সঞ্চিতার। এখানে তিনি বিজ্ঞান আন্দোলন নিয়ে মেতে আছেন। নিজের লেখা একগাদা উপন্যাস উপহার দিলেন। আর এক সদস্য পারভিনকে দেখলাম অনেকদিন পর। পেলাম বহু নিবেদিত প্রাণ সবুজ-সতেজ নানা বয়সের মানুষকে। এদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।

পারভিন বাংলাদেশের 'গ্রীন সীড' কোম্পানি, জাহাজের ব্যবসা, সিমেন্টের কারখানা, ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির মালিকের বউ। ও আমাকে গভীরভাবে ভালবাসত। পারভিনের বরও আমাকে খুব ভালবাসত। পারভিনের মা ও ভাইও আমাকে খুবই শ্রদ্ধা, ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল।

ও ওর বরকে বলেছিল, তুমি আমার শরীর পাইতে পারো, কিন্তু মন পাইবা না। আমি মনটা আনন্দকে দিয়া দিছি।

পারভিন আমাকে আনন্দ বলেই সম্বোধন করত। কারণ আমি নাকি আনন্দেরই প্রতীক।

ওর প্রাণশক্তি দেখে কেউ বলবে না যে ও কঠিন অসুখে ভুগছে। ও তখন প্রায় মৃত্যুশয্যায়। আমাকে বলল, এই শেষ সময়ে আমাকে একটা চুমু দাও।

ও আমার জন্মদিনে প্রেসিডেন্সির বেকার হলে এসে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে গেছিল। প্রতিবছরই আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির অনুষ্ঠান হয়। সেবার হয়েছিল বেকার হলে।

বাংলাদেশের ছেলে ও মেয়েরা খুবই প্রগতিশীল। কারও সঙ্গে বহু হৃদয় বিনিময় হলেও তারা কখনও বহুগামিতাকে প্রশ্রয় দেয় না। সরাসরিভাবে তালাক দিয়ে নতুন করে সংসার পাতে। বেশ্যাবৃত্তিতে মেয়েদের থেকে ছেলেদের সংখ্যাই বেশি। ওখানে খুব ধনী পরিবারে সুন্দর যুবককে বেশ্যা হিসেবে আস্তানায় রেখে প্রতিপালন করে।

পার্ক সার্কাসে পার্ক স্ট্রিট শুরুর মুখেই টিপু সুলতানের একটি প্যালেস আছে। এই প্রাসাদের বর্তমান মালিক সুন্দর কিশোর পোষে পায়ু মৈথুন করার জন্য।

কর্মশালার শেষ দিন ১৮ এপ্রিল। সবার জন্য উন্মুক্ত এদিনটি। উজ্জ্বল হল সভা বহু গুণী তারকার সমাবেশে। দর্শকাসনেও তারকাশোভিত হল।

মুক্ত আলোচনা

বাংলাদেশে যাচ্ছি—এই শুনে অনেকেই আমাকে বললেন যে, আপনি কতটা মুক্তমনে আলোচনা করতে পারবেন, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। অথচ, তিনদিনই আমার কণ্ঠ ছিল মুক্তবিহঙ্গ। আমি কথা বলেছি আমার 'ভাষায়'। কোনও বাধা বা প্রতিবাদ আসেনি। বরং আমার এমন কথা শোনার জন্যেই চাতক পাখি হয়েছিলেন শ্রোতারা।

আলোচনা হয়েছে ধর্ম, আত্মা-পরমাত্মা, জ্যোতিষ, অলৌকিক বাবাজিদের ভান্ডাফোড় নিয়ে। আল্লা-ঈশ্বর ইত্যাদির অপর নামই হল পরমাত্মা। এসব নিয়ে খোলামেলাই বলেছি।

অধিবেশনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে বলেছিলাম—বিজ্ঞান আন্দোলন তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে। বিজ্ঞান আন্দোলনের সংজ্ঞা, নীতি নিয়ে খোলামেলা

কথা বলেছি। গাইডলাইন দিয়েছি। আহ্বান জানিয়ে বলেছি—বিজ্ঞান আন্দোলন মানে যুক্তিবাদী আন্দোলন। যুক্তিমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলন। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলন। আপনাদেরই ঠিক করতে হবে কোন সংজ্ঞাটি গ্রহণ করবেন। শোষণহীন সুন্দর সমাজ গড়ার স্বপ্ন যাঁরা দেখেন, তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার আবশ্যিক ও প্রাথমিক শর্ত—এই সমাজ কাঠামো বা 'System' -কে চিনতে হবে। নতুবা এই অসাম্যের সমাজ কাঠামো ভেঙে সাম্যের সমাজ কাঠামো গড়বেন কী করে?

আপনাদেরই ঠিক করতে হবে, আপনারা কী করবেন? বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার আন্দোলনে শামিল হবেন? যুক্তিবাদ প্রসারের কঠিন কাজে হাত দেবেন? একটা সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলবেন? নাকি নিজেদের আখের গোছাতে শোষিত মানুষদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মেকি যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলবেন?

বাস্তবিকই যে-দিন যুক্তিবাদ প্রসারে আন্তরিক হবেন, সে-দিন শোষকগোষ্ঠী ও তাদের সহায়ক শক্তিগুলি আপনাদের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

হ্যাঁ, আপনাদেরই ঠিক করতে হবে—প্রচারের আলো, না কাঁটা-বিছানো পথ, কোনটাকে সঙ্গী করবেন।

১৮ এপ্রিল-এর প্রকাশ্য অধিবেশনে আমি ও জাদুকর জুয়েল আইচ যৌথ ঘোষণা করলাম— পৃথিবীর যে কেউ কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারলে বা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভ্রান্ততা প্রমাণ করতে পারলে তাকে আমরা দু-জনে মিলে দেব ২০ লক্ষ ভারতীয় টাকা। যোগাযোগের ঠিকানা : বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ, ঢাকা, বাংলাদেশ, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। এই তিনটি সংগঠনের তরফ থেকেই এই যৌথ চ্যালেঞ্জ।

কোনও গিমিক করতে এই চ্যালেঞ্জ নয়। অলৌকিক ক্ষমতা ও জ্যোতিষীদের ক্ষমতা দুটোই বুজরুকি-বই কিচ্ছু নয়, মানুষের মধ্যে, এই চেতনা প্রোথিত করতেই চ্যালেঞ্জটি করা হয়।

কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চাইলে ওই তিনটি সংগঠনের যে কোনও শাখায় যোগাযোগ করতে পারেন। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে জমা দিতে হবে কুড়ি হাজার টাকা। জমানতের এই ব্যবস্থা রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের সময় ও শ্রম বাঁচানো।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী বাংলাদেশের হলে বাংলাদেশি টাকায় ও ভারতীয় হলে ভারতীয় টাকায় কুড়ি হাজার টাকা জমা দেবেন। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হারলে তাঁর জমানত রাখা কুড়ি হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হবে আমাদের দ্বারা।

চ্যালেঞ্জ এলে তার মোকাবিলা হবে অবশ্যই প্রকাশ্যে। প্রমাণ করে দেবই—যে যত বড় অবতার বা জ্যোতিষী, সে তত বড় প্রতারক।

মহাজাতকের ভান্ডাফোড়

একটি বইয়ের বিক্রি নাকি বাংলাদেশে রেকর্ড করেছে। নাম : সাফল্যের জাদুকাঠি কোয়ান্টাম মেথড। লেখক : মহাজাতক। দাম : একশো টাকা। বইটিতে লেখকের ছবিসহ তাঁর পুরো নাম মহাজাতক শহিদ আল বোখারী। নামটা যে লেখক নিজে তৈরি করে নিয়েছেন, তা মনে করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। লেখক পরিচিতিতে বলা হয়েছে—'বরেণ্য ভবিষ্যৎদ্রষ্টা'... 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যু, ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু, রাজীব গান্ধীর মৃত্যু...অসংখ্য নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক অনন্য মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছেন।' 'জ্যোতিষ বিজ্ঞান, যোগ, মেডিটেশন...অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় রয়েছে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ।'

'অধ্যাত্মবাদী যোগ বা মেডিটেশন এবং অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাকে আয়ত্ত করে সাফল্যকে বন্দি করার বই হল কোয়ান্টাম মেথড।'

সিলেটের ডাক্তার কাবেরী দাস বছর দেড়েক আগে আমাকে প্রথম বইটির খবর দেন। জানিয়েছিলেন—বইটি ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের ওপর। অতিমাত্রায় বিভ্রান্ত তাঁদের অনেকেই। তবে তাঁরা জানতে চান এবিষয়ে আমার সুস্পষ্ট মতামত।

বহু মানুষের প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম এখানে। সাংবাদিক, প্রকাশক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী ও চিকিৎসকরা প্রশ্ন করেছেন, 'মহাজাতকের বইটির বিষয়ে আপনার মতামত কী?'

খবর পেলাম মহাজাতক প্রায়ই কর্মশালা বসান মাথাপিছু পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে। বিষয় যোগ অর্থাৎ মেডিটেশন। ভিড় ভালই হয়। ওই কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন এরকম কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি।

রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের মননশীল পাঠক নওশের ইসলাম যুক্তিমনস্ক মুক্তমনের মানুষ। একই সঙ্গে ব্যবসায়ী। জাহাজের এবং বইয়ের ব্যবসা আছে। তিনি আমাকে একটা 'কোয়ান্টাম মেথড' উপহার দিলেন এবং অনুরোধ করলেন এ-বিষয়ে আমার মতামত জানাতে। বইটি পড়ে নওশের যথেষ্ট দোটানায় পড়ে গেছেন, এমনই তাঁর সরল স্বীকারোক্তি। এমনকী, তিনি মহাজাতকের অনুরোধে পুণেতে গিয়ে রজনীশের আশ্রম থেকে মেডিটেশনের কয়েকটা ক্যাসেট এনে দিয়েছেন।

প্রায় মধ্যরাত। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ফিরছি। সবুজ লন। সিমেন্টের রাস্তা।

এখানে ছেলেমেয়েরা একা, দোকা বা পাঁচ-সাতজনের ছোট দল বসে আছে। গলা ছেড়ে গান করছেন, আবৃত্তি করছেন উদাত্ত কণ্ঠে। কেউবা জমিয়ে গল্প করছেন। আলোছায়া মাখা পথ, সবুজ লন। অদ্ভুত সুন্দর ঘোর লাগা পরিবেশ। এসব পেরিয়ে ঢুকলাম নিজের ঘরে। এরপর 'কোয়ান্টাম মেথড'-এ ঢুকছি আর দেখছি ছত্রে ছত্রে বিজ্ঞান বিরোধিতা। অথচ সাদা চোখে পড়লে অনেকের কাছেই যুক্তিগ্রাহ্য মনে হতে পারে বক্তব্যগুলো। যতই এগোই ততই শঙ্কা বাড়ে।

দ্বিতীয় দিনের কর্মশালায় বেশ কিছু চিকিৎসক মহাজাতকের বইটির প্রসঙ্গ টেনে আনলেন। আমার মতামতও জানতে চাইলেন।

অধ্যাত্মবাদ, যোগ, মেডিটেশন—এসবের শব্দার্থ এবং বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করলাম। 'মন' নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলাম। যোগী এবং যোগগুরুদের বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা করলাম।

এরপর সম্মোহন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় গেলাম। জাদুকরদের দ্বারা সম্মোহন এবং মনোবিজ্ঞানের সম্মোহন-এর পার্থক্য ব্যাখ্যা করলাম। হাতেকলমে সম্মোহন করে দেখালাম। হল ভর্তি দর্শক-এর সামনে সম্মোহিত হলেন সাংবাদিক, বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী, চিকিৎসক প্রমুখ। ছিল নানা রকমের সম্মোহন। সকলেই আনন্দিত হয়েছেন, উৎসাহ নিয়ে দেখেছেন।

ওখানেই মহাজাতকের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ জানালাম—তিনি বাংলাদেশের একাধিক প্রথম শ্রেণির দৈনিক পত্রিকায় চারজনের মৃত্যুদিন জানিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করুন—(১) বেগম শেখ হাসিনা; (২) বেগম খালেদা জিয়া; (৩) ডঃ আহমেদ শরীফ, (৪) জনাব বদরুদ্দীন উমর।

১৯৯৮-এর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে মহাজাতক এদের মৃত্যুদিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করলে আমজনতা বুঝে নিতে পারবেন তাঁর দাবির সার ও অসারতা।

মহাজাতক বাস্তবিকই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারলে কুড়ি লক্ষ টাকা প্রণামী দেবার দায়িত্ব জুয়েল ভাই ও আমি যেমন নিচ্ছি, সঙ্গে ঘোষণা করছি, ভারত ও বাংলাদেশের উল্লেখিত সংস্থা তিনটিই তাদের বিরোধিতা বন্ধ করে দেবে।

জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে আমাদের চ্যালেঞ্জের খবর মহাজাতক জানতেন। বাড়তি হিসেবে তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম এদিনের চ্যালেঞ্জের প্রতিলিপিটাও।

মঞ্চে বললাম, একটা ভবিষ্যৎদ্বাণী করছি মহাজাতককে নিয়ে। মহাজাতক আমাদের ওয়াকওভার দেবেন। কারণ, সরাসরি পরাজয়ের চেয়ে ওয়াকওভার দেওয়াটা পিঠ বাঁচাবার পক্ষে ভাল উপায়।

এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে আমাকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়নি। জ্যোতিষীদের চরিত্র জানি বলেই এই নিশ্চিন্ত ভবিষ্যদ্বাণী।

'স্যার'-এর আড্ডায়

শুক্রবার হল দ্বিতীয় দিনের কর্মশালাটা। এটা বাংলাদেশের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ডঃ আহমেদ শরীফ বাংলাদেশের বিদ্বজ্জনের চোখে 'স্যার'। তিনি সংগ্রামী এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয়। এদিনই আমি যাব ওনার আড্ডায়, এটা ঠিক করা ছিল। এমনভাবে কর্মশালার কর্মসূচি সাজালাম, যাতে আড্ডায় কাটিয়ে আসতে পারি ঘন্টা দু'য়েক। আমার সফরসঙ্গী অধীর এই সময়টুকু কর্মশালা পরিচালনা করবেন।

কর্মশালার কাছেই 'স্যার'-এর 'বাসা'। হেঁটে মিনিট কয়েকমাত্র। বন্ধু নওশের আমাকে নিয়ে গেলেন। আড্ডাটা তখন জমজমাট চলছে। হাজির হলাম আমি। একঘর বিদগ্ধ মানুষ। সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন আহমেদ শরিফ। বললেন, প্রবীর একটা কুসংস্কার বিরোধী কর্মশালা পরিচালনা করতে করতে দু'ঘণ্টার জন্য এখানে এসেছেন, সুতরাং আর একটুও সময় নষ্ট না করে আপনারা প্রবীরের কাছে যা জানতে চান, তা নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করুন।

স্টেনগানে শুরু হল ট্রিগার টেপা। সকলের জিজ্ঞাসা—পাশ্চাত্যের র‍্যাশনালিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের পার্থক্য, আমাদের দেশে দলিত আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর স্টাডি ক্লাস আজকাল হয় কি না? দু-বাংলার সাংস্কৃতিক বিনিময় ও মিলনের জন্য ভারতের বাঙালি শিক্ষিতদের কোনও সুনির্দিষ্ট চিন্তা আছে কি না? মার্কসবাদ যুক্তিবাদের পথ ধরে এসেছে বলে মনে করি কি না? নাকি যুক্তিবাদ মার্কসবাদেরই একটা আংশিক রূপ? কোনও রাজনৈতিক দলের শাখা হিসেবে কাজ না করলে কীভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সার্থক রূপ পাবে? আপনি কি মনে করেন সার্বিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই একটা সাচ্চা বিপ্লবী পার্টি তৈরি হবে? ছিল আরও নানান প্রশ্ন।

তুমুল আলোচনা হয়েছে। মতামত বিনিময়, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে সুষ্ঠুভাবেই। এর মাঝে এসেছে চা ও চটপটি যাকে এ বাংলায় বলি ঘুগনি। আলোচনায় কিছু উত্তেজক মুহূর্তে 'স্যার' আমাকে আগলেছেন পুত্র-স্নেহে।

'স্যার'-এর বাসার এই দুটি ঘণ্টা আমার জীবনের এক পরম-প্রাপ্তি।

'লক্ষ্মী-সরস্বতী'র বিবাদ নেই

পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় রঙ্গ—লিট্‌ল ম্যাগ থেকে গ্রুপ-থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত মানুষগুলোর একটা বড় অংশই নিজস্ব স্টাইলের পোশাক, নিজস্ব খাদ্যাভাস তৈরি করে ফেলেছেন। এদের পোশাক কম্বিনেশন—জিন্‌স ট্রাউজার-বড় ঝুলের পাঞ্জাবি, জিন্‌স ট্রাউজার-জিনস্ সার্ট, পাজামা-বড় ঝুলের পাঞ্জাবি। তবে পোশাকটা কোনও এক অদ্ভুত কায়দায় সব সময় আধ-ময়লা রাখেন। প্রায় আধ-ময়লা চপ্পল। অবিন্যস্ত চুল। চাপ বা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কাঁধে ঝোলা একটু

ছেঁড়া-ফাটা। স্মার্টলি বিড়ি খান। ভাঁড়ে দিশি। এঁরা সত্যজিৎ রায় থেকে বিকাশ ভট্টাচার্যের সৃষ্টিকে নস্যাৎ করেন মুহূর্তে। পার্থিব ব্যাপারে অদ্ভুত উন্নাসিক। এঁরা ব্যবসা করার চেয়ে বেকার থাকাটা মনে করেন গৌরবের। ব্যবসা করলে গোপনে করেন, যাতে সযত্নে গড়ে তোলা 'আঁতেল' চরিত্রটিতে কলঙ্কের ছাপ না পড়ে।

পাশাপাশি পশ্চিমবাংলার ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইন্টালেকচুয়াল খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজে বের করার চেয়েও কঠিন। 'ব্যবসায় এতই ব্যস্ত থাকি যে, শিল্প-সাহিত্য-নাট্যজগতের খবর রাখার সময়ই পাই না'—এই মূল কথাটাই ব্যবসায়ীদের শতকরা প্রায় একশো জনই বলেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। এই ধরনের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে ব্যবসায়ীর গর্ব।

ওপার বাংলায় বহু ব্যবসায়ীর প্রাসাদে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। দেখেছি তাক লাগানো ইন্টেরিয়ার ডেকরেশন। দামি আসবাবপত্রে সুসজ্জিত ঘর। কিন্তু বইয়ের উপস্থিতি দেখিনি।

কলকাতার টাউন হলের সংস্কার হবে। ফান্ড তৈরি করতে হবে। এজন্যে কলকাতার কিছু চিত্রশিল্পী তাঁদের আঁকা ছবি দিয়েছিলেন। সেই ছবির নিলাম হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে জ্যোতি বসুর উপস্থিতিতে। এক শিল্পপতি প্রায় ২০ লক্ষ টাকায় এক নামী-দামি চিত্রকরের ছবি নিলামে কিনলেন। তারপর মাসের পর মাস গেল। কিন্তু ছবিটি নিয়ে যাওয়ার জন্য সামান্যতম গা করলেন না সেই শিল্পপতি। সেই ছবিটি মালিককে গছাতে মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষের কালঘাম ছুটে গিয়েছিল।

'গা করার-ই বা কী আছে? একজন সেরা শিল্পীর পেইন্টিং কিনে একই সঙ্গে দেশের বিশিষ্ট শিল্প-রসিক বলে বিজ্ঞাপিত করেছি, আবার নিলামে সর্বোচ্চ দাম ডেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে খুশি করেছি। এরপর ছবিটার প্রয়োজন আমার ফুরিয়েছে।'—এই মানসিকতা শুধু একজন শিল্পপতির নয়, এটা বাসা বেঁধেছে প্রায় তামাম শিল্পপতিদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে। ব্যতিক্রম থাকলেও তা ব্যতিক্রম-ই।

শহর কলকাতার ব্যবসায়ীদের নব্য-সংস্কৃতি—পান পরাগ, রেসের মাঠ, স্কুল-কলেজের মেয়েদের নিয়ে রিসর্টে ঢোকা, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে গা ঘষাঘষি। এদেরই পুত্ররা মোটর-বাইক বা মারুতি হাঁকিয়ে মেয়েদের স্কুল-কলেজের সামনে হাজিরা দেওয়া এবং মেয়েদের টিজ করার কাজটা করে প্রবল উৎসাহে ও নিয়মিতভাবে। এদের অনেকেই বেপরোয়া। ছাত্রীদের পাশ দিয়ে মোটর-বাইক বা গাড়ি ছুটিয়ে যায়। এই যাওয়ার সময়ে এক খাবলা 'স্পর্শ' তুলে নেয়। এরা বেপরোয়া, কারণ এরা জানে পুলিশ ধরলেও ক্ষতি নেই। পরম ক্ষমতাবান বণিকবাবা যে কোনওভাবেই হোক ছাড়িয়ে আনবেনই।

একটা ধারণা প্রবল এ-দেশের ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে—'লক্ষ্মী' ও

'সরস্বতী'র মধ্যে একটা বিরোধ আছে। তাঁদের কাজে-কর্মেও প্রতিফলিত হয় এই বিশ্বাসটা।

বাংলাদেশ স্পষ্টতই ভারতের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে অন্তত এই একটি ধারণা বিষয়ে। 'স্যার'-এর বাসার আড্ডা থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে গেস্ট রুমের আড্ডা পর্যন্ত, সব জায়গায় এমন কিছু বিদগ্ধ পণ্ডিত প্রবলভাবে হাজির ছিলেন, যাঁরা জীবিকা ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি। বিভিন্ন প্রসঙ্গে মত বিনিময়, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে এদের সঙ্গে। পরিশেষে আমাকে ঘাড় ধরে স্বীকার করিয়ে নিয়েছে বাস্তব অবস্থাটা যে, বাংলাদেশে তথাকথিত 'লক্ষ্মী'-'সরস্বতী'র বিবাদ নেই।

দুই বাংলা যখন এক ছিল, তখন বাঙালির মধ্যে 'লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ' মার্কা 'মেন্টাল ব্লক' তৈরি হয়নি। সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রাণকৃষ্ণ লাহা, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়-দের মতো বহু ব্যবসায়ী ছিলেন, যাঁরা গুণী, জ্ঞানী, বিদ্যোৎসাহী এবং নতুন নতুন চিন্তার স্রষ্টা হিসেবে গোটা দেশকে নাড়া দিয়েছিলেন।

হায়! আজ এই বঙ্গের অবিন্যস্ত চুলের পাঞ্জাবি, ঝোলা ব্যাগ সজ্জিত আঁতেল এবং পান-পরাগ-গুঠকা-সেলফোন শোভিত বেওসায়ীরা সেই সাংস্কৃতিক ও আর্থিক মেলবন্ধনকে নির্বাসন পাঠিয়েছেন।

আমার এই বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে, আমি ধনিকশ্রেণির শোষণকে সমর্থন করছি। বাংলাদেশ ও ভারতের সমাজব্যবস্থা শ্রেণিবিভক্ত ছিল, আজও রয়েছে। এই সামাজিক অবস্থাকে স্বীকার করছি। তৎসহ দুই বাংলার আম-বাঙালির অতীত ও বর্তমান মূল্যবোধের অবস্থানটাকে একটামাত্র বিশেষ প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। এর বেশি কিছু নয়। এর কমও কিছু নয়।

বই 'শিক্ষিত'দের নিত্যসঙ্গী

ভুল না একটু। আসলে বলতে চাইছিলাম—যাঁরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের নিত্যসঙ্গী বই। এই বক্তব্যটা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে।

আমাদের মতোই একটা দেশ হল বাংলাদেশ। সে দেশে শ্রেণিবৈষম্য আছে, শোষণও আছে। গরিবদের জন্য ভাত-কাপড়-পানি নেই, মাথার ওপর চালেরই সংস্থান নেই; স্বাস্থ্য, শিক্ষা—এসব তো আরও দূরের কথা ওপার বাংলায়। কিন্তু এখানে আলোচনার বিষয়টা হল যাঁরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের নিয়ে। নিম্নবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত সেই শিক্ষিত মানুষদের পড়ার অভ্যাস নিয়ে।

'দাওয়াত' বা খাওয়ার নিমন্ত্রণ এসেছিল প্রতিটি দিনই, যে ক'টা দিন ঢাকায় ছিলাম। ওখানে অনেকেই বিত্তের দিক থেকে মধ্যমানের। গিয়েছি তাঁদের বাসায়।

মুগ্ধ হয়েছি খাওয়ার বিশাল আয়োজন দেখে এবং গভীর আন্তরিকতাতে। মুগ্ধ হয়েছি আক্ষরিক অর্থেই। ওপার বাংলার 'দাওয়াত' ব্যাপারটা এপার বাংলায় বসে বোঝা সম্ভব নয়।

মুগ্ধ হয়েছি ওখানকার মানুষদের পড়ার অভ্যেসটা দেখে। প্রতিটি বাসা বোঝাই করা বই ও পত্র-পত্রিকাতে। জেনেছি, বই কেনার জন্য প্রতিমাসে একটা খরচ ধরা থাকে পারিবারিক বাজেটে। ওরা শুধু স্বদেশের লেখকদের বই-ই কেনেন না, এপার বাংলার লেখকদের বইও কেনেন। এপার বাংলার জনপ্রিয় লেখকদের বইয়ের একটা বিশাল মার্কেট বাংলাদেশে আছে— একথা স্বীকার করেন সেই লেখকরা এবং এজন্যেই তাঁদের আর্থিক সচ্ছলতা আজ মুঠোবন্দি হয়েছে।

একবার সরকার 'দেশ' পত্রিকা বিক্রি নিষিদ্ধ করল। বিক্রি কমে গেল। সাপ্তাহিক 'দেশ' হল পাক্ষিক। সেবার 'একুশে ফেব্রুয়ারি'-কে প্রচ্ছদ কাহিনি করে 'দেশ' প্রকাশিত হল। একটি লেখা ছিল বদরুদ্দিন উমরের। বিষয় : 'বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন আমন্ত্রিত লেখা'। ইতিহাসের এমন অধ্যায়কে টেনে আনা হয়েছিল লেখাটিতে যে, এর ফলে হাসিনার রাগ উৎপাদন করতে পারে এমন উপাদান ছিল। বেগম হাসিনার রাগের অর্থ 'দেশ' আবার নিষিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা— এমনটাই মনে হল 'দেশ' পত্রিকাগোষ্ঠীর। যখন এমনটা মনে হল, তখন সীমান্তে বাংলাদেশ প্রবেশের প্রতীক্ষা 'দেশ'-এর প্যাকেটগুলো। দ্রুত ফিরিয়ে আনা হল প্যাকেটগুলো। বদরুদ্দিন উমরের লেখাটা বাদ দেওয়া হল। বদলে সে পৃষ্ঠা ভরাট করা হল অন্য লেখায়। নতুন সম্পাদকীয় লেখা হল 'দেশ'-এ বাংলাদেশ সরকারকে তুষ্ট করতে। তাতে ক্ষমা-টমা চেয়ে নিলেন সম্পাদক বদরুদ্দিন উমরের লেখাটা ভুল করে ছাপানোর জন্য।—এসবই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে পাঠক-পাঠিকাদের ব্যাপ্তির কথা ভাল করেই জানেন পশ্চিমবাংলার লেখক-সম্পাদক-প্রকাশক প্রত্যেকেই।

ওপার বাংলার অনেক বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে শুনলাম, আমার বইপত্তরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে যে কোনও স্কুলের নাইন-টেনের ছাত্রছাত্রীরা। বাংলাদেশের স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীরাই আমার মতো সামান্য লেখকের বই-পত্তরের সঙ্গে পরিচিত হবেন—এই কথার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঢাকায় থাকাকালীন যে কটা বইয়ের দোকান ঘোরার সুযোগ পেলাম, তার প্রতিটিতেই আমার লেখা বই দেখে অবাক হয়েছি। বুঝলাম, বাংলাদেশের মানুষ সত্যিই বই-পাগল। কলকাতার কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় সবকটা দোকানে চক্কর মারলেও বাংলাদেশের জনপ্রিয়তম লেখকের বইয়ের খোঁজ শতকরা দুটো দোকানেও মিলবে না—এটা জানি। জেনে প্রচণ্ড লজ্জিত হই।

কোনও লেখকের বইয়ের প্রথম ইমপ্রেশন পাঁচ হাজারের বেশি দেবেন এমনটা ভাবতেই পারেন না এই বঙ্গের কোনও প্রকাশক।

চিত্রটা অন্যরকম বাংলাদেশে। ওদেশে জনপ্রিয় অনেক লেখকের বই পনেরো হাজার থেকে চল্লিশ হাজার প্রথম সংস্করণের ইমপ্রেশন দেওয়া হয়। এই সবটাই বিক্রি হয় বাংলাদেশেই।

এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় ওপার বাংলার লেখকদের কোনও বাজার গড়ে ওঠেনি। কারণ, 'কুয়োর ব্যাঙ' মার্কা মানসিকতার 'আঁতেল' ও 'পড়ুয়ারা' সংখ্যায় বেশি পশ্চিমবাংলায়। এরা ওপার বাংলার লেখকদের নামে নাক সিটকোন না পড়েই। এজন্যে বাংলাদেশে যে হুমায়ুন আহমেদের বই চল্লিশ হাজার ইমপ্রেশন দেওয়া হয়, সেই হুমায়ুন আহমেদের আটখানা উপন্যাস বের করে কলকাতার প্রকাশক মুখ থুবড়ে পড়েন।

একথা বলছি তসলিমা নাসরিনের এপার বাংলায় জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই। সর্ববৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী বিশাল প্রচারে তসলিমাকে যেভাবে তুলে এনেছেন মধ্যবিত্ত বাঙালির হুজুগে চরিত্রের কথা মাথায় রেখে, সেটা ব্যতিক্রম ঘটনা। এর সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় উত্তেজনা, অবিশ্বাস, ঘৃণার একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল বাবরি মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে। সেই পরিবেশে হিন্দু সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেবার কাজ করেছে তসলিমার বই।

হুমায়ুন আহমেদের মতো কোনও জনপ্রিয় বাংলাদেশি লেখককে যদি ব্যাপক প্রচার দেন সর্ববৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী এবং যদি বই প্রকাশ করেন, তবে এপার বাংলায় সেই লেখকের বইয়ের একটা বাজার তৈরি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। একবার বাজার তৈরি হলে এখানকার প্রকাশকরা সেই লেখকদের বই প্রকাশে আগ্রহী হবেন। তসলিমার ব্যাপারেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। এভাবে ওপার বাংলার লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে একটু একটু করে এপার বাংলায় পাঠক-পাঠিকাদের পরিচয় ঘটানো যায় নিশ্চয়।

ঝুঁকির প্রশ্ন আছে। বড় বিনিয়োগ দরকার প্রচারের জন্য। তাই সর্ববৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীই এগিয়ে আসতে পারে এই কাজটা করতে। দু'পার বাংলার ভাষা-সংস্কৃতির বিনিময়ের সূচনা করতে ওরাই এগিয়ে আসতে পারে।

এপার বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে ওপার বাংলার লেখকদের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার সরল অর্থ এই নয় যে, এতে বই কেনার ও পড়ার অভ্যাস বেড়ে গেল এপার বাংলার মানুষদের। প্রকাশকদের লেখক তালিকায় কয়েকজন লেখক ঢুকে পড়েন প্রতিবছর। এই ঢুকে পড়ার তালিকাতে সংযুক্তি ঘটবে ওপার বাংলার লেখক-লেখিকাদের নাম—এইটুকুই কাজ। কিন্তু, এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ফলে এপার বাংলার পাঠক সমাজ পা ফেলবে বাংলা সাহিত্যের খণ্ডিত জগৎ ছেড়ে সম্পূর্ণ জগতে।

একটা সমাজকে, একটা জনগোষ্ঠীকে পড়ার অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার

সমস্যাটা ভিন্ন। এর জন্যে একটা ব্যাপক গবেষণা চালাবার প্রয়োজন আছে সরকারি অথবা বেসরকারি উদ্যোগে।

এই বঙ্গের পাঠকদের একটা বড় অংশ মেকি। পাঠক যত, ভণ্ড-পাঠক তার চেয়ে বেশি কিনা— এ নিয়ে আমি মাঝে মাঝে সংশয়ে ভুগি।

কোভুরের লেখা 'বিয়ন্ড গডম্যান' পড়েছেন—একথা শুনিয়ে দেন অনেকেই, যাঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সামান্য গা ঘষাঘষি করার সুযোগ পেয়েছেন। এই তাঁদের একবার যদি জানাই যে, বইটা পড়ার সুযোগ হয়নি, তো হয়ে গেল! তখন ওরা আমাকে একটা ফিরিস্তি ধরিয়ে দেন যে, কত বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে বইটিতে। আর তখনই ধরা পড়ে যায়, ওদের ভণ্ডামি। বইটা কত মোটা? উত্তরে অতি কৃশ বইটাকে থান ইটের সাইজের করে ফেলেন প্রায় প্রত্যেকেই। বইটা পড়েছেন বলে যতজন জানিয়েছেন, তাঁদের বেশিরভাগই ভণ্ড এটাই দুঃখ।

এইসব ভণ্ডরা বই, সিনেমা, থিয়েটার, গান, পেইন্টিং ইত্যাদির রিভিউ-প্রিভিউ পড়ে চুল-চেরা বিশ্লেষণে নামেন।

আবার এক শ্রেণির মানুষ আছেন বাঙালি উচ্চবিত্তদের মধ্যে, বাংলা বইয়ের নাম শুনলেই যাঁদের হাই ওঠে। রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, সমরেশ বসুর কোনও লেখা পড়েননি কথাটা সংকোচহীনভাবে বলেন এঁরা। এই বলার মধ্যে 'উচ্চশিক্ষা' ও 'উচ্চবিত্ত'-র গর্ব প্রচ্ছন্ন থাকে অনেক সময়ে। এরা জানেনই না যে, এইসব লেখকদের লেখা না পড়ে কী হারিয়েছেন? একই বিষয়ের বাংলা বইকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে তার চেয়ে সর্বাঙ্গে পিছিয়ে থাকা ইংরেজি বইয়ের কথা বারবার 'রেফার' করতে দেখেছি বেচারাদের। শুধু করুণা হয় এদের বোধবুদ্ধির তলানি দেখে। শঙ্কিতও হই। কারণ, কিছু মানুষকে তো প্রভাবিত করেন এঁরাও।

'পড়া' একটা অভ্যাস। 'চিন্তা' একটা অভ্যাস। এপার বাংলার মানুষদের মধ্যে এই দুটি বিষয় নিয়ে চর্চার অভাব আছে। সেই কারণে কসমেটিক্স ও কেবল লাইনের জন্যে মাসিক বাজেট থাকলেও বই-পত্র-পত্রিকা বার্ষিক বাজেটেও স্থান পায় না।

একটি দৈনিক পত্রিকার খরচ খুব বেশি হলে ধরা থাকে কোনও কোনও পরিবারে। আজ পর্যন্ত কোনও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মধ্যে পড়ার একটা অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য। নেয়নি কোনও সরকার। কলকাতায় এবং জেলায় জেলায় বছরে একটা করে বইমেলা পশ্চিমবঙ্গবাসীদের জন্যে যথেষ্ট যে আদৌ নয়—এটা প্রমাণিত হয়েই গেছে। 'কোলকাতা পুস্তক মেলা' পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বইমেলা। তবুও কলকাতায় বই-বোঝাই বাড়ি খুঁজে পেতে জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যায়।

পড়ায় কেন অনীহা? প্রশ্নটির উত্তরে পত্রিকা বিক্রেতা, হকার, দুপুরের

মেগা-সিরিয়াল দেখা গিন্নি, সরকারি অফিসের কেরানি, নন্দন চত্বরের আঁতেল, লেখক, প্রকাশক, ইত্যাদি প্রায় সকলেরই এক 'রা'। সকলেই জানিয়েছেন, "লাইফ আজকাল এত ফাস্ট হয়ে গেছে যে, বই-পত্তর পড়ার সময় বের করাই মুশকিল এবং 'কেবল লাইন'-এর দৌলতে সকলের চোখ শুধু টিভিতে।'

যাঁদের মাথা থেকে এইসব উত্তর বেরিয়েছে, হঠাৎ করে একদিনে এই চিন্তাটা তাঁদের মাথায় ঢোকেনি। এই চিন্তাগুলো তাঁদের মাথায় ঢুকেছে একটু একটু করে। ঢুকিয়েছে প্রচার মাধ্যমই। প্রচার মাধ্যমটা কোনও বিমূর্ত ব্যাপার নয়। কিছু লেখক ও সাংবাদিক তাঁদের এই মতামতটা পাঠক-পাঠিকাদের মননে পৌঁছে দিয়েছিল এই প্রচার-মাধ্যমের সাহায্যে। আর প্রচার মাধ্যমের মতামতটা কখন যেন নিজের মতামত হয়ে গেছে, সে খেয়াল নেই। "ফাস্ট লাইফ' এর মানুষ পড়ে কম"—এমন ধারণাটা কতটা ঠিক বা কতটা বেঠিক? এর উত্তর পেতে ব্যাপারটা যাচাই করে নেওয়া যাক।

আমাদের আগে টিভি এসেছে বাংলাদেশে। আমাদের আগেই ওদেশের 'কেবল লাইন' রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা এবং ঢাকা শহরগুলোকে একটু ভাল করে দেখার সুযোগ যাঁদের হয়েছে, সেই তাঁরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেনই যে, 'সবচেয়ে ফাস্ট লাইফ লিড' করে ঢাকার মানুষ। তারপরেও কী করে পড়ার অভ্যাসে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছেন ঢাকার মানুষ? আমাদের এই বঙ্গের পাঠাভ্যাস কমার প্রচলিত ধারণাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় এই প্রশ্নটাই।

সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে জনতার আচরণ (behaviour) এবং অভ্যাস (habit) গড়ে ওঠে। আবার সমাজ যেমন মানুষকে প্রভাবিত করে, তেমনই মানুষও সমাজকে প্রভাবিত করে— একথাও সত্যি। এর ফলেই সমাজে মূল্যবোধ পাল্টায়। আবার একটি সমাজের মানুষদের মূল্যবোধ, আচরণ, অভ্যাস পাল্টে দেওয়া যায় পরিকল্পিতভাবে।

মানুষের আচরণ, অভ্যাস, ইচ্ছাকে এক-একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি নিজেদের ইচ্ছামতো চালাতে পারলে, একটি পরিকল্পিত উদ্যোগ এপার বাংলার মানুষদের মধ্যে বই, পত্র-পত্রিকা পড়ার আগ্রহ বাড়িতে তুলতে কেন পারবে না?

বাংলাদেশ টিভিতে বাংলাদেশ সরকার সরকারি উদ্যোগে সারা বছর ধরে প্রতিটি দিন বিজ্ঞাপন দেয়—বই কিনুন, বই পড়ুন, বই উপহার দিন, বই হোক নিত্যসঙ্গী/ বই কিনে কেউ কোনও দিন গরিব হয়নি। মানব প্রগতি আনতে চাই মনের খোরাক, যা দিতে পারে শুধু বই / ভাল বই আপনার জীবনকে পাল্টে দিতে পারে।

ফলও মিলেছে এই লাগাতার প্রচারে। এইসব জনপ্রিয় স্লোগান নিয়ে প্রকাশকরাও হাজির হচ্ছেন টিভিতে। পুস্তক তালিকার প্রচ্ছদে স্লোগান সাজাচ্ছেন।

বাংলাদেশের মানুষের মননে গভীরভাবে এই স্লোগানগুলো ঢুকে গেছে, তারই বড় প্রমাণ—'বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষিতের বিয়েতে উপহারের একটা বড় অংশই আজ শুধু বই। পাশাপাশি এপার বাংলার দিকে তাকান— বিয়ে বাড়িতে উপহার হিসেবে বই দেওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না আমন্ত্রিতরা। ওপার বাংলার নিত্যসঙ্গী বই এপার বাংলায় অপ্রয়োজনীয় হিসেবে বর্জনীয়। অথচ তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর আগেও এপার বাংলায় বিয়ে বাড়িতে বই এমন ব্রাত্য ছিল না।'

বাংলাদেশে থাকার সময়কার একটি তথ্য উল্লেখ করতেই হচ্ছে। ৭০টির উপর প্রতিষ্ঠিত দৈনিক প্রকাশিত হয় শুধুমাত্র ঢাকা শহর থেকেই। ১০ হাজারের বেশি সার্কুলেশন আছে, এমন পত্রিকার সংখ্যা ৩৫। ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ—পত্রিকা দুটির সার্কুলেশন ৩ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার। বাংলার বাণী, প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, সংবাদ, বাংলাবাজার, মানব জমিন ইত্যাদি পত্রিকার সার্কুলেশন ৭০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার। প্রতিটি পত্রিকারই দাম ৬ টাকা। ভারতের ৮৫ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশের ১০০ টাকা পাওয়া যায় এখন। এত দামের পরও ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার বিক্রি কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা বিক্রির চেয়ে অনেক বেশি। কারণ একটাই—পড়ার অভ্যাস।

আমাদের দেশের মানুষদের পড়ার অভ্যাস বাড়াবার জন্য, বই-পত্রের বিক্রি বাড়াবার জন্যে আমরা কি ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর বইমেলার মোহ ছেড়ে 'পাশের বাড়ি' বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নিতে পারি না? স্লোগানটিকে আমাদের মননে গেঁথে দিতে আমরা কি পারি না যে, বই কিনুন, বই পড়ুন, বই উপহার দিন, বই হোক নিত্যসঙ্গী।

আরও কয়েকবার গিয়েছি বাংলাদেশে। ১৯৯৮-এর আগে গিয়েছি অনেকবার। বউকে নিয়েও গিয়েছি। আলোচনা-আড্ডায় মেতে থেকেছি, ঘুরেছি। আর, অবশ্যই 'দাওয়াত' খেয়েছি। সম্মানও পেয়েছি। ভালবাসা ও আন্তরিকতায় আপ্লুত হয়েছি। ওদেশের মানুষকে ভালবাসা দিতে পেরেছি কাছ থেকে।

শেষ বার গেলাম ২১ এপ্রিল, ২০১২-তে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখলাম। আড্ডা-আলোচনায় মেতেছি। শাহবাগ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মত গঠন করেছি। প্রবল উৎসাহে কিশোর থেকে বৃদ্ধ অংশ নিয়েছেন। শুনেছেন। বলেছেন। আন্তরিকভাবে ভালবেসেছেন। আমিও উজাড় করে ভালবাসা দিয়েছি।

বিদায় নিয়ে ফিরেছি ২৪ এপ্রিল, ২০১২-তে। আর কোনও দিনই হয়তো যাওয়া হবে না ওদেশে। সাম্যের পথে ব্রতী থাকো বাংলাদেশ। আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল দেশবাসীর প্রতি।

অধ্যায় : পঁচিশ

স্মরণীয় স্টাডি ক্লাস

আমরা, সমিতির সদস্যরা প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যেতাম। বোলপুর, মুর্শিদাবাদ, হলদিয়া ইত্যাদি জায়গায়। সেখানে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হত। আবার 'কোরবডি'র মিটিংও আমরা বেড়াতে যাওয়ার ছুতোতে সেরে নিতাম। গভীর থেকে গভীরতর আলোচনা হত। সময় ভুলে যেতাম। ভুলে যেতাম খেতে, ঘুমাতে।

তেমন একটি ঘটনা 'প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ' বই থেকে 'রানা ও অঞ্জনের' বয়ানে তুলে দিলাম :

রানার বয়ান :

"এইরকম এক আলোচনায় প্রবীরদা 'কোর বডি'র সামনে নতুন এক তত্ত্বের কথা শোনালেন, যা আগে কখনও শুনিনি। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার এক নতুন পথ। সালটা ২০০২। স্থান : হলদিয়া। বললেন, আমাদের দেশের কথাই ভাব, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে হারানো কি এ-যুগে সম্ভব? ভারত আক্রান্ত হলে আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগুলো সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেই। বর্তমান সময়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল অসম্ভব। একে আত্মহননকারী চিন্তা বলতেই পারি। আমাদের লক্ষ্য সাম্যবাদ আনা। তা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আনতে হবে—এমনটা সত্য নয়।

গ্রাম্যস্বরাজ, স্বয়ম্ভর গ্রাম, কমিউন বা সমবায়ের মাধ্যমেই আমরা সাম্যের সমাজ গড়তেই পারি। এই স্বয়ম্ভর গ্রাম গড়তে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে দলিত ও শোষিত শ্রেণির মানুষদের। আমাদের কাজ হবে তাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা। পাঁচ-দশ-বিশ-চল্লিশটা গ্রাম নিয়ে এই সমবায় গড়ে উঠতে পারে। তাদের চিন্তাকে সার্থক রূপ দিতে সাহায্যকারীর ভূমিকা নেবে সাম্যের সমাজ গড়ার নিবেদিত জনা দুয়েক করে এগিয়ে থাকা সমাজ সচেতন তরুণ-তরুণী। তারা সরকারের খাস জমি চাষের জন্য পেতে সরকারি সাহায্য নেবে। গ্রামে বিদ্যুৎ আনা, রাস্তাঘাট, পুকুর, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সেচ, কমিউন হল ইত্যাদি তৈরি করতে সমস্ত রকম

সরকারি সাহায্য নেবে। আধুনিক চাষের জন্য কৃষিবিজ্ঞানীদের সাহায্য নেবে। অযাচিত সরকারি অফিসারদের আনাগোনা ও রাজনৈতিক দলের আনাগোনা বন্ধ করতে উপেক্ষাই সেরা উপায়। সমবায় গ্রামগুলোর শ্রীবৃদ্ধি পুরোপুরি গ্রামবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল, গ্রামবাসীদের গণতান্ত্রিক ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল।

একটা গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি দশটা গ্রামকে সমবায় গড়তে উদ্বুদ্ধ করবে। যত বেশি বেশি করে স্বনির্ভর গ্রাম গড়ে উঠবে, ততই বেশি বেশি করে মানুষ গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। জনগণের কাছে যতই সমবায়গ্রাম ও গণতন্ত্র গ্রহণযোগ্যতা পাবে, ততই শোষণ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে উঠতে থাকবে।

মনে রাখতে হবে দলিতদের শ্রেণিশত্রু উচ্চবর্ণের ধনী জমিদার-জোতদাররা। জমিদারি প্রথা বন্ধ করতে আইন হলেও বাস্তবে বন্ধ হয়নি। এইসব ধনী জমির মালিকদের আছে ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী। তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে অস্ত্র শিক্ষা, গেরিলাযুদ্ধ, সবই শেখাতে হবে দলিতদের। অস্ত্র থাকবে। প্রয়োগ করা হবে আত্মরক্ষার্থে।

এরপরও অনেক কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। সেসব প্রশ্ন আমরা রেখেছিলাম। তবে তার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। প্রবীরদা সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলেন স্পষ্ট ভাবে। আলোচনায় উঠে এসেছিল বিহারের গয়া জেলার শব্দগাঁও এর কথা, মহেশ সরিতার কথা। কীভাবে মহেশ ও সরিতা একের পর এক গ্রামকে স্বয়ম্ভর করে তুলছেন, সে কাহিনিও উঠে আসে।

দেখেছি মহেশের দাদা মাসে একদিন করে আসতেন আমাদের ক্রিক রো-র স্টাডি ক্লাসে। সমবায় গ্রাম নিয়েই নানা সমস্যার কথা আলোচনা হত। মহেশ ও সরিতা অতি উচ্চশিক্ষিত, গ্রামে মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। তিরিশ-চল্লিশটা গ্রামের মানুষ ওদের ভালবাসতেন। প্রবীরদা বোঝাতেন, তোমরা অস্ত্র রাখো, ট্রেনিং দাও। নতুবা একদিন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের হামলা হলে তা ঠেকাতে পারবে না। অস্ত্রহীন থেকো না।

প্রবীরদার যখন শব্দগাঁও যাওয়ার কথা, তার দিন পনেরো আগে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের বাহুবলীদের হাতে প্রাণ দিলেন মহেশ ও সরিতা। মনে হল প্রবীরদার কথা শুনলে হয়তো মৃত্যু ঠেকানো যেত। যেমন—প্রবীরদা বারবার আলোচনায় বলেছেন, যেখানে সম্ভব সেখানেই কারখানা, চা-বাগান, খনি, পরিবহণ ব্যবসা থেকে হোটেল ব্যবসা—সর্বত্র এই সমবায় চিন্তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। আমাদের দেশ কৃষির উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল। তাই কৃষি ও কৃষিজাত শিল্প, যেমন খাবার তেল উৎপাদন থেকে শুরু করে আলুর চিপস সবই গ্রামে তৈরি হবে। গড়ে উঠবে চিনি কল থেকে ফল সংরক্ষণ শিল্প। সরকারকে ট্যাক্স দিলে পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে যা পাওনা তাও আদায় করতে হবে।

গ্রামের মানুষরা নিজেরাই নিজেদের ভাল-মন্দ ঠিক করবে। মদের ভাটি, জুয়ার আড্ডা, পর্নো সিনেমা, বেশ্যালয় ইত্যাদি ভাঙতে হবে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ার স্বার্থে। প্রয়োজনে পরিকল্পনাকে সার্থক করতে বিদেশি সাহায্য নিতে হবে।

স্বয়ম্ভর গ্রাম শুরু হওয়ার পর গ্রামের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। এই ছিল স্বয়ম্ভর নীতির মোদ্দা কথা।"

অঞ্জনের বয়ান :

"হলদিয়ায় গিয়ে হোটেলের একটি ঘরের মধ্যে টানা দু-দিন সময় কাটিয়েছি আমরা ক'জন। বিতর্ক চলতে থেকেছে আর আমরা সময় ভুলেছি, ভুলেছি খেতে, ঘুমোতে, বেড়াতে। আলোচনার প্রধান বিষয়গুলি মোটামুটি এরকম ছিল– কোটি কোটি মানুষের স্বপ্নের সমাজতন্ত্র আজ বিপর্যস্ত। পুঁজিবাদীরা বলছে যে মার্কসবাদ মৃত, অচল। সমাজতন্ত্র একটা ইউটোপিও ধারণা। পুঁজিবাদই পৃথিবীর একমাত্র ভবিষ্যৎ। তাহলে আমরা যুক্তিবাদী, মানবতাবাদীরা এই অসাম্যের পুঁজিবাদী সমাজকে মেনে নেব? বিকল্প সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করা কি সম্ভব? করলে কীভাবে?

আপনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে যতদিন শোষণ থাকবে, অসাম্য থাকবে ততদিন মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতাও থাকবে। তবে মার্কসবাদ কোনও মৌলবাদ নয় যে তাকে অনড় হতে হবে। কোনও দেশের আর্থসামাজিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সময়ের সাথে সাথে মার্কসবাদকে পরিবর্তন করে তার প্রয়োগ কৌশল ঠিক করতে হয়। যেটা করেছিলেন রাশিয়াতে লেনিন, চিনে মাও-সে-তুঙ বা ভিয়েতনামে হো-চি-মিন।

সুতরাং মার্কসের তত্ত্বের বাইরে গিয়ে ওরা বিপ্লব সফল করেছিলেন। সেই মার্কসের তত্ত্ব অনুযায়ী সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা বর্তমান পৃথিবীতে আর সম্ভব নয়। প্রশ্ন, কেন নয়? উত্তর ছিল—সারা পৃথিবী এখন একটা গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। যেখানেই সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত হবে, সেখানেই রাষ্ট্রশক্তিকে সাহায্য করতে ছুটে আসবে উন্নত প্রযুক্তি ও আরও উন্নত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমেরিকার মতো ধনতান্ত্রিক দেশগুলি। এর উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই অসম লড়াইয়ে বিপ্লবীদের সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এর উদাহরণ কলম্বিয়া, বলিভিয়া এমনকী গত শতকের ছয়ের দশকের ভারত।

তবে বিকল্প রাস্তা কী? রাস্তা আছে। আমরা যে সাম্যের সমাজের স্বপ্ন দেখি সেখানে কোনও শোষণ থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না, অসাম্য থাকবে না। এটা বলে রাখা ভাল সাম্য মানে এই নয় যে, একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা প্রফেসর ইত্যাদি উচ্চপেশার মানুষের আয় একজন শ্রমিক বা কৃষক বা সাধারণ কর্মচারীর

আয় এক হবে। আয়ের মানের অবশ্যই ফারাক থাকবে তার গুরুত্ব অনুসারে। কিন্তু সেই ফারাকটা বা বৈষম্যটা যেন আকাশছোঁয়া না হয়। কুড়ি গুণের বেশি না হয়। আমাদের দেশে গরিব মানুষেরা না খেতে পেয়ে মারা যায়, তাদের আয় ন্যূনতম, সম্পত্তি বলতে নিজের জীর্ণ, ছেঁড়া কাপড়, কারও বা তাও নেই। কিন্তু অপরদিকে টাটা, বিড়লা, আম্বানিদের সম্পত্তির পরিমাণ লক্ষ কোটি টাকার মতো, কিংবা উচ্চবিত্তরা আয় করে বছরে কয়েকশো কোটি টাকা। এই বৈষম্য কখনওই কাম্য হতে পারে না। তাহলে বিকল্প রাস্তাটা শুরু হবে কোথা থেকে?

উত্তর ছিল—আমাদের মতো দেশে ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে, তাহলে এই ৭০ শতাংশ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে গেলে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে। তা করতে গেলে আমাদের স্বয়ম্ভর গ্রাম তৈরি করতে হবে এবং তা করতে হবে সমবায় বা কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে। অর্থাৎ আমাদের সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে। ধরা যাক, ৮-১০টি গ্রাম নিয়ে একটি সমবায় গঠন করা হল। গ্রামবাসীরা নির্বাচিত করবে ওই সমবায়ের পদাধিকারীদের যারা অবশ্যই গ্রামগুলির অধিবাসী, বাইরের লোক নয়। ওই সমবায় সরকারের পতিত জমি পেতে সরকারি সাহায্য নেবে এবং পরিচালিত করবে একত্রিত জমিতে যৌথ চাষ ব্যবস্থা, যৌথ সেচ ব্যবস্থা, সরকারি সাহায্যে বিদ্যুৎ আনা, রাস্তা-ঘাট তৈরি করা। সরকার বা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ট্রাক্টর কিনে, উন্নত সার-বীজ কিনে ফসল উৎপন্ন করা। উৎপন্ন ফসল প্রতিটি পরিবারের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করে অতিরিক্ত ফসল বিক্রি করে সেই টাকায় অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস গ্রামবাসীকে জোগান দেওয়া, ঋণ শোধ করা, ইস্কুল-স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা, মহিলাদের দ্বারা বিভিন্ন স্বনিযুক্তি প্রকল্প তৈরি করা ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকার থেকে অর্থ বা অন্যান্য সাহায্য নেওয়া হবে। কেননা সরকারের অর্থ উপার্জন প্রধানত দেশের জনগণের থেকে আদায় করা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ করের মাধ্যমে। সুতরাং দেশের জনগণের একটা অংশ হিসাবে গ্রামবাসীদের সরকারের অর্থ সাহায্য পাওয়ার অধিকার অবশ্যই আছে।

গ্রামগুলির প্রতিটি কাজেই গ্রামবাসীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে বা সমবায়কে সাহায্য করবে। এইভাবে তৈরি করতে হবে স্বয়ম্ভর গ্রাম বা কমিউন। এই স্বয়ম্ভর গ্রামগুলিকে দেখে আশপাশের অন্যান্য গ্রামগুলি কমিউনের বা সমবায়ের মাধ্যমে নিজেদের স্বয়ম্ভর গড়ে তুলতে আকৃষ্ট হবে। এইভাবে স্বয়ম্ভর গ্রামগুলি বাড়তে বাড়তে সামগ্রিকভাবে একটা বড় অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাত্রার মানের একটা উল্লম্ফন ঘটতে থাকবে। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের এই উল্লম্ফন বা বিপ্লবই হল প্রকৃত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব।

প্রশ্ন হল, এই ব্যবস্থার মধ্যে দুর্নীতি কি প্রবেশ করতে পারে না? আপনি

বলেছিলেন— স্বয়ম্ভর গ্রামগুলির শ্রমজীবী মানুষেরা যেহেতু সক্রিয়ভাবে প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণ করবে, তাই তাদের শ্রমভিত্তিক উৎপাদনে দুর্নীতিবাজদের থাবা বসাতে দেবে না। কেউ দুর্নীতি করলেই সক্রিয় গ্রামবাসীদের চোখে পড়বেই। পড়লেই বহিষ্কার করতে হবে। প্রবীরদার এই তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠল, যেখানে সরকারের খাস জমি নেই, সবই জোতদারদের জমি। তারা তো খেতমজুর নিয়োগ করে চাষ করে, শোষণটাও হয় মাত্রা ছাড়া, সেখানে?

সেখানেও সমস্যা হবে না বলেছিলেন আপনি। সমবায় থেকে জোতদারদের জমি চেয়ে নেওয়া হবে চুক্তির মাধ্যমে, বছরের শেষে সমবায় চুক্তি মতো অর্থ বা ফসল জোতদারকে দিয়ে দেবে। কোনও দায় না নিয়েই তাদের চাহিদা মিটলে তারা আপত্তি করবে কেন? যদি আপত্তি আসেই তবে জোতদারদের জমি ছেড়ে দিয়ে উন্নততর চাষ হতে থাকবে। জোতদারদের জমিতে চাষ করতে যাবে না কোনও কৃষক। শেষ পর্যন্ত জমি ওরা দেবেই। এটাই হল স্বয়ম্ভর গ্রাম বা কমিউন গড়ার নির্মাণ প্রকল্প। জানি তোমরা ভাবছ এই ভূস্বামীদের মাফিয়া বাহিনী এই স্বয়ম্ভর গ্রাম গড়ার পরিকল্পনা বানচাল করার চেষ্টা করবে না? অবশ্যই করতে পারে। যারা চায় অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে তারা তা করবেই এবং তখনই আসবে প্রতিরোধ বা সংঘর্ষের প্রশ্ন।

আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ, সংগ্রাম বা হত্যার আইনি অধিকার সংবিধানস্বীকৃত। মনে রাখতে হবে বিহারের শব্দগাঁও অঞ্চলে এইরকম স্বয়ম্ভর গ্রাম গড়ার কাজকে সার্থক করেছিলেন মহেশ ও সরিতা। তাঁদের প্রাণ দিতে হয়েছিল মাফিয়াদের হাতে। কৃষকদের জমির দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল সিপিএমের বিধায়ক অজিত সরকারকে। সাহাবুদ্দিন বা পাপ্পু যাদবের মতো মাফিয়াদের কাছ থেকে আঘাত আসবেই। তাই প্রয়োজনে সংঘর্ষে যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকা চাই। আঘাত করলে প্রত্যাঘাত আসবেই, এই বিশ্বাস মাফিয়াদের মনে ভয়ের সঞ্চার করবে। এটা মনে রাখা অবশ্যই জরুরি যে শুধুমাত্র সংঘর্ষই যেন একমাত্র কর্মসূচি না হয়। নির্মাণের কাজকে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং মাফিয়াদের সন্ত্রাসকে উৎখাত করার স্বার্থেই প্রয়োজনভিত্তিক সংঘর্ষে যাওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হবে। এই নির্মাণ এবং সংঘর্ষ হল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা দিক। এর সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ভুলে গেলে চলবে না।

মাও সে তুঙ বলেছিলেন, বিপ্লবের আগে, বিপ্লবের সময় ও বিপ্লবের পরে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কোনও বিকল্প নেই। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীরা ঈশ্বর, ধর্ম, আত্মা, কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, পাপ-পুণ্য, ভাগ্য, জ্যোতিষ প্রভৃতি যে শোষণ ও অসাম্য টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে, তা বোঝাবে ওই অঞ্চলের মানুষকে। তাদের চেতনাকে প্রগতিশীল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে।

তবে বলপূর্বক নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিহীন বিকল্প উৎসবগুলিকে, যেমন নববর্ষ, পৌষ সংক্রান্তি, মনীষীদের জন্মদিন, গান, মেলা, নাট্য উৎসব, খেলাধুলা প্রভৃতিকে আরও সাড়ম্বরে পালন করতে হবে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পথ দেখিয়েছিলেন। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নিজের প্রক্রিয়াকে বিন্দুমাত্র অবহেলা করলে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যা এখন বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দেখতে পাই।

এই ধরনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে দিনের পর দিন। যেমন এই সমাজ ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীর ভূমিকা কী হবে, ব্যক্তি পুঁজির ভূমিকা কী হবে? সংবাদ মাধ্যমগুলির স্বাধীনতা কতদূর থাকবে? বিচারব্যবস্থা, শহরের জীবনযাত্রা, শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণ করার অধিকার ইত্যাদি হাজারও বিষয়।

সত্যি কথা বলতে কি আপনার কাছে এইসব শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম, কিন্তু তার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে আমি যে সন্দিহান ছিলাম তা অস্বীকার করি না।

প্রবীরদা আপনি এই সমবায় তত্ত্ব নিয়ে অলোচনায় বারবার আলোচনায় বসেছেন, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সাম্য আনায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে। ফলে কয়েক বছর ধরে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর গ্রাম বা কমিউন তৈরি করার একটা কর্মযজ্ঞ দেখতে পাচ্ছি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এদেশে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার গ্রামে স্বয়ম্ভর গ্রাম তৈরি হয়ে গেছে। সংখ্যাটা বাড়ছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, প্রতিবেশী নেপাল থেকে সুদূর লাতিন আমেরিকার ভেনেজুয়েলা পর্যন্ত। নেপালে মাওবাদীরা রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করছে ১৯৯৬ সাল থেকে। গত তিন-চার বছর ধরে তারা সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণের কাজও করে যাচ্ছে সমান তালে। নেপালের প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রামকে স্বয়ম্ভর গ্রাম বা কমিউনে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। সেখানে তাঁদের নিজস্ব সমান্তরাল শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। তারা এখন সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছে। দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করে ওই কর্মযজ্ঞ প্রদর্শন করছে, প্রশংসাও পাচ্ছে। এই মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেপালের সমস্ত দারিদ্রপীড়িত মানুষেরা কাঁধে কাঁধ দিয়ে মাওবাদীদের সঙ্গে শামিল হয়েছে। আর ভেনেজুয়েলা ফ্যাসিস্ট-ফৌজি দমন নীতির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে সংগ্রাম করছে প্রেসিডেন্ট হুগো সাভেজের নেতৃত্বে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ-এর নির্দেশিত বিশ্বায়নকে ছুড়ে ফেলে স্বয়ম্ভর জনগোষ্ঠী বা সমবায়ের মাধ্যমে স্বাধীন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার কাজ করছে ভেনেজুয়েলা। তৈল সমুদ্র ও স্বয়ম্ভর গ্রামকে ভিত্তি করে সেখানে তৃণমূলস্তর থেকে গণতন্ত্র প্রসারিত হচ্ছে। তাকে কেন্দ্র করে লাতিন আমেরিকার অন্য দেশগুলি আর্জেন্তিনা, ব্রাজিল, পেরু, চিলি, বলিভিয়া প্রভৃতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাত

থেকে মুক্তি পেতে চাইছে, সেখানেও জন-জাগরণ হচ্ছে।

আজ আমেরিকার পয়লা নম্বর শত্রু লাদেন বা সাদ্দাম নয়, শত্রু হুগো সাভেজ, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট।

এই যে ধনতন্ত্রের বিকল্প সাম্যের সমাজব্যবস্থা বা ইউরোপের সমাজতন্ত্র পতনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হতাশ করেছিল, তা যে আবার নতুন রূপে মার্কসবাদের মৌলিক নীতিকে লঙ্ঘন না করেই সম্ভব, তার রূপায়ণ ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিবেশী নেপাল, ভেনেজুয়েলায় ও অন্যান্য দেশেও দেখতে পাচ্ছি। এটাই একবিংশ শতাব্দীর 'নব্য সমাজতন্ত্র' (Neo-Socialism)। এই সমবায়ভিত্তিক সমাজনীতিকে নেপালে বলছে মাওবাদ, ভেনেজুয়েলায় বলিভারিয়ানবাদ। তা কিন্তু আসলে সমকালীন যুক্তিবাদ-ই।"

অধ্যায় : ছাব্বিশ

আমার দেখা অসাধারণ কিছু আইনজীবী

আমার জীবনে প্রচুর অ্যাডভোকেটকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাঁদের অনেকেই অর্থলোভী, কেস ঝুলিয়ে রাখেন, টাকার বিনিময়ে কেস হারিয়ে দেন ইত্যাদি। জীবনে ছয়জন অ্যাডভোকেট দেখেছি যাঁরা আমার পরম শ্রদ্ধেয়। গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সনাতন মুখোপাধ্যায়, রামজিৎ রাম, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (বাচ্চুদা) ও চিন্ময় চৌধুরি।

একবার হাওড়ার এক তান্ত্রিক। নাম গোরাবাবা। তিনি পুলিশের কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। আমি তার আশ্রমে লুঠপাট করেছি ১০ জন লোক নিয়ে। আমার বিরুদ্ধে ডাকাতির ক্রিমিনাল কেস হল। কেসটা উঠলো হাওড়ার সেশন কোর্ট-এ। জাজ অভিযোগ শুনেই আমাদের জেল হেপাজতের অর্ডার ডিক্টেশন দিতে লাগলেন। টাইপিস্ট টকাটক টাইপ করে যাচ্ছেন। সনাতনদা, বাচ্চুদা জাজকে বারবার বোঝাতে লাগলেন—এটা প্রবীর ঘোষের বিরুদ্ধে মিথ্যা চক্রান্ত। উনি বুজরুকদের ধরার চেষ্টা করেন। গোরাবাবা একজন বুজরুক ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরকার পক্ষের প্রধান উকিল চিন্ময় চৌধুরি কাঠগড়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাদের মধ্যে কে প্রবীর ঘোষ? হাত তুলুন।

আমি হাত তুললাম।

চিন্ময় চৌধুরি উঠে দাঁড়ালেন। জজ সাহেবকে বললেন, প্রবীর ঘোষ একজন পাবলিক ফিগার। ধর্মের নামে যারা প্রতারণা করে তাদের বেআব্রু করা ওনার ব্রত। উনি ডাকাতি করতেই পারেন না। এটা মিথ্যে কেস স্যার। জামিন দিয়ে দিন। আমার অনুরোধ।

ডাকাতির অপরাধে জামিন মেলে না। জেলখানা থেকে কোর্টে যেতে হয় আবার জেলখানাতেই ফেরত আসতে হয়।

চিন্ময়বাবুর কথাতে জাজ অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের দশজনকেই জামিন দিলেন। এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার।

কেসটা কয়েকমাস চলেছিল। কেসটা অসাধারণ লড়লেন সনাতন মুখার্জি। তিনি দারুণ যুক্তি হাজির করে প্রমাণ করে দিলেন গোরাবাবা সম্পূর্ণ মিথ্যে একটা কেস হাজির করেছিল। না, তাঁদের কাউকেই আমার সম্মান মূল্য দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। অ্যাডভোকেট সনাতন মুখার্জি এবং বাচ্চুদা আমার কাছ থেকে এক পয়সাও ফিস্ নেননি। সনাতনদা বলেছিলেন, আপনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছেন। আমরা সহযোগিতা করতে পারছি। এটাই আমাদের ভাল লাগছে।

এই কেসে গোরাবাবার পক্ষে যুক্তিবাদী সমিতির কিছু বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারীরা হইহই করে যেত, আমার জেল হবে ধরে নিয়ে। কিন্তু, আমরাই কেসটা জিতলাম।

আমাদের সমিতির কিছু প্রাক্তনী আমাকে সমিতি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে কোর্টকে জানাল। এইসময় আমাদের এই কেসটা বিনা পারিশ্রমিকে লড়লেন গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আমরা কেসটা জিতলাম। গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্মান মূল্য দিয়ে কেসটা চালাবার আর্থিক ক্ষমতা আমাদের ছিল না। তিনিও আমার সততাকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই বিনা পারিশ্রমিকে কেসটা লড়েছিলেন।

জ্যোতিষী জয়া গাঙ্গুলি-র বিরুদ্ধে ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট ধারাতে একটা কেস করেছিলাম কলকাতার সিটি সিভিল কোর্টে। জয়া গাঙ্গুলির পক্ষে ল'ইয়ার ছিলেন রাজ্যের তৎকালীন আইনমন্ত্রীর ছেলে। সুতরাং জাজেদের রায় আইনমন্ত্রীর ছেলের পক্ষেই চলে গেল। আমরা কেসটা হারলাম। তারপর বিনা পারিশ্রমিকে হাইকোর্টের নামজাদা ল'ইয়ার বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য কেসটা নিলেন। সেইজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমাদের সমিতি থেকে বহিষ্কৃত ষড়যন্ত্রকারীরা বারাকপুর কোর্টে একগাদা কেস করল আমার বিরুদ্ধে। রামজিৎ রাম একজন প্রবীণ ল'ইয়ার। চশমার ডাঁটিটা বাঁকা। শার্টের একদিক প্যান্টে গোঁজা তো আর একদিক নয়। তিনি আমাদের হয়ে লড়লেন। আর বিপক্ষদের অর্থের অভাব নেই। তান্ত্রিক, জ্যোতিষী, জাদুকর প্রত্যেকেই তাদের অর্থ বিলিয়েছে। সুতরাং, তাদের ল'ইয়ারও বিশাল মাপের।

রামজিৎ রাম প্রতিটা কেস-ই অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গেই লড়লেন। তিনি লড়েছিলেন সততার পক্ষে বিনা পারিশ্রমিকে এবং প্রত্যেকটাতে আমাদের জিতিয়েছিলেন।

অধ্যায় : সাতাশ

প্রতিরোধ চাই-ই

২০০০ সালের গোড়ার দিকের একটি ঘটনা। ঘটনাস্থল বিহার, ঝাড়খণ্ড ও আশপাশের এলাকা। এই এলাকার অরণ্যের গাছ রক্ষার জন্য রয়েছে বিশাল সশস্ত্র রক্ষী বাহিনী। এরা হল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের স্টাফ।

তবু অরণ্য-মাফিয়াদের নেতৃত্বে গাছ কাটা হচ্ছে প্রতিদিন। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। রক্ষীরা অবশ্য নীরব দর্শক নয়। ওরা হিসেব রাখে বিভিন্ন মাফিয়াদের কে কত গাছ কেটে নিয়ে গেল। পাওনা কত হল। হিসেব কষে পাওনা আদায় করে। এইসব চোরাই গাছ প্রকাশ্যে বিভিন্ন হাটে বিক্রি হয়। সেখান থেকে লরিতে চেপে গাছগুলো যায় করাত কলে। চোরাই গাছের কল্যাণে করাত কলের সংখ্যাও রমরম করে বেড়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর মন্ত্রী-সচিব-পুলিশ-প্রশাসন-পরিবেশ দপ্তর সব্বাই এইসব খবর সুদীর্ঘ বছর ধরে জানে। রাজ্যের মানচিত্র পাল্টেছে, সরকার পাল্টেছে, কিন্তু জঙ্গল মাফিয়া রাজ পাল্টায়নি। ওয়াকিবহাল মহল বলে, এ এক বিরাট চক্র, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ সব্বাই। প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার কাঠ লুঠ হয়ে যাচ্ছে, করার কিচ্ছু নেই।

নকশালরা আদেশ জারি করল—বেআইনিভাবে গাছ কেটে যারা অরণ্য উজাড় করবে, রেহাই পাবে না এদের সঙ্গে যুক্ত অরণ্যরক্ষী থেকে করাত মালিক কেউ-ই। তাদের হাত কেটে নেওয়া হবে। ম্যাজিকের মতো কাজ হয়েছে। মাফিয়া-রক্ষী-কাঠ ব্যবসায়ীদের সুদীর্ঘকালের আঁতাত শিকেয় তুলে ত্রিমূর্তি এখন 'ধোয়া তুলসীপাতা'। গাছ কাটা, গাছের বাজার রাতারাতি বন্ধ।

মাফিয়া-রক্ষী-পুলিশ-প্রশাসকদের শক্তিশালী আঁতাতও বোঝে কোনটা ফাঁকা আওয়াজ, কোনটা সারগর্ভ।

গাছ
কাটলে
হাত

গেরিলা পদ্ধতিতেই বন্দিমুক্তি

শোষকরা ডিক্টেটরের মতো। শোষণের বিরুদ্ধে মুখ খুললে, প্রতিবাদ করলেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার তকমা সেঁটে বিনা বিচারে জেল বন্দি করে। এমন একটা হিড়িক তুলেছিল শোষক সরকার।

২০০৪-'০৫ সাল। এই সময়ে বিভিন্ন সাম্যকামী গ্রুপের কর্মধারায় বিশ্বাসীদের ধরে বিনা বিচারে বন্দি করা হচ্ছিল। সংখ্যাটা ১৩০-১৪০ হবে। তখন আঁটসাঁট ঘেরাটোপের জন্য ভারতের কুখ্যাত জেল বিহারের জেহানাবাদ। এখানেই রাখা হয়েছিল নকশাল বন্দিদের। জেলখানার বাইরে মিলিটারি ক্যাম্প ছিল। তাতে সেনার সংখ্যা হাজার দুয়েক। উদ্দেশ্য জেলবন্দিদের কেউ যাতে মুক্ত করে নিয়ে না যেতে পারে।

জেহানাবাদটা হল পাটনার দক্ষিণে কিছুটা এগোলেই। বিহারে মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি ছিল—পালামৌ, গয়া, জেহানাবাদ। এই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে মাওইস্টদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। জেহানাবাদে সিপিআই (এম এল) (লিবারেশন)-এর প্রভাব ছিল।

২০০৫-এর গোড়া থেকেই বিনা বিচারে বন্দিদের পক্ষে গোপনে ব্যাপক একটা ক্যাম্পেন চলছিল। এই অঞ্চলের কৃষিজীবীরা ও কমরেডরা কেউই গেরিলাযুদ্ধ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল না।

বন্দিদের মুক্ত করতে জেলখানায় গেরিলা আক্রমণ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হল কোনও এক বাঙালিবাবুকে।

জেহানাবাদের আশপাশের কমরেডদের নিয়ে কয়েকটা গ্রুপ ভাগ করে কিছুদিন ধরে বোঝালেন যুদ্ধের কৌশল কী হবে।

১ নভেম্বর, ২০০৫। পাটনা হয়ে জেহানাবাদের উপকণ্ঠের একটা গ্রামে পৌঁছলেন সেই ভদ্রলোক। তারপর কিছু পরিকল্পনা করলেন।

১৩ নভেম্বর, ২০০৫। জনা তিরিশেক বন্দিমুক্তির দায়িত্বে থাকা যোদ্ধারা মাইকে ঘোষণা করতে করতে জেলখানার দিকে এগোলেন। মাইকে বারবার ঘোষণা রাখা হচ্ছিল, আমরা বিনা বিচারে বন্দিদের মুক্ত করতে জেহানাবাদ জেলে অভিযান চালাতে যাচ্ছি। আপনারা সকাল পর্যন্ত ঘরের বাইরে বেরোবেন না। বেরোলে গুলিগোলায় মৃত্যু হলে আমরা দায়ী থাকব না। আমরা আপনাদের ভালবাসি। আপনাদের শুভেচ্ছা নিয়েই আমরা এগোচ্ছি। আপনারা ঘরের ভিতর থেকে আমাদের সহযোগিতা করুন।

এদের নেপথ্যবাহিনী ছিল অত্যন্ত মজবুত ও সংখ্যায় অনেক।

ঘোষণা হল জনগণের জন্য, কিন্তু পাহারায় থাকা সেনারা পালিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তরে। জেলের সদর দরজায় পৌঁছে যখন মাইকে ঘোষণা করা হল,

আপনারা জেলের গেট খুলে দিন। নতুবা আমরা গেট ভেঙে ঢুকলে আপনাদের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। আমরা চাই না আপনাদের মতো নিরীহ সরকারি কর্মচারীরা বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ হারান।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ঝনাৎ করে জেলের গেট খুলে গেল। প্রহরীরা রাইফেলগুলো মাটিতে রেখে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখা গেল।

তারপর, আদেশ করতেই প্রহরীরা সেলগুলোর দরজা খুলে দিল হইহই করে। সঙ্গে সঙ্গে ১৩০-১৪০ জন বিনা বিচারে বন্দি বেরিয়ে এল এবং জেল থেকে গেট পেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন খবরের কাগজে বেরোল ১৪ জন মারা গেছে। তারা কোন পক্ষের লোক, তা জানা গেল না।

সর্বাধুনিক গেরিলাযুদ্ধের পদ্ধতি প্রকরণ নিয়ে একটি বই লিখেছিলাম ২০০৯-এ। 'গেরিলা যুদ্ধের A to Z আজাদি'। অনেক নতুন তথ্য পাবেন। আগ্রহীরা পড়তে পারেন।

জয় সুনিশ্চিত করতে শক্তিশালী 'নেপথ্যবাহিনী' জরুরি

স্বয়ম্ভর-কমিউন-সমবায় গড়ে তুলতে শিক্ষিত সমাজবিজ্ঞানী, কৃষিবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সংগঠক, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ, অস্ত্র প্রশিক্ষক, আইনজ্ঞ, চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ, সেনা, আমলা প্রমুখদের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। তাঁরাই আমাদের শ্রদ্ধেয় 'নেপথ্যবাহিনী'।

যাঁদের ছাড়া আমাদের পরিকল্পনা সার্থক হওয়া সম্ভব নয়।

অধ্যায় : আঠাশ

একটু ফিরে দেখি

জানুয়ারি ১৯৯৬। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একছত্র সাম্রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গে একচ্ছত্র অপসংস্কৃতির বন্যা শহর থেকে গ্রামে। অশ্লীল নাটকের রমরমা কলকাতার সিনেমা হলগুলিতে। দুপুরের শো-তে ব্লু-ফিল্ম। গ্রাম-গঞ্জে, আধা শহরে ছোট্ট ছোট্ট হলে ব্লু-ফিল্মের রমরমা। স্কুলছুট ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে ব্লু-ফিল্ম দেখছে। কলকাতার কিছু থিয়েটার হলে পর্নো সিনেমা রমরমিয়ে চলছে।

এমন সময়ে কলকাতার বিভিন্ন সিনেমা হল ও থিয়েটার হলে যুবসমাজ পোস্টার, ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং হলগুলি শেষ পর্যন্ত অশ্লীল সিনেমা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। তখন নেতৃত্বে ছিল যুক্তিবাদী সমিতি, হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং বিপ্লবী যুব অ্যাসোসিয়েশন। এরা সম্মিলিতভাবে বিক্ষোভ দেখায়। জায়গায় জায়গায় তাদেরই বিক্ষোভে প্রদর্শনগুলো বন্ধ করতে বাধ্য হয় মালিকরা।

খবরের কাগজে যখন এই সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে তখন ছোট শহরগুলোতে ব্লু-ফিল্ম বন্ধ করতে বোমাও ফাটাচ্ছে। কিছু কিছু লোকজন আহত হচ্ছে, কিন্তু হলের শো-গুলোও বন্ধ হচ্ছে।

কলকাতা ও মফস্‌সল জুড়ে ব্লু-ফিল্মের রমরমা। সেখানের পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলছে, স্ক্রিনে আগুন, হলে বোমা। যে জনপ্রিয় সরকার এই পর্ণো সিনেমা ও থিয়েটারকে জনপ্রিয় করে তুলছিল তারা পিছু হটল। অপসংস্কৃতির গতিরোধ করা গেল।

তখন আমাদের উপর বেজায় চটলেন সিপিএম-এর এক জাঁহাবাজ মন্ত্রী, বেশ কিছু 'তান্ত্রিক' ও 'জ্যোতিষী' নামের প্রতারকরা এবং তাদের সঙ্গী হল কয়েকটা প্রিন্ট মিডিয়া। একটা প্রিন্ট মিডিয়ার ঘরেই ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করা হল। এদের সঙ্গে যোগ দিল ক্ষমতালোভী ও অর্থলোভী যুক্তিবাদী সমিতির ও হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন নেতা ও নেত্রী। সমিতি দুটোকে ভাঙার প্রবল চেষ্টায় নামল ওরা। তার সঙ্গে যুক্ত হল ফান্ডেড এনজিওরাও। সে আর এক দীর্ঘ যুদ্ধের ইতিহাস। বিস্তৃত জানতে পড়তে পারেন 'প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ'।

শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রকে ছিন্নভিন্ন করে আমরা জয় ফিরিয়ে আনলাম।

সাম্যপন্থীদের ভাঙা-গড়া

এর আগেই ২০০৪-এ পিডব্লিউজি ও এমসিসি দল দুটো মিশে গিয়ে সিপিআই (মাওইস্ট) গঠন করল। 'সশস্ত্র বিপ্লবকে বাইপাস করে' স্বয়ম্ভর সমবায় গ্রামব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্য আনার পথ গ্রহণ করল। অস্ত্র সম্বরণ করল, কিন্তু সমর্পণ নয়। এরা নকশালদের মতো ব্যক্তিহত্যার নীতিতে বিশ্বাস করল না। এ সমস্ত বিষয়টাই খবরের কাগজের মাধ্যমে জনগণ জানল ২০০৯-এ।

'নকশাল' ও 'মাওবাদী' একই আদর্শ ও ঘোষিত নীতির দ্বারা পরিচালিত নয়। যদিও নকশাল পার্টি থেকেই মাওবাদী পার্টির জন্ম। যেমন সিপিএম পার্টি থেকেই নকশাল পার্টির জন্ম, কিন্তু তাদের আদর্শ ও ঘোষিত নীতিতে অনেক প্রভেদ ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা অঞ্চলের মাওবাদী নেতা কিষেণজির ২০০৯-এর ৩১ ডিসেম্বর-এ লিখিত ও স্বাক্ষরিত বাংলার একটা চিঠি পেয়েছেন বেশ কিছু সাংবাদিক ও পত্রিকা দপ্তর। চিঠিটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরমের উদ্দেশে লেখা। তাতে ডান-বাম সমস্ত নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলকে একাসনে বসিয়ে তিনি বলেছেন, "সিপিএম, টিএমসি ও কংগ্রেসকে হিংসার পথ ছাড়ার কথা বলুন। আপনি নিজে হিংসার পথ থেকে বাইরে আসুন। হিংসা কোনও দিনই মাওবাদীদের এজেন্ডা নয় এবং হবেও না।"

মাওবাদীরা যে অন্যান্য বহু রাজনৈতিক দলের মতো মেকি গণতন্ত্রপ্রেমী নয়, প্রকৃতই গণতন্ত্রপ্রেমী, তা স্বয়ম্ভর গ্রামগুলোতে এলেই দেখা যায়। ওরা আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিআক্রমণ করতে বাধ্য হয়। ওদের সুন্দর সাম্যকামী গণতান্ত্রিক সমবায় ব্যবস্থায় নাক না গলালে ওরা কিছুই করে না। ভোটের রাজনীতিকদের গরিবি হটাবার জন্য অফুরন্ত গরিবের জোগান চাই। গরিবদের উন্নয়নের নামে বিভিন্ন ফান্ডের টাকা এলে তবে না রাজনীতিকদের পেট ভরবে।

চিদম্বরমের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে কিষেণজি আরও জানিয়েছেন, "জঙ্গলমহলে অভিযানের জন্য কেন্দ্র পাঁচশো কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ভারতে মাওদমনে "অপারেশন গ্রিনহান্ট"-এর নামে ৭৩০০ কোটি টাকা খরচ করেছে। অথচ উন্নয়নের জন্য কোনও বরাদ্দ করবে না।"

অথচ ভারতের স্বয়ম্ভর গ্রামগুলোর নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, বাহুবল ও অর্থবল ছাড়া গণতান্ত্রিক নির্বাচন হচ্ছে। ডাইরেক্ট নির্বাচন হচ্ছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রতিদিন সাধারণ ভোটদাতা মানুষগুলোর গভীর সম্পর্ক থাকছে। এরই সঙ্গে নির্বাচকদের যদি মনে হয় কোনও প্রতিনিধি নিজের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছে না, তাকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার থাকে নির্বাচকদের হাতে। সেই শূন্যস্থানে অন্য কেউ নির্বাচিত হন।

ভারত বা পৃথিবীর যেসব দেশে স্বয়ম্ভর গ্রাম বা সমবায় গড়ে উঠেছে, সেই অঞ্চলের মানুষদের কাছে কাঁচা টাকা বা লিকুইড ক্যাশের প্রয়োজন প্রায় শূন্যে পৌঁছে গেছে। ওদের অঞ্চলের শিশু থেকে বুড়ো সবার দেখভালের দায়িত্ব স্বয়ম্ভর গ্রামের বা সমবায়ের। আদিবাসীদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-পানীয়-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা শিক্ষা-বিদ্যুৎ-যোগাযোগ সবই মেলে বিনা টাকায়। এই সমাজে সক্ষম নারী-পুরুষ নিজের খুশিতে হাতে হাত লাগিয়ে কাজ করে, একে অপরকে সাহায্য করে। এই সমাজ অবশ্যই তাঁদের নির্বাচিত পরিচালকের সদিচ্ছা, শুভবুদ্ধি ও সততায় আস্থা রাখে। আবার এটাও নজরে রাখে—কেউ বিচ্যুত হয়ে চুরি করছে কি না? বিচ্যুত পরিচালককে পদচ্যুত করবার ও ফিরিয়ে আনার অধিকার আছে ওই অঞ্চলের নাগরিকদের। ওই সমাজে বেশ্যা নেই, ভাটি খানা নেই, দুর্নীতি নেই।

এমন সাম্যের সমাজে প্রয়োজনীয় যে কোনও বস্তুগত জিনিস থেকে জ্ঞান বিদ্যার মতো অবস্তুগত বিষয়—সবই দরকার মতো সবাই পায়। এমন একটা রসদভিত্তিক অর্থনীতি গ্রহণের ফলে অর্থের বিনিময় প্রায় ক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

এমন সাম্যই তো 'ক্যাশলেস সোসাইটি' প্রতিষ্ঠানকে সার্থক করে চলেছে।

স্বয়ম্ভর গ্রাম ও সমবায়ের ঘনবদ্ধ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে সে-সব জায়গায় সমান্তরাল শাসন বা স্ব-শাসন অথবা স্বায়ত্ত শাসন চালু করা হবে। এটা হবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের একটা বড় ভাগ।

এই আন্দোলনকে পালন ও পুষ্ট করার পরবর্তী ধাপ হল, জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলে নির্বাচনে অংশ নিয়ে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র'-কে কবর দেওয়া। নির্বাচন সর্বস্ব 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র'কে 'জনগণতন্ত্র বা 'People's Democracy'-তে পাল্টে দেওয়া।

আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে স্বয়ম্ভর গ্রামগুলোতে শোষকদের দালাল, রাজনৈতিক দল বা সরকার নাক গলাবার সুযোগ না পায়। সমবায়-এর সদস্যরা প্রয়োজন মনে করলে সরকারের কাছে সাহায্য চাইবে।

বিভিন্ন পথে বিশ্বাসী সাম্যকামী রাজনীতিকদের সঙ্গে বার বার আমরা যুক্তিবাদী সমিতির অর্থাৎ 'Rationnalists' Association'-এর নেতৃবর্গ আলোচনায় বসেছি। উদ্দেশ্য, একটা নির্দিষ্ট পথ খুঁজে বের করা। যেই পথ ধরে আসবে 'বিপ্লবী জনগণতন্ত্র' (Revolutionary People's Democracy)।

এই বিপ্লবী 'জনগণতন্ত্র'-এ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ক্ষেত্রগুলির পরিচালনার ভার থাকবে কৃষক, শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে। চা-বাগিচা থেকে পরিবহণ ব্যবসা সবই চালাবে সমবায়। এই সব সমবায়ের-ই শেয়ার হোল্ডার হবেন শুধুমাত্র কৃষক ও শ্রমিকরাই। তবে-ই সমবায়গুলিতে দেখা দেবে 'বিপ্লবী জনগণতন্ত্র'।

বিপ্লবী জনগণতন্ত্রে প্রতিটি 'মানুষই মানুষ' হিসেবে সম্মান পায়। ক্ষেতের

ফসল, অরণ্য, খনিজসম্পদ, জলসম্পদ, কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে গড়ে তোলা সমবায়ে কর্মী শেয়ার হোল্ডারের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শ্রমিক ছাড়া শেয়ার হোল্ডার নেই, শেয়ার বাজার নেই, ফাট্‌কাও নেই।

২০০২ সাল থেকে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। যুক্তিবাদী সমিতির কোর বডির মিটিং হয়েছিল হলদিয়ায়। লক্ষ্য ছিল সাম্যপন্থীদের মধ্যে সমন্বয়সাধন। তিনদিন হলদিয়ায় একটা হোটেলে আলোচনা হয়েছে প্রায় বিরতিহীনভাবে। খাওয়া-শোওয়া ছাড়া প্রায় সব সময়েই চলেছে তাত্ত্বিক আলোচনা।

ভারতে সাম্য প্রতিষ্ঠার ব্রতী বিভিন্ন সাম্যগোষ্ঠীর মধ্যে একটা সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে—এমন একটা পরিকল্পনা আমাদের নেওয়া জরুরি, এটা বুঝলাম। সমন্বয়কারীরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও জাতিগোষ্ঠীদের নিয়ে শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মস্তিষ্ক-যুদ্ধে নামলেন।

তারপর কাজে নেমে পড়লাম। বিভিন্ন সমগোষ্ঠীর সঙ্গে মত বিনিময় করলাম। অনেকেই সহমত হলেন। শুরু হল স্বয়ম্ভর গ্রাম গড়ে তোলার যাত্রা।

এই অভিযান অব্যাহত। দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম থেকে গ্রামে, ভারতে। ভারত থেকে বিশ্বে। দেখছি, একটু একটু করে সরে যাচ্ছে শোষণের অন্ধকার। শুনতে পাচ্ছি যৌবনের বজ্রনির্ঘোষ। আর মনে পড়ছে, সবচেয়ে অন্ধকারের পরেই আসে ভোর...

অধ্যায় : ঊনতিরিশ

অসমে

অসমের বিভিন্ন শহরে আমাদের সমিতির কিছু ব্রাঞ্চ তৈরি হয়েছে। ২০০২ সালে তাঁদের নিয়ে আমরা শিলচর থেকে অনুষ্ঠান করা শুরু করলাম। দমদম থেকে শিলচর ৫০ মিনিটের পথ। এয়ারপোর্টে নামলাম। ছোট্ট এয়ারপোর্ট। আমাদের সমিতির কিছু ছেলে ওখান থেকে রিসিভ করে আমাদের স্বাগত জানিয়ে দুটো গাড়িতে তুলল। হোটেলে প্রচুর আড্ডা দিয়ে রেস্ট নিয়ে খেলাম। ভাত ছিল আতপচালের আর বাকি সবই বাঙালিদের খাওয়া-দাওয়া। তারমধ্যেই কয়েকজন ছেলেকে অলৌকিক নয়, লৌকিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য তৈরি করে ফেললাম।

দূরদর্শনে লাইভ টেলিকাস্ট হল। ফুটবল মাঠে প্রোগ্রাম—বিশাল মাঠ। উপচে পড়া দর্শক। পৃথিবী বিখ্যাত কয়েকজন গডম্যানদের ভাণ্ডাফোড় কীভাবে করেছি দেখিয়ে তারপর অনেকক্ষণ তাত্ত্বিক আলোচনা হল।

রাতে একটা গেস্ট হাউজে ঢুকলাম আমরা। আমার সাথে ছিল সমিতির এক অ্যাক্টিভ সদস্য ও তাঁর হবু পত্নী। সেখানে অপেক্ষা করছিল ওর কয়েকজন বন্ধু। ওই বন্ধুরা, বন্ধু-পত্নীকে জড়িয়ে ধরে প্রত্যেকে চুমু খেল সাবলীলভাবে।

রাতে গেস্ট হাউজে একটা জমজমাট আড্ডা চলছিল। হবু বন্ধু-পত্নীটি এল। পরনে সালোয়ার-কামিজ। বয়স বছর কুড়ি, খুব সুন্দরী। কোথাও চেয়ার না পেয়ে এসে বসল আমার কোলে। আমার পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। আমি খুব অস্বস্তি বোধ করে বললাম, যা ওঠ।

—কী হইছে। তুমি তো আমার বাপের মতো। আমি তো আমার বাপের কোলেও বইসা পড়ি, সে তো কিছু কয় না।

গোটা উত্তরপূর্বের সাতটি প্রদেশেই ফ্রি-সেক্সের চল আছে।

আড্ডা দিতে দিতে দেখলাম যাঁরা আমাদের পাহারা দিচ্ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র। এর কারণ জিজ্ঞেস করায় জানলাম, বজরং দল প্রচুর পোস্টার মেরেছে অসমে। 'প্রবীর ঘোষের মুন্ডু চাই।'

পরের দিন সকালে বেরিয়ে গেলাম গাড়িতে। শিলচর থেকে যাব হাফলং। একটা গাড়িতে আমরা বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট দশেক পরে আর একটা গাড়ি বেরল। পুলিশরা আমাদের যাত্রায় বাঁধা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এখান থেকে অনেকগুলো গাড়ি যাওয়ার জন্য একসাথে ছাড়া হয় এবং সামনে-পিছনে সেনাদের গাড়ি পাহারায় থাকে। নাহলে যে কোনও সময় আক্রান্ত হতে পারেন।

আমি বারবার বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি করালাম যে আমি আমাদের রিস্কেই গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

ড্রাইভারদের বুঝিয়ে দিলাম কোনও জায়গায় আলফা উগ্রপন্থীরা গাড়ি আটকাবার চেষ্টা করলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেবে। তোমরা কেউ নামবে না। আমি নেমে কথা বলব। এমনটা বলার কারণ, আলফা উগ্রপন্থীদের নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের অনেকেই আমাকে চেনেন এবং আমাকে শ্রদ্ধাও করেন।

হাফলং-এ একটা অনুষ্ঠান করে পরের দিন আবার যাত্রা শুরু। এখানে প্রচুর বাড়ি কাঠের, ছাঁদ টিনের।

এমনই এক-একটা শহরে অনুষ্ঠান করতে করতে সাত নম্বর অনুষ্ঠান করলাম গুয়াহাটি বইমেলায়। গুয়াহাটি বড় শহর। একজন ছাত্র নেতা, টাইটেল ভারতীয়। জানলাম, এফিডেভিট করে বড়ুয়া থেকে ভারতীয় হয়ে গেছে।

ভারতীয় জিজ্ঞেস করলেন, কী মদ চাই?

বললাম, খাই না।

কলেজের তিনটি মেয়েকে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, ওরা রাত্রিরে আপনাদের সাথে থাকতেও রাজি আছে।

বললাম, চাই না।

ইতিমধ্যে কামাখ্যা মন্দির দেখে এলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, কামাখ্যা মন্দিরের অনেক পুরোহিতই আমার নাম জানেন।

সেইদিন সন্ধ্যাতেই বইমেলার অডিটোরিয়ামে জমজমাট অনুষ্ঠান হল অলৌকিক নয়, লৌকিক। পরের সন্ধ্যায় আমার সম্মানে একটা নৈশভোজের আয়োজন করেছিল তাতে আমন্ত্রিত ছিলেন গুয়াহাটি অঞ্চলের সমস্ত বিদগ্ধ জন। খাওয়াটা ছিল বুফে সিস্টেমে।

পরের দিন আবার গুয়াহাটি থেকে দমদম এয়ারপোর্ট।

অসম আবার যেতে হয়েছিল ২০০৬-এর ফেব্রুয়ারিতে। আলফা গোষ্ঠীর যেসব উগ্রপন্থীরা অস্ত্র সমর্পণ করে সমবায়ের মাধ্যমে চাষ-বাস করছিলেন, তাঁদের আহ্বানে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা নিয়ে গেল গোহালপাড়া জেলার চিকনাই-এ।

থাকার ব্যবস্থা রাজকীয়। এখানে আমাদের মূল অনুষ্ঠানটা হল যারা আলফা থেকে সারেন্ডার করে মূলস্রোতে ফিরতে চেয়েছে তাঁদের জন্য। তাঁদের ভয়ঙ্করভাবে শোষণ করে চলেছে রাজনৈতিক নেতারা।

ওরা জমি পেয়েছে। সব জমিতে একসঙ্গে চাষ করে সমস্ত ফসল নিজেদের মধ্যেই বন্টন করে। এই স্বয়ম্ভর গ্রামের আইডিয়াতেই ওরা চলে।

অস্ত্র সমর্পণকারীদের তীব্র ক্ষোভ—যাঁরাই সারেন্ডার করেছে, তাঁদের কাছ থেকে সরকারি মন্ত্রীরা মোটা তোলা আদায় করছে। এই শোষিত মানুষগুলো বাধ্য হয়ে আবার অস্ত্র নেওয়ার কথা ভাবছে। আমাকে নিয়ে গেছিলেন যাতে আমি সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে একটা স্থায়ী সমাধান করতে পারি। আমার সঙ্গী ক্যামেরাম্যান শিবু। শিবু পেশাদার ক্যামেরাম্যান সুন্দর ছবি তোলেন। স্বাস্থ্য ভালো, সাহসী

আমাদের সমর্পণকারীদের তীব্র ক্ষোভ—যাঁরাই সারেন্ডার করেছে, তাঁদের কাছ থেকে সরকারি মন্ত্রীরা মোটা তোলা আদায় করছে। এই শোষিত মানুষগুলো বাধ্য হয়ে আবার অস্ত্র নেওয়ার কথা ভাবছে। আমাকে নিয়ে গেছিলেন যাতে আমি সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে একটা স্থায়ী সমাধান করতে পারি। আমার সঙ্গী ক্যামেরাম্যান শিবু। শিবু পেশাদার ক্যামেরাম্যান। সুন্দর ছবি তোলেন। স্বাস্থ্য ভালো, সাহসী।

আমাদের যখন সভাস্থলে নিয়ে যাওয়া হল তখন দেখলাম হাজারখানেক মিলিটারি ব্যারিকেড করে রেখেছে। সভা লোকে লোকারণ্য। স্টেজে আমি আর শিবু উঠলাম। আমাদের একটা করে পান, সুপারি দেওয়া হল। খেয়ে নিলাম। তারপর উত্তরীয় এবং ঢাউস সাইজের মাথায় পড়ার 'বিরাট টোকা' দেওয়া হল।

রাতে আমাদের গেস্ট হাউজে একজন উগ্রপন্থী নেতা এলেন পূর্ব কথা মতো। একটু পরেই হইহই করে দুটো জিপ নিয়ে বেশ কিছু মদ্যপ তরুণ এসে হাজির। জিপে বোঝাই AK47 এবং মদের বোতল।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, একদম হইচই করবে না। এখানে মদ খাবে না। AK47 নিয়ে এসমস্ত কী? তোমরা বলে সারেন্ডার করেছ। একটা ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসো গিয়ে। মদ খাবে না।

ওদের পাঠিয়ে দিয়ে তারপর আলোচনায় বসলাম।

আমি তখন ওদের বলতে লাগলাম কী করে ওদের সংগঠনের কাজকর্মকে ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

কোলকাতায় ফিরে একাধিক চ্যানেলকে খবর দিয়ে বলেছিলাম, আলফাদের ওপর একটা ডকুমেন্টারি বানিয়েছি। আপনারা দেখাবেন?

ওরা বলল, হ্যাঁ দিন। অবশ্যই দেখাব।

তারপর যখন ক্যাসেটের কপিটা দিলাম, দেখে আতঙ্কিত হয়ে বলল, ওরে বাবা! এটা দেখাতে পারবো না। এই আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে।

ত্রিপুরায়

ত্রিপুরায় গেছি বেশ কয়েকবার। ১৯৮৬-র ২৮ ফেব্রুয়ারিতে আগরতলা গেছি। আগরতলার প্রেস ক্লাবের হলে একটা অনুষ্ঠান ছিল অলৌকিক নয়, লৌকিক। তার তিনদিন আগে আমি আগরতলায় পৌঁছোই।

ত্রিপুরা একটা ছোট্ট রাজ্য। দুর্গম, বনাঞ্চল ও পর্বতে ঘেরা। রাজধানী আগরতলা। প্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় ৩২ লাখ।

ওখানে আমার সঙ্গী ছিলেন আমার স্ত্রী। রিসিভ করতে এসেছিলেন স্বয়ং ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ। একখিলি পান দিলেন আমার স্ত্রীকে। তারপর আমি আরও কিছু জায়গায় ঘুরব শুনে বললেন, এই ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলই সাংঘাতিক। এখানে উগ্রপন্থীদের দাপট অত্যন্ত বেশি।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই দেখলাম, সারি সারি কিছু হোটেল আছে, সবগুলোই দরমার বেড়া দেওয়া। যাইহোক, আমরা গিয়ে উঠলাম সরকারি গেস্ট হাউজে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ভালো। প্রেস কনফারেন্স নির্ধারিত দিনটি আসতে আরও তিনদিন বাকি। ইতিমধ্যে আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। কিছু অঞ্চলে অলৌকিক নয়, লৌকিক অনুষ্ঠান করব। এখানে জঙ্গলে ঝরঝরে বৃষ্টি। কিছু আদিবাসী ত্রিপুরীদের দেখা পেলাম। খুব স্বাস্থ্যবান এবং দুধে-আলতা রং। আর ত্রিপুরায় পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা লোকের সংখ্যা বহুগুণ। ওঁরা বেশিরভাগ লোকই বাঙাল ভাষাতে কথা বলেন।

এখানেও গাড়ির ড্রাইভার খুব ভালো ছিলেন। বলা ছিল, উগ্রপন্থীরা বা আদিবাসীরা কোনওরকমভাবে বাধা দিলেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেবে। আমি নেমে কথা বলব।

রাস্তায় শুধু জঙ্গল আর ঝরঝরে বৃষ্টি। একটাও বাড়ি নেই, দোকানপাট নেই। ঘণ্টাতিনেক পর একটা ছোট্ট আধা শহরে হাজির হলাম। এখানকার মানুষরা প্রচণ্ড আন্তরিক। একটা স্মারক উপহার দিলেন। আমরা অলৌকিক নয়, লৌকিক অনুষ্ঠান শেষ করার পর ওখানে আর একটুও অপেক্ষা না করে গেস্ট হাউজের উদ্দেশে রওনা হলাম।

রাত ৯.৩০টায় গেস্ট হাউজে ফিরলাম। ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। গেস্ট হাউজে ফিরতেই কেয়ারটেকার বললেন, আপনাকে মুখ্যমন্ত্রী অনেকবার ফোন করেছেন। এখন লাইনে ধরিয়ে দিচ্ছি। কথা বলুন।

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই ভালো করতেন। কী জবাব দিতাম যদি আপনার কিছু হতো।

শেষ ত্রিপুরায় গেছি ২০১২ সালে।

ওখানে প্রায় সবসময়ই কারফিউ। সকাল আটটার সময় কারফিউ ওঠে। বিকেল চারটেয় আবার কারফিউ জারি হয়। ফেরার পথে মিলিটারিদের বললাম, আমার যাওয়ার প্লেন তো সকালবেলায়, আমাকে যেতে দিন। দরকার হয় চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলুন। মানিকবাবু আমাকে চেনেন।

মিলিটারিরা অবাক হয়ে বললেন, আপনি গেলে ওরা কিছু করে না কেন?

আমি হেসে বললাম, আমার সাথে ওদের যোগাযোগ আছে ভালো। আমাকে চেনে।

ওরা বললো, আপনাকে চিনল কী করে?

বললাম, না চেনার কী আছে! আমি সাংবাদিক। তাই চেনে।

মণিপুরে

২০০৪ সালে ইম্ফল-এ পৌঁছালাম গুয়াহাটি থেকে প্লেন ধরে। Armed Force (Special Power) Act-এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন মণিপুরে তীব্র আকার ধারণ করছে, সে বিষয়ে পরামর্শের জন্য আমার প্রতি আমন্ত্রণ ওই আন্দোলনকর্মীদের। ঘুরপথে যাওয়ার কারণ, আমার ওপর গোয়েন্দাদের নজর ছিল।

মণিপুর একটা ছোট্ট রাজ্য। জনসংখ্যা ২৪ লক্ষের মতো। শিক্ষার হার ৬৯ শতাংশ। মণিপুর একটা স্বাধীন দেশ ছিল। ১৮৯১ সালে ব্রিটিশ সরকার মণিপুর দখল করে।

মণিপুরে আফিমের চাষ শুরু করে ইংরেজরা। আর চা শিল্প গড়ে উঠেছিল। মণিপুরী জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই ছিলেন কৃষিজীবী। তাঁর ৮০ শতাংশই ভূমিহীন কৃষক। সমস্ত জমির মালিকানা ছিল রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের হাতে। মণিপুরের জনগণের প্রায় সকলেই বৈষ্ণব। এখানে ব্যবসা-পত্তর সবই পরিচালনা করেন মহিলারা। পুরুষরা আফিমের নেশায় বুঁদ থাকে।

মণিপুরে দেখেছি অনেক ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে যারা হাসিস, কোকেন, মারিজুয়ানা তৈরি করে। পুলিশ ও মিলিটারিরা কোনও বাধা দেয় না। তারা শুধু

তোলা আদায় করে। এবং ওদের এসমস্ত মালপত্র নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি করেন রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী এবং সেনারা।

এই প্রদেশে রয়েছে Armed Forces (Special Power) Act, 1958 সংক্ষেপে AFSPA। ১৯৪২ সালে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তি ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে দমন করার জন্য যে আইন প্রণয়ন করেছিল, তাকেই একটু সাজগোজ করিয়ে ভারত সরকার নাম দিয়েছে AFSPA।

মণিপুরের মানুষ এই AFSPA আইনটা তোলার জন্য দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন করে আসছেন। কিন্তু ড্রাগ বিক্রি করে বিপুল টাকা রোজগারের ধান্দায় নেতা, মন্ত্রী, ধনিক সম্প্রদায় ও মিলিটারিরা এই কালা আইন বাতিলের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই AFSPA উঠছে না।

মণিপুরে, মণিপুরীদের আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘকালের। ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯-এ কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় মণিপুরের কৃষক আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। মণিপুরে তখন অন্তর্বর্তী সরকার শাসন চালাচ্ছিল। ১৯৪৯-এর ১৫ অক্টোবর মণিপুর ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে গেল।

আমাকে যাঁরা নিতে এলেন তাঁদের নাম বললাম না, কারণ তাঁরা বহুনামে পরিচিত।

বৈষ্ণব মণিপুরীদের সংগ্রামী মানসিকতা সম্বন্ধেও বলা যায়—এক হাতে তাঁর বাঁশি আর এক হাতে অস্ত্র।

আমি যখন গেলাম তখন মণিপুর অগ্নিগর্ভ। রাজধানী ইম্ফল থেকে AFSPA তোলার আন্দোলন প্রবলতর হচ্ছিল ব্যাপক ধর্ষকামী মিলিটারিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা থেকে।

উত্তাল মণিপুরে ১৫ জুলাই, ০০৪ একটা স্মরণীয় দিন। অসম রাইফেলস্-এর সদর দপ্তর কাংলাফোর্টের সামনে উপস্থিত প্রতিবাদী জনতার মধ্য থেকে ১২ জন মধ্যবয়স্কা মহিলারা নিরাভরণ হলেন। মেলে ধরলেন সাদা কাপড়ে লাল কালিতে লেখা 'INDIAN ARMY RAPE US'। অর্থাৎ ভারতীয় সেনা আমাদের ধর্ষণ কর। লক্ষণীয় আর্মিরা কিন্তু ইন্ডিয়ান, আর বোঝাতে চাইল আমরা স্বাধীন মণিপুরি। এই ভয়ঙ্কর নগ্ন প্রতিবাদে গর্জে উঠল সারা পৃথিবীর মানবতাবাদীরা। বিশ্বজনমতে আতঙ্কিত সরকার টেলিভিশন সংবাদ মাধ্যমকে এই সংবাদ প্রচারে নিষেধ করল।

আসাম রাইফেলস-এর ১৭ নং ব্যাটেলিয়ান সেনারা যুবতী থাংজাম মনোরমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় ১০ জুলাই। নগারিয়ান পাহাড়ে পাওয়া গেল মনোরমার বুলেটে ছিন্ন মৃতদেহ, সর্বাঙ্গে যৌন অত্যাচারের চিহ্ন।

মণিপুরের সমস্ত মানুষ একযোগে সমর্থন করল AFSPA তুলে নেওয়ার জন্য। গোটা মণিপুরে রাজ্য সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী সবাই একযোগে প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন।

এই অবস্থার ওপর একটা তথ্যচিত্র তোলাই ছিল আমার উদ্দেশ্য এবং তা তুললামও। ওখানে আমার ছবি তোলার দায়িত্ব যিনি নিয়েছিলেন তিনি রবার্ট। কিন্তু আসল নাম আমি জানি না।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই ৪৫ মিনিটের তথ্যচিত্রের ক্যাসেট ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন অঞ্চলের হলে পর্যন্ত চারটে করে শো হতে লাগল। হাউজফুল শো। কোলকাতাতে ফিরেও এখানে মণিপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা একটা বিরাট মিছিল বের করি কলেজ স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত। এইসময় বিশাল সিগনেচার ক্যাম্পেন শুরু করা হয়েছিল হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। ইউনিভার্সিটি-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সিগনেচার ক্যাম্পেনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি সুমিত্রা।

অধ্যায় : ত্রিশ

'প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ' বই থেকে আমার কয়েকজন সহযোদ্ধার কিছু কথা তুলে দিচ্ছি—

মানসীর কথায় :

যুক্তিবাদী সমিতির সাথে যুক্ত হয়ে প্রবীর ঘোষের সঙ্গে পরিচিতি ২০০৩ থেকে। সপ্তায় দু-তিন দিন স্টাডি ক্লাসে দেখা হয়। তুমুল মত বিনিময় হয়। কিন্তু এখনও লোকটাকে চিনতে পারিনি। আমার অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি মিশিয়ে ঠিক কী বলব? 'বন্ধু?—বাবা?—বালক?'

ভয়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে যদি শুরু করি, তবে খুবই ভয়ঙ্কর—যেমন শাসনপ্রিয় আর তেমনই স্নেহশীল। সত্যিকারের অপত্য স্নেহ পেয়েছি মানুষটির কাছ থেকে। কখনও ভীষণ ধমক খেয়ে আমি গুটিয়ে গেছি। আতঙ্কে জবু-থবু আমি। সঙ্গে বিরক্তি মিশ্রিত রাগ। একটা তিক্ত অনুভূতি। অন্যায়, দোষ অথবা ভুলবোঝা। মনে হল আজই আমার এখানে শেষ সন্ধ্যা। পরমুহূর্তেই ওই বালক প্রবীর ঘোষ এসে হাজির। নেচে-কুঁদে, মুখ ভেঙচিয়ে, কান ধরে টেনে আমার সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা। কতবার এমন শেষ সন্ধ্যার কথা ভেবেছি, তার ঠিক নেই। বারবার বালক প্রবীরদার কাছে হেরে যাই। হেসে ফেলি। সব ভুলে যাই। রাগ হয়েছিল বলে তখন নিজের ওপর রাগ হয়।

প্রবীরদা রাগ করতে চান না,
কিন্তু ভীষণ রেগে যেতে, ভীষণ ভালবাসেন।
চিৎকার করতে ভালবাসেন।
বেশি কথা পছন্দ করেন না, কিন্তু
সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন কথা বলতে।
আর ভালবাসেন সবাই মিলে খিচুড়ি খেতে।
ভালবাসেন ভাল গান শুনতে
ভালবাসেন বাবাজি-মাতাজি ও জ্যোতিষী ধরে খপাখপ খেতে।
ভালবাসেন ভূত ধরতে।
ভালবাসেন আমাদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিতে।

প্রবীরদাকে ঘিরে আমার সবচেয়ে মজার ও মনে রাখার মতো দিন ১ জানুয়ারি ২০০৭। খিচুড়ি দিয়ে পিকনিক। ঠিক ৫.৩০ সন্ধেতে উপস্থিত প্রবীরদার বাড়ি। ঘরে নেই। বেরিয়েছেন? লিখছেন? ঘুমোচ্ছেন? না। বউদি টিভির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই দেখ। তোদের প্রবীরদা টিভিতে ঢুকে বসে আছে। 'আমার বাংলা' চ্যানেলে—'নতুন বছর কেমন যাবে?'— এই বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান 'নারদ নারদ'। প্রবীর ঘোষ বনাম জ্যোতিষী সন্দীপন চৌধুরি। নাস্তানাবুদ হলেন সন্দীপনবাবু ৬.৩০ পর্যন্ত।

৬.৩১-এ আমার মোবাইলে ফোন। প্রবীরদা ওপ্রান্ত থেকে বলছেন—'শোন, বাজার থেকে কড়াইশুঁটি আর একটা ছোট কপি কিনে নিবি। আমি অবাক। তাহলে এতক্ষণ কি খিচুড়ির কথাই ভাবছিলেন স্টুডিওতে বসে।

২০০৫ সালের ১২ মার্চ। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের সঙ্গে সত্যানন্দের ভান্ডাফোড় করতে গিয়ে, গাড়িতে সাড়ে তিন ঘন্টা বসে রইলাম বারাসাত টাকি মোড়ে। অথচ জানতেই পারিনি কোথায় এসেছি? কেন এসেছি? কাকে ধরতে এসেছি? তার পরের ঘটনা ইতিহাস। ভারতের সবচেয়ে ধনী জ্যোতিষী সত্যানন্দের বুজরুকি ফাঁস করলেন অদ্ভুত কায়দায়। গ্রেপ্তার হলেন সত্যানন্দ। গোপনীয়তা রক্ষা যে জয়ের পূর্বশর্ত—তা সেদিন বুঝলাম।

২০০৬-এর ৩ মার্চ। ভোর থেকে লেখা শুরু। দুপুর দুটোতে 'স্টার আনন্দ'-এর সঙ্গে বনমালির মধু খাওয়ার ভান্ডাফোড় করে ফিরে আসা ৫.৩০। ৬টায় রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়া। ৭.১৫ শিয়ালদহ থেকে দার্জিলিং মেলে রওনা শিলিগুড়ি। বার্ষিক সম্মেলন ২০০৬-এ অংশগ্রহণ।

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫। 'ভাষা চেতনা' আয়োজিত অনুষ্ঠান। সারারাত অ্যাকাডেমি চত্বরে কবিতা-নাটক-বাউল গানের আসর। আর 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' প্রোগ্রামে জাগিয়ে তোলা ঝিমিয়ে পড়া দর্শকদের। ৫টায় ফিরে আমাদের সঙ্গে আবার আড্ডা দেওয়ার মতলব। আমি বিছানায় ঢলে পড়তেই উনি উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। চলে গেলেন নিজের ঘরে। আবার লেখা শুরু।

২০০৬ বইমেলা। প্রকাশিত হতে যাচ্ছে 'মনের নিয়ন্ত্রণ যোগ মেডিটেশন'। বই-এর কাজ শেষ হয়নি। মেলা শুরুর ক'দিন আগে হঠাৎ করে হারিয়ে গেল বইটির একটা পুরো অধ্যায়। বিষয়—'রামদেব'। একটুও মনখারাপ নয়। রাগ নয়। আশাহত নয়। নতুন করে লেখার সময় নেই। অতএব সরাসরি কম্পোজিটারের পাশে বসে মুখে বলে একটা বিরাট অধ্যায় শেষ করলেন। দেখে শিখলাম। ধৈর্য কাকে বলে।

৩১ অক্টোবর, ২০০৬। উত্তর ২৪ পরগনার পুলিশ সুপারের কাছে গিয়েছি। মছলন্দপুরের এক মাতাজির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে যুক্তিবাদী সমিতি, তার ছবি তুলব। এস পি-র সঙ্গে দেখা করলাম। জানালাম, মছলন্দপুরের এক

মহিলা অলৌকিক উপায়ে ভাঙা হাড় জুড়ে দিচ্ছে বলে দাবি করছে। প্রচুর ভিড়ও হচ্ছে। এমন বেআইনি কাজ বন্ধ করতে তাঁর সাহায্য চাইলাম।

এস পি চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে আমার কথা শুনলেন। বিষয়টা হালকাভাবে নিলেন। বললেন, আমাদের দেশে এ বিষয়ে কোনও আইন নেই। তাই কিছু করার নেই।

বললাম, যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক শঙ্কর ভড় এসেছেন ওই অলৌকিক মাতাজির বিরুদ্ধে... কথা শেষ করার আগেই স্প্রিং-এর মতো সোজা হয়ে বসলেন—যুক্তিবাদী সমিতি, মানে প্রবীর ঘোষ তো? উনি যখন বলেছেন আইন আছে, তখন নিশ্চয়ই আছে।

এমনি আরও বহু ঘটনা, যা আমার অজানা। বলতে পারে আরও কাছের কেউ।

আমার ব্যক্তিগত বহু বিপদে সশরীরে পাশে থেকে নয়, শাসন করে, ধমকে, কখনও কৌশল বুঝিয়ে, সাহস জুগিয়ে, অনেকবার বিপদমুক্ত করেছেন।

এখানে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার লাইন মনে পড়ে—

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা...
দুঃখ-তাপে-ব্যথিত চিত্তে নাইবা দিলে সান্ত্বনা...
সহায় বল না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়...

যত দিন যাচ্ছে তত যেন মনে হচ্ছে ঠিক পরিমাপ করা যাচ্ছে না। যতবার লেখা বইগুলো পড়ি ততবারই নতুন করে ভাল লাগে। ঠিক মেলাতে পারি না। এই লোকটাই সেই লোক। সেই আমাদের প্রবীরদা। শিল্প-সাহিত্য থেকে শুরু করে বিজ্ঞান, আইন, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, দর্শন, সিনেমা, রাজনীতি সব **মিলিয়ে প্রবীর ঘোষ** আমার জীবনের এক জীবন্ত তথ্যভাণ্ডার।

১৫ জুন ২০০৭। **আইনস্টাইন,** গ্যালিলিও, ডারউইন, রিচার্ড **ডকিন্স** ইত্যাদিদের সঙ্গে বিশ্ব নলেজ ব্যাঙ্ক 'উইকিপিডিয়া' ঘোষণা করল **বিশ্বের** খ্যাতনামা র‍্যাশনালিস্টদের তালিকায় প্রবীর ঘোষের নাম। আমার **জীবনে** একটা ইতিহাস গড়া মানুষকে এত কাছে পেয়ে, উত্তেজিত, উদ্বেলিত—যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আমাদের সকলের প্রিয় প্রবীরদা আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ, বন্ধু মানুষ, যাই হোন না কেন, লেখক প্রবীর ঘোষ বা 'সমকালীন যুক্তিবাদী আন্দোলনের জনক' প্রবীর ঘোষ অথবা 'নিও সোশালিজম'-এর জন্মদাতা প্রবীর ঘোষ, তাঁর সান্নিধ্যে আসার অর্থ আমার জীবনে ১০০ বছর এগিয়ে থাকা একটি অধ্যায়।

রানা হাজরার কথায় :

সালটা ২০০১। অক্টোবরের মাঝামাঝি। যুক্তিবাদী সমিতিতে আমার যোগদান। তার ঠিক একমাস আগে ৯/১১-র ঘটনা। লাদেনের সহচরদের আমেরিকার উপরে ট্যাক্টফুলি কাপুরুষোচিত হামলা। পরিণামে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হতাহত। গোটা বিশ্ব দেখল মৌলবাদের কদর্য রূপ। সচেতন মানুষেরা আমেরিকার নীতির বিরুদ্ধে সরব হলেও, এই নরহত্যাকে সমর্থন করেননি। সমর্থন করিনি আমরাও। বুশ তো সেই সময় ক্রুসেডের নাম করে গোটা বিশ্বকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিলেন। মুসলিম জনতাও বিভাজিত হয়ে গেল। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খিস্টান-ইহুদি সব ধর্মের মৌলবাদীদের লুকনো নখ দাঁতগুলো বের হতে লাগল।

এই দুঃসময়ে প্রবীরদার বইগুলোর প্রতি বড় বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়লাম আশার আলো খোঁজার জন্য। বুকে বল পেলাম। বইয়ের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে চিনলাম সেই মানুষটাকে। স্কুল জীবন থেকে বাঙালির বার্ধক্য সীমা পেরিয়ে গিয়েও ধর্মের বিরুদ্ধে এখনও সমান সোচ্চার আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রবীরদা। তাঁর কাছে ধর্ম মানে শুধু আফিম নয়। ধর্মের অপর নাম ধ্বংস, এটা তিনি মনে করেন। আমার মনে হওয়া সেই অস্থির সময়ে, খুঁজতে লাগলাম অতীত হয়ে যাওয়া বর্তমানের প্রবীরদার মতো মানুষদেরকে, যাঁরা সমাজের দীর্ঘস্থায়ী ও সবচেয়ে বিপজ্জনক রোগকে চিহ্নিত করে নির্মূল করার চেষ্টা করেছেন। একটা দুটো নাম মনে এলেও তাদেরকে প্রকৃত ধর্মবিরোধী যোদ্ধা মনে হয়নি। শখের, প্রচারলোভী, সরকারি ঘেরাটোপে থাকা আন্দোলনকারী, রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজসেবা ইত্যাদির সঙ্গে ধর্মকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা, এমন সব মানুষদের পেলাম। কিন্তু প্রবীরদার মতো একবগ্গা ঘোড়া? না, পাইনি। আপনারা পেলে অবশ্যই আমাদের সমিতির ঠিকানায় জানাবেন। শুধু আমার বাংলা, বা ভারত নয়। গোটা বিশ্বকে আপনার হাতে দিয়ে দিলাম। অবশ্যই জানাবেন, তার আগে অবশ্যই প্রবীরদার বইগুলো পড়ে নেবেন।

নভেম্বরের এক বৃহস্পতিবারের বিকেল প্রবীরদাকে একা পেলাম জ্যোতিদার (খালপুল, বেলেঘাটা) বাড়িতে। মফঃস্বলীয় সংকোচ দূরে সরিয়ে রেখে প্রশ্ন করেই ফেললাম, আপনার তো নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত। আমাদের আবেদন করা দরকার। আপনি ধর্মের বিরুদ্ধে...

আমি দেখলাম একটানা বকবক করে যাচ্ছি। ওনার ভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন নেই যে জীবনে একটা পুরস্কার পায়নি (বা পেতে চেষ্টা করেনি), নোবেলের নামে তো তাঁর লাফানো উচিত। অন্তত একটা চা-বিস্কুট খাওয়ানো দরকার। তার বদলে পেলাম ভাবলেশহীন উত্তর।

—তোমার ইচ্ছে হলে চেষ্টা করতে পারো।

বরং এ নিয়ে আর কোনও কথা বাড়ালেন না। আজ ২০ জানুয়ারি, ২০০৮ পর্যন্ত একবারও জিজ্ঞেস করেননি, তোমার চেষ্টার কী হল?

কাউকে জেরক্স করতে পাঠিয়ে অন্তত তিনবার খবর নেবেন, কোথায়? আর নোবেল পুরস্কারের কথাই ভুলে বসে আছেন!

নভেম্বরের শেষের দিকে। বেলেঘাটার বিখ্যাত স্টাডি ক্লাস। জমজমাট পরিবেশ। সমিতির তাবড় তাবড় তাত্ত্বিক নেতাগণ উপস্থিত, প্রবীরদার তখন অলৌকিক নয়, লৌকিক (৫ম খণ্ড) নিয়ে ব্যস্ত। এই বইয়ে তন্ত্র থেকে আধুনিক ভণ্ডামি, চার্বাক থেকে চারু (মজুমদার) সবকিছু নিয়ে আলোচনা করেছেন। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, বল তো নকশাল আন্দোলন কবে শুরু হয়েছিল? ব্যস, একগাদা উত্তর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ১৯৭০, '৭১, '৭৭ পর্যন্ত। প্রত্যেকটা উত্তরের সঙ্গে আমি নেতিবাচক ঘাড় নেড়ে যাচ্ছিলাম। প্রবীরদা প্রতি উত্তরে স্পিকটি নট। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধচোখে বলতে লাগলেন, এই তুমি ঘাড় নেড়ে যাচ্ছ কেন? এরা কি সবাই ভুল বলছে নাকি? তুমি বলো তো?

আমি উত্তরে বললাম, মনে হয় ১৯৭০-এর আগে নকশাল আন্দোলন শেষ হয়ে গেছিল। শুরু হওয়া সাল ১৯৬৭। ২১, ২২, ২৩ মে। উত্তর দিতে দিতে ভাবছিলাম, আপনি আর রাজনীতির কী জানেন? ভুল উত্তরে চুপ ছিলেন। প্রবীর ঘোষ ধর্ম নিয়ে বিশাল কিছু জানতে পারে। কিন্তু রাজনীতি? কখনওই না।

আমার উত্তর শুনে প্রবীরদা লাফিয়ে উঠলেন। এই তো আমাদের চারু! তারপর বলতে শুরু করলেন। নকশাল আন্দোলনের ইতিহাস, সাফল্য, ব্যর্থতা, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা নীতির ভুলগুলো, নেতৃত্বের লোভ, সিদ্ধান্তহীনতা কোনও কিছুই বাদ দিলেন না, আমার চোখ ছানাবড়া করে শুনে যাওয়া ছাড়া অন্য পথ ছিল না। আবিষ্কার করলাম আর এক প্রবীরদাকে।

এর একমাস পর। অরুণদার বাড়িতে মৌলালির স্টাডি ক্লাসের শেষে আমাকে একদিন ডেকে নিলেন।

—কাল তো রবিবার, তোমার কলেজ ছুটি, আমার বাড়ি সকালে চলে আসবে, ওখানে খাবে।

পরদিন সকালে প্রবীরদার বাড়ি হাজির হলাম। একসঙ্গে খেলাম টোস্ট-কলা-হরলিক্স। পরে জেনেছিলাম, আমি চা খাই না, তাই আমার জন্যে হরলিক্স। আড্ডা বা আলোচনা শুরু হল। বললেন, স্টুডেন্ট-মুভমেন্ট করছিস, রাজনীতি করিস! তাই তোকে বলছি, নেতৃত্ব দিতে গেলে তোর সাথীদের প্রত্যেকের ভাল-খারাপ, দোষ-গুণ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকাটা খুবই জরুরি। মনে রাখিস, প্রত্যেকটা বিপ্লবী দলের খবরা-খবর রাখতে রাষ্ট্রশক্তি বিপ্লবী দলে 'কোর বডি'র মধ্য থেকেই ইনফরমার তুলে নেয়। দলের কার কীসে দুর্বলতা,

সে খবর নিয়ে তবেই রাষ্ট্রশক্তি হাত বাড়ায়। ১৯৯২-'৯৩ সালে কয়েকজন লুম্পেনকে ভালবাসা দিয়ে স্বভাব পাল্টে বিপ্লবী করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলাম। সেই ক'জন লুম্পেনদের দুর্বলতার খোঁজ পেয়ে তাদের দিয়ে যুক্তিবাদী সমিতি দখলেরর চেষ্টা করছিল রাষ্ট্র। আজ তাই বারবার মনে হয়, কাছের সঙ্গীদের দোষ-গুণ বুঝে নেওয়াটা কতটা জরুরি।

এখন যাদের সমিতির অফিসে রেগুলার দেখছিস, তাদের সম্বন্ধে তোর ধারণাটা কী? তাঁদের ভাল-খারাপ, দোষ-গুণ নিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা কর।

আশিসদা (মণ্ডল), জ্যোতিদা, এবং আরও কয়েকজনের চরিত্র বিশ্লেষণ করলাম। প্রবীরদা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, আশিস সত্যিই সমিতির জন্যে প্রচুর শ্রম দেয়। কিন্তু এই শ্রম দেওয়ার মানে এই নয় যে, ও সমিতির আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ। ওর লোভ আছে। সুযোগ পেলে আমার টাকাও মেরে দেয়। এটা ওর অভাব নয়, স্বভাব।

জ্যোতিদা আমাকে ও সমিতিকে প্রচণ্ড ভালবাসেন। আমার জন্যে মরতে ভয় পান না। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ। ওর একটাই দুর্বল জায়গা, তা হল ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা। বিয়ে-থা করেননি। অ্যাক্সিডেন্টে পা ভাঙল। চাকরি গেল। হাসপাতাল থেকে কোলে ব্যারাকের বাড়িতে ফেরালাম জ্যোতিদাকে। কোলে ব্যারাকের আত্মীয়রাও সাফ জানিয়ে দিলেন—যেখানে খুশি ওকে নিয়ে যান। আমরা দেখাশুনার দায়িত্ব নিতে পারব না। তখন থেকেই দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছি। জ্যোতিদার ক্যানসার ধরা পড়ল। চিকিৎসার দায়িত্বও নিলাম। সমিতির জন্য বাড়ি খুঁজছি শুনে জ্যোতিদা বলেন, দোতলার একটা ঘর আর তলার ঘর সারিয়ে-টারিয়ে ঠিকঠাক করে নিন। মাসে একটা ভাড়া দেবেন, যাতে চার বেলার খাবার চলে যায়। জ্যোতিদার সমিতির প্রতি ভালবাসাকে মাথায় রেখেও বলছি, শেষ পর্যন্ত জ্যোতিদা তাঁর ভাইয়ের রক্ত সম্পর্কের ঐতিহ্য বজায় রেখে ভালবাসেন। তারা যতই জ্যোতিদাকে দূরে ঠেলুক, জ্যোতিদা কিন্তু রক্তের সম্পর্ককে গুরুত্ব দেন। তাই তাঁর বাড়ির একটা ঘরও আমাদের দেবেন না। দেবেন ভাইদের। দেখে নিস।

দেখে নিয়েছিলাম। শুধু আশিসদা বা জ্যোতিদার বিষয়েই নয়। যতগুলো চরিত্র বিশ্লেষণ করেছিলেন, তার প্রত্যেকটিই ইতিমধ্যেই সত্যি হয়েছে।

সেদিন প্রবীরদার সমস্ত বিশ্লেষণ শেষ হলে প্রশ্ন রেখেছিলাম, আমাকে এগুলো বললেন কেন? আমিও তো এইসব জেনে আপনাকে ব্ল্যাকমেলিং করতে পারি? উত্তরে বলেছিলেন, জানি তুই তেমন করবি না। নাছোড়বান্দা আমি বলেছিলাম, যদি আমাকে চিনতে ভুল হয়, তখন কী করবেন?

চোখে চোখ রেখে খুবই হিমশীতল গলায় বলেছিলেন, তাহলে তোকে খুন হতে হবে।

প্রবীরদার গলার আওয়াজ ও চোখ আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, সমিতির স্বার্থে এই মানুষটি খুনও করতে পারেন। চিনলাম অন্য প্রবীরদাকে।

২০০২-এর শুরুর দিকে জর্জ বুশ ও তার শাগরেদদের আফগানিস্তানে দাপাদাপি শেষ। ২০০১-এ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের জোড়া বিল্ডিং ধুলোয় মিশল। ধুলোয় মিশল আমেরিকার সম্মান। এর পিছনে সাদ্দামের হাত দেখতে পেল আমেরিকা। সাদ্দামকে শাস্তি দিতে আমেরিকা প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল, প্যালেস্টাইন থেকে ইন্দোনেশিয়া, ভেনেজুয়েলা থেকে কিউবা কেউই বাদ গেল না। আমাদের দেশও গর্জে উঠল। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে সাদ্দামের ছবি টাঙিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মহান নেতা হিসেবে প্রচারিত হতে লাগল। বেশিরভাগ কমিউনিস্ট দলগুলো পারলে মার্কস-লেনিনের পাশে সাদ্দামকে বসিয়ে দেয়। সমস্ত গণমাধ্যম তাদের প্রচারকে এমন জায়গায় নিয়ে গেল, যেন বুশ সাম্রাজ্যবাদী নরখাদক এবং সাদ্দাম সাম্যকামী।

আমরা সমিতির ছেলেরা এই উত্তেজনার বাইরে ছিলাম না। প্রচারের জোরে আমরাও বিশ্বাস করতে শুরু করলাম, আমেরিকাকে সাদ্দাম ভালরকম নাকানিচোবানি খাওয়াবে।

বেলেঘাটার স্টাডি ক্লাসে দেবাশিসদা (চ্যাটার্জি) আমাদের মনের কথা বলে বসল। সাদ্দামের উপর আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ, আমাদের একে নিন্দা করা উচিত। যুদ্ধ হবে ব্যবসায়িক স্বার্থে। ইরাকি তেলের লোভে। আমরা সমস্বরে দেবাশিসদাকে সমর্থন জানাতে লাগলাম, মুহূর্তে প্রবীরদা গর্জে উঠল।

তাঁর সেই সময়কার মতো, বুশ ও সাদ্দাম পাড়ার বড় ও ছোট মাস্তানের মতো কুচো মাস্তান বড়কে রাস্তার মাঝে দুটো থাপ্পড় মেরেছে। ফলে বড় অন্যদের কাছে হেনস্তা হয়েছে। লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না। এখন সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য কয়েকটা কুচোকে পেড়ে ফেলবে। ১১ সেপ্টেম্বর-এর পর বুশ আফগানিস্তানকে পেড়েছে। এবার সাদ্দামকে ধরবে। ইরাক দখল করতে খুব বেশিদিন লাগবে না। বড়জোর সাতদিন, সাদ্দামের রেহাই নেই। ইরাকি জনগণের ক্ষুদ্র অংশ সাদ্দামের পক্ষে। সাদ্দাম গেলে আমার খারাপ লাগবে না। বুশ দাদাগিরি দেখাবেই, দাদাগিরি থাকলে অন্যরা ভয়ে চুপ থাকবে। দাদাগিরি দেখানো আমেরিকার ফার্স্ট প্রায়রিটি। তেল-টেল ওসব কিচ্ছু না।

আর সাদ্দাম সাম্রাজ্যবিরোধী? যে আশির দশকে ইরান যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ কুর্দকে

হত্যা করে, ৯১'র উপসাগরীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর বসরায় হাজারে হাজারে শিয়াকে খুন করে, স্বাধীন দেশ কুয়েতকে দখল করে, সে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতা? এই লোককে তোরা যদি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বলিস, তাহলে আমি প্রবীর ঘোষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নই।

আমরা গলা ফাটিয়ে বাড়িকে মাছের বাজার বানিয়ে ফেলেছিলাম। বলছিলাম সাদ্দামের লোক নিজের দেশের মানুষকে খুন করতেই পারে না। আর যুদ্ধ হলে বুশ হারবেই।

প্রবীরদা আমাদের থামিয়েছিলেন। এই বলে, সময় হলে দেখে নিস। সময় আমাদের শিক্ষা দিয়েছিল। বুশকে কোনও বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। পরাজয়ের পর এটা তখন প্রমাণিত সত্য, লক্ষ লক্ষ ইরাকি হত্যার জন্য দায়ী সাদ্দাম। এ-ও আমার এক চেনা। বিশ্ব পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রখর জ্ঞান না থাকলে এভাবে বলা সম্ভব নয়।

২০০৩, জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ। কলেজের পরীক্ষা ছ'দিন দেরি। বাড়ি থেকে ফোনে খবর এল, মা মারা গেছেন। মা আমার সবচেয়ে প্রিয়। এই পরিস্থিতির জন্য তৈরি ছিলাম না। বাড়ি গিয়ে মানসিকভাবে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলাম। যেন ভ্যাবলা হয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তারের দেওয়া দুটো ঘুমের ওষুধ খেয়েও আমি নাকি ঘুমোইনি। তবে মনে মনে ভেবেছিলাম যে পরীক্ষা দেব-ই। বাড়ির সবাই পরামর্শ দিল পরীক্ষা না দেওয়ার। ফলে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম। মাথাও কাজ করছিল না ঠিক মতো। পুরনো পড়া মনে করতে গেলে পারছি না। সব ভুলে গেছি। কোনও এক সময়ে প্রবীরদার ফোন এল।

কয়েকটি কথা—শুনেছি। কলকাতা আয়, পরীক্ষা দিতে হবে। ভাল থাক।

প্রবীরদার একটা ফোন মনের জোর কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। দু'দিন পর সুবীরের সঙ্গে কলকাতার মেসে ফিরলাম। আমি সাল-তারিখ, ফোন নম্বর অনেককিছু স্মৃতিতে রাখতে পারি। কিন্তু মানসিকভাবে বিধ্বস্ত আমি সেই সময়কার কথা মনে রাখতে পারিনি। পরে আমার কথা জেনেছি বন্ধুদের থেকে। মেসে ফিরে ঘুমোইনি। শুধু চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। বই খুললেও পড়িনি। এই অবস্থায় মেসের ছেলেরা সিদ্ধান্ত নেয়, প্রণবকে (দত্ত) দিয়ে প্রবীরদাকে ফোন করার। প্রণবের সঙ্গে প্রবীরদার কাছে যাই। প্রণবের কথা অনুযায়ী দিনটা ছিল রবিবার। পরদিন পরীক্ষা ছিল।

কোনও সমস্যার কথা না বলে আড্ডা দিলেন, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট নিলাম। এক সময় প্রবীরদা বললেন, আয় তোকে একটু রিলাকসেশন দিই। আমাকে বিছানায় শুইয়ে হিপনোটিক সাজেশন দিলেন। সাজেশন ছিল রিলাকসেশনের আধঘন্টা পরে প্রবীরদা যখন আমার হিপনোটিক ঘুম ভাঙালেন, তখন মনে

হয়েছিল এই কয়েক দিনের জট পাকানো মাথাটা হালকা লাগছে। রিল্যাক্সড্ লাগছে। তারপর আমরা দু'জনে আড্ডা দিতে দিতে ক্রিকেট খেলা দেখলাম টিভিতে। দুপুরে আমি, বউদি ও প্রবীরদা এক সঙ্গে খেলাম। তারপর হঠাৎই বললেন, চল আমরা একটা অ্যাকশন করে আসি।

মহাজাতি সদনে জ্যোতিষ সম্মেলন হচ্ছিল। সমিতির অনেক সদস্য-সদস্যাদের দেখলাম আসন দখল করে জ্যোতিষীদের বকবক শুনছে। প্রবীরদা আমাকে বললেন, তুই আজ আমার বডিগার্ড। নে তোর কাজ শুরু হল। আয় আমার সঙ্গে।

প্রবীরদা ঝট করে মঞ্চে উঠে জ্যোতিষীদের উদ্দেশে বললেন, আপনারা এতজন বড় বড় জ্যোতিষী হাজির রয়েছেন, আর আমি এত দিন ধরে উত্তর খুঁজছি—জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান কি না? চারজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বলছি। আপনারা গণনা করে জানাবেন, তাঁদের মৃত্যু কবে হবে।

'তারা নিউজ' চ্যানেল ছবি তুলছে। প্রবীরদা বললেন, আজ না বলতে পারলে আর এক দিন না হয় উত্তর দেবেন। কবে উত্তর দেবেন টিভি ক্যামেরার সামনে জানিয়ে দিন।

জ্যোতিষীরা সদলবলে ঝাঁপাল প্রবীরদার উপর। রোগা-পটকা আমার গায়ে তখন অদ্ভুত শক্তি এসে গেছে। একটু পরে দেখি আরও অনেকেই প্রবীরদাকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন। পুলিশও ইতিমধ্যে হাজির। জ্যোতিষ সম্মেলন ভন্ডুল। প্রবীরদার সঙ্গে দৌড়লাম জোড়াসাঁকো থানায়, জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে, সঙ্গে তারা টিভির গাড়ি।

রাতে ফিরে প্রবীরদার ফ্ল্যাটে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা। সোমবার সকালে প্রবীরদা বললেন, যা, মেসে যা। আজ তো পরীক্ষা। একটু বইয়ে চোখ বুলিয়ে নিস। নো টেনশন। পরীক্ষা দিয়ে আমাকে একটা ফোন করিস।

মেসে ফিরলাম। দু-ঘণ্টার মতো বই খুলে চোখ বুলালাম। কলেজে গেলাম। পরীক্ষা ভাল হল। পরপর পরীক্ষা দিতে থাকি। রেজাল্ট ছিল আশি শতাংশের কাছাকাছি। না, কোনও অসদুপায় গ্রহণ করিনি। আমার কেরিয়ারকে পাল্টে দিয়েছিলেন প্রবীরদা।

২০০৩-এর অক্টোবর। শান্তিনিকেতন ঘুরতে গেলাম। আমরা, সমিতির ছেলেরা মাঝে মাঝে উড়ানচণ্ডীর মতো বেরিয়ে পড়ি, নিজেদের এক পরিবারের সদস্য হিসেবে ভাবি বলে। উত্তরায়ণে ঢুকতে আমি অরূপদাকে আমার ব্যাগ ও ক্যামেরা দিয়ে ঢুকে গেলাম। ওখানে ব্যাগ ও ক্যামেরা নিয়ে ঢোকা যায় না। এক দেড় ঘণ্টা পর বাইরে বেরিয়ে দেখি, প্রবীরদার দু'কাঁধে হাফ ডজন ব্যাগ। হাতে দু-তিনটে ক্যামেরা। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আমাদের কেউ মূল্যবান সামগ্রী বাইরে অরক্ষিত অবস্থায় রাখতে চায়নি। তাই 'মুশকিল আসান' প্রবীরদা নিজেই আমাদের পাহারাদারের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। আমার জীবনে দেখা এই

মহান মানুষটিকে তখন একটি কথা বলেছিলাম, তোমার জন্য আমার জীবনের বাজি রাখতে পারি।

ঘটনা অসংখ্য, আর একটা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। অন্য একটা অ্যাঙ্গেল থেকে প্রবীরদাকে দেখব বলে। ২০০৩-এ গেলাম বারাসাত, প্রবীরদার সঙ্গে। ভণ্ড দেবু তান্ত্রিকের মিথ্যের বেলুন ফুটো করব বলে। আগের দিন স্টাডি ক্লাসে ঠিক হয়েছিল, প্রবীরদার সঙ্গে আমরা সবাই ট্রেনে যাব। রাতে দমদমের গেস্ট হাউজে থেকে গেলাম আমি, আশিস, অরিন্দমদা। হঠাৎ প্রবীরদার ফোন, শোন, সকালে আমার বাড়ি ঘুরে যাস। সকালে তিনজনের সঙ্গে দেখা হতেই বলে উঠলেন, শরীরটা ভাল নেই। চারজনে মিলে গাড়িতে যাব।

কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ দেখি, নিজের গাড়ি থেকে নেমে ই-টিভির গাড়িতে উঠে পড়লেন।

বারাসতে প্রবীরদা দেবু তান্ত্রিকের 'বাজনা বাজালেন'। রাতে আমি ও অরিন্দমদা কৌতূহলে জানালাম।

প্রবীরদা খুব সংক্ষিপ্ত ও নির্লিপ্তভাবে জানালেন, ট্রেনে গেলে আজ খুন হতাম। রেলস্টেশন থেকে দেবুর ওখানে ভ্যানে যাওয়ার সময় সমিতির এক সদস্য, পেশায় গানম্যান আমাকে শুট করত। তাই, ওইভাবে গেলাম।

আমাদের সন্দেহ দূর করার জন্য আরও জানাল, দেখবি কাল খুব ভোরে আমাদের সমিতির খুব কাছের লোক আশিস পালিয়ে যাবে। আশিস হল এই প্ল্যানের অন্যতম মাথা। ও বুঝে গেছে আমি ওদের প্ল্যান জেনে গিয়েছিলাম।

পরদিন ভোরে আমাদের কাউকে না জাগিয়ে মাথা সত্যিই পালিয়ে গিয়েছিল। সেই রাতে দেখেছিলাম ভয়ডরহীন প্রবীরদাকে। আমি সেই জায়গায় থাকলে প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে থানা পুলিশ করতাম। আপনারা কী করতেন জানি না।

প্রবীরদার বড় কঠিন সময় দেখেছিলাম আমি এবং আমরা কয়েকজন, ২০০২-এর শুরু থেকে মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত। দীর্ঘ সময়।

ডিসেম্বর ২০০১ নাগাদ প্রবীরদা সমিতির গেস্ট হাউজে আমাদের কয়েকজনকে ডেকে নিলেন। প্রস্তাব রাখলেন তিনি। শোনা যাক তাঁর মুখ দিয়ে।

—১৯৯৬-এ বৃহৎ শক্তির প্ররোচনায়, সমিতির ছেলেদের বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা এতদিন মাইনাসে রান করছিলাম। তোদেরকে পেয়ে আমরা এই ২০০১ সালে শূন্যতে এসেছি। এবার আমাদের শুধু এগিয়ে যাওয়া। কোনওভাবে পিছনে হাঁটা চলবে না। যদি দু'পা পিছোতে হয়, তা যেন হয় পরবর্তীতে দশ পা এগোনোর জন্য।

কোনও সংগঠন সজীব, গতিময় থাকে আপার লেভেলের (উচ্চতর নেতৃত্ব) মেধা, সততা, নিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৯৯৬-এর পর থেকে সংগঠনের মূল সিদ্ধান্তগুলো আমাকেই নিতে হয়েছে। ফলে সংগঠন একমুখী, আমার উপর নির্ভরশীল হয়ে

পড়েছে। আমার এই অবস্থা কাম্য নয়। যে কোনও সংগঠনের ক্ষেত্রে আমি যৌথ নেতৃত্ব বিশ্বাসী। যুক্তিবাদী সমিতি তার ব্যতিক্রম হোক, চাই না। এই দীর্ঘ সময় ধরে সুমিত্রাদি সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এখন তোদেরকেও যৌথ নেতৃত্বে চাই। তোদের মেধার উপর পূর্ণ আস্থা আছে। চল আজই এক পা বাড়াই 'কোর কমিটি' তৈরি করে। আশা করি তোদের পূর্ণ সম্মতি থাকবে।

আমরা মহানন্দে সম্মতি দিলাম। প্রবীরদা জানালেন, কোর কমিটি একটা সংগঠনের ব্রেন। ব্রেন ছাড়া শরীর অচল, সেরকম কোর কমিটি ছাড়া সংগঠন। কিছু দায়িত্ব কমিটির অন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। সেইসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার, কমিটি তাদেরকে দেয়। বাকি যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কমিটি। কারোর একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকল না। এই আমি, প্রবীর ঘোষও তোদেরকে না জানিয়ে একা সিদ্ধান্ত নেব না। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংগঠন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলে, কমিটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার কোনও একজন নেতার হাতে দিয়ে দিতে পারে।

তার সঙ্গে অবশ্য আমাদেরকে সতর্কও করে দিলেন। তোরা যেন কেউ ভেবে নিস না, নেতৃত্ব মানে সারাজীবনের জন্য। যুক্তিবাদের মতো কোর কমিটিও পরিবর্তনশীল, আমাদের কারও মধ্যে দুর্নীতি, লোভ, ভুল বোঝাবুঝি আসতেই পারে। তখন তাকে সরে যেতে হবে। বলতে পারিস সরিয়ে দেওয়া হবে, আমি হলেও। প্রয়োজনে আরও অনেকে কমিটিতে চলে আসতে পারে। আমাদেরকে সৎ হতে হবে। সততা রাখতে গেলে আত্মসমালোচনা দরকার আছে। তিনমাস অন্তর এটাও চাই। আত্মসমালোচনা না করলে কী হতে পারে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ, রাশিয়া-চিন।

সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা আত্মসমালোচনা করি ব্যক্তিগত কুৎসা বাদ দিয়ে। ছাড় পায় না প্রবীরদাও, তার জায়গা করে নিয়েছেন প্রবীরদা নিজে। কোর বডিতে যাদের নাম হল, তাদের নাম পাবলিকলি বলাটা উচিত হবে না। একটা মিলিটেন্ট দলের 'কোর বডি' বা 'মস্তিষ্ক কোষ'গুলোর নাম গোপনই রাখা হয়। শত্রুদের নজর এড়াতেই গোপন রাখা হয়। আমাদের মধ্যে কাজকর্মের একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা বুঝিয়ে দেওয়া হল। তারই পাশাপাশি সাহায্য ও সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলিও বুঝিয়ে দিলেন।

সেইদিন প্রবীরদা টানা ছ'ঘন্টা সংগঠন নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা করেছিলেন। নথিভুক্ত করা হলে তা অবশ্যই একটা দলিল হতো। পুরনো স্মৃতি হাতড়ে কিছুটা লিখলাম। লেখা যেত আরও অনেকটা। সম্পাদক পারমিট করবে, কি করবে না ভেবে প্রবীরদার বক্তব্য ছোট করে দিলাম।

২০০২-এর প্রথম দিকেই 'কোর কমিটি'তে আরও নতুন মুখ এল। এদের কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে তুখোড় পড়াশুনা আছে। 'কোর কমিটি' ও বাছাই

করা কয়েকজনকে নিয়ে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ নিয়ে বেলেঘাটায় ক্লাস চলল সপ্তাহের একটি করে দিন। ক্লাস নিতেন প্রবীরদা। বিভিন্ন 'সাম্যবাদী' দলের পার্টি প্রোগ্রামও বিশ্লেষণ করতেন। আমরা ক্লাসের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলাম মার্কস ও লেনিনের মতাদর্শকে কালোপযোগী ও দেশোপযোগী করে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা। শিখলাম মার্কসবাদকে 'দর্শন' বা 'বিজ্ঞান' যা-ই বলা হোক না কেন, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মার্কসবাদকে এগিয়ে না নিয়ে গেলে মার্কসবাদ একদিন অচল হয়ে পড়বে। প্রবীরদাই মূল মার্কস ও লেনিনের বইয়ের অংশ পড়ে পড়ে সহজ করে আমাদের বোঝাতেন। বুঝতে পারতাম—এতদিন বাঙালি মার্কসবাদীদের অনেকেই নিজের নিজের মনের কথা 'মার্কসবাদ লেনিনবাদ' নামে চালিয়ে এসেছেন এবং যাচ্ছেনও।

প্রবীরদার কাছে শিখেছি বিপ্লবই শেষ কথা নয়। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরও তাকে টিকিয়ে রাখাটা জরুরি। তার জন্য চাই সাংস্কৃতিক আন্দোলন। নতুবা নজরদারির অভাবে নেতাদের মধ্যে দুর্নীতি দেখা দিতে পারে। সাংস্কৃতিক আন্দোলন মানে কিছু এগিয়ে থাকা চিন্তাকে বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আন্দোলন।

আমাদের অনেকেরই সেসব দিনগুলোয় মনে হয়েছিল—প্রবীরদা বড় বেশি আপসকামী হয়ে পড়েছেন। সশস্ত্র সংগ্রামের বদলে আলুভাতে মার্কা 'স্বয়ম্ভর' চিন্তা! আজ ২০০৮ সালের গোড়ায় এসে যখন দেখি ভারতের ৬০০ জেলার মধ্যে ২৫০টি জেলায় স্বয়ম্ভর গ্রাম গড়ে উঠেছে, তখন প্রবীরদার মতবাদ 'নিও সোশালিজম' মেনে নিই শ্রদ্ধার সঙ্গে। প্রবীরদার এই মতবাদ মেনে নিয়েছে পৃথিবীর সাম্যকামীরা।

আলোচনায় নেপালের প্রসঙ্গও এসেছিল। নেপাল সেই সময় সমবায় প্রথার মাধ্যমে কিছু কাজ করছিল। নেপালের স্বয়ম্ভর নীতির ভুলগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন প্রবীরদা। পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই নেপালের মাওবাদীরা তাঁদের অনেক ভুল সংশোধন করে নিয়েছিল।

সেই সময় প্রবীরদা এ-কথাও বলেছিলেন, নেপালের সাম্যকামীরা শেষ পর্যন্ত স্বয়ম্ভর প্রথার মাধ্যমে গ্রাম দিয়ে কাঠমাণ্ডুকে ঘিরে ফেলবে। নেপালের সাম্য আসবে সবচেয়ে কম রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে। রাজতন্ত্র ও রাজার চামচারা কাঠমাণ্ডু ঘেরাও হওয়ার পর মাওবাদীদের কাছে নতি স্বীকার করবে। ভারত ও আমেরিকার শত চেষ্টাও নেপালের রাজতন্ত্রকে বাঁচাতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত নেপালে হুবহু তাই-ই হয়েছিল যেমনটা প্রবীরদা বলেছিলেন।

এক সময় কোর কমিটিতে আলোচনা হয়েছিল দেশি বা বিদেশি ফান্ড নেওয়া নিয়ে। বাইরের ফান্ড নেওয়ার যৌক্তিকতা ও নীতিগত সমস্যা আছে কি? থাকলে সেটা কী?

প্রবীরদা বলেছিলেন যে কোনও বিপ্লবী পার্টির বিশাল অর্থের প্রয়োজন হয়। শ্রীলঙ্কার এল টি টি ই থেকে বলিভিয়ার বিপ্লবীরা বিদেশি ফান্ড সংগ্রহ থেকে আফিম চাষ করে ফান্ড তৈরি করে চলেছে বা করেছে। রাষ্ট্র নাগরিকদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করে। একটা দেশলাই থেকে মোটরগাড়ি যেকোনও কিছু কিনলেই তার একটা অংশ ট্যাক্স হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমা হয়। আমাদের আইডিয়া নিয়ে যাঁরা স্বয়ম্ভর গ্রাম গড়ে তুলেছেন, তাঁরা টাকা তোলেন শুভানুধ্যায়ীদের দান, ধনীদের কাছ থেকে টাকা আদায় ইত্যাদি পথে। আমরা আমাদের কাজকে আরও ব্যাপক করতে চাইলে ফান্ডের দরকার পড়বেই। এই ফান্ডের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত লাভ করা নয়। বিদেশিদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যে সব এন জি ও টাকা লুটছে, তেমন করে নিজেদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করা যায়, সাম্য আনা যায় না। আমরা বিদেশি সাহায্য এনে আমাদের লক্ষ্যপূরণে খরচ করলে কোনও সমস্যা নেই। পরিস্থিতি নির্ভর করছে আমাদের সততার উপর।

ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে শুরু করলাম এবং কখন যেন প্রবীরদার সঙ্গে একমত হয়ে গেলাম।

প্রকৃতপক্ষে তিনি সমিতিকে 'প্রবীর ঘোষ ফাউন্ডেশন' বানাতে চান না। যুক্তিবাদকে ভালবাসেন। তাই যুক্তিবাদী সমিতির দীর্ঘজীবন তাঁর কাম্য। আমাদের মেধাকে তিনি ভালবাসেন। তাঁর কাছে সংখ্যা নয়, মেধার গুরুত্ব বেশি। তাই টানা দু'বছর আমাদের সময় দিয়েছেন। প্রয়োজনে তাঁর মূল্যবান সময়ের দশ বছর নষ্ট করতেন। কিন্তু তাত্ত্বিক লড়াইটা ছাড়তেন না।

তিনি লড়াই ভালবাসেন। হাতে হাতে বা মাথায় মাথায়। ৬০+ হয়েও সবসময় লড়াইয়ের মুডে। আমার মতো না-চিজের প্রশ্ন পছন্দ করেন। ফোনে মাঝে-মাঝে কলকাতা যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে বসেন। শুধু প্রশ্নে প্রশ্নে বিদ্ধ হবেন বলে। আর সঠিক উত্তর দিয়ে আমাদের ও নিজেকে সন্তুষ্ট করবেন বলে।

অনেকেই লিখবে, তাঁরা প্রবীরদাকে কেমনভাবে দেখেছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমি প্রবীরদাকে সেইভাবে দেখিনি। আমি প্রবীরদার মধ্য দিয়ে দুনিয়াকে দেখেছি, রাজনীতি দেখেছি, সমাজকে দেখেছি। সর্বোপরি ভালভাবে নিজেকে দেখতে শিখেছি। লিখতে লিখতে মনে হল, এবার নিখুঁতভাবে প্রবীরদাকে দেখতে হবে। মানুষটার ক'টা হাত, পা মাথা? মাথার ওজন কত? ঘিলু কতটা?

কারণ, একটা লোক একসঙ্গে এত কথা ভাবেন কী করে? এত কাজ করেন কী করে? এত যোগাযোগ রক্ষা করেন কী করে? না, প্রবীরদাকে আবার ভালোভাবে দেখতে হবে। দেখে আবার আপনাদের জানাব।

অজয় বৈরাগীর কথায় :

এমন একটা বিষয়ে লিখতে যাচ্ছি যা হয়তো একদিন ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে গ্রাহ্য হবে। 'প্রবীরদাকে কেমন দেখেছি' শিরোনামে লেখা যথেষ্ট রিস্ক। তাই প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হচ্ছে, প্রবীরদার মতো মানুষকে ঠিকমতো প্রেজেন্ট করতে পারব কি না এই দুশ্চিন্তায়।

ভাবুন তো, গৌতম বুদ্ধের কাছাকাছির লোকেরা যদি গৌতম বুদ্ধের ভাল-খারাপ গুণের কথা লিখে রেখে যেত তবে আজ আমরা কত ঐতিহাসিক তথ্য পেতাম। গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে কত কী জানতে পারতাম। আমরা সেই ভুল করতে চাই না।

ছোট থেকেই মানুষের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা আমাকে কষ্ট দিত, বিচলিত করত। তাদের আনন্দ আমাকে আনন্দ দিত। সবসময় ভাবতাম মানুষের এই দুঃখের কি শেষ নেই? আমার ঠিক এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রবীরদার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির সিরিজগুলি হাতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোগ্রাসে গিলেছি। মনে আছে, সোনারপুরে বাড়ির পাশে রাস্তার উপর বাঁশে বাঁধা বালবের আলোয় গভীর রাত পর্যন্ত প্রবীরদার বইগুলি পড়েছি। অবশ্য কাছাকাছি তেমন কারও নজরে না পড়ায় 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটা জোটেনি।

প্রবীরদাকে প্রথম দেখি ২২ নভেম্বর ২০০১ সালে। প্রথম দিন দেখে মনে হয়েছিল যেন 'সবজান্তা'। আসলে আমি কুয়োর ব্যাঙ ছিলাম তাই তাঁকে 'সবজান্তা' মনে হয়েছিল। আশার কথা আজ সেই কুয়োর ব্যাঙটা ডাঙায় উঠেছে, তাই এই লেখা সম্ভব হচ্ছে।

প্রবীরদার কাজের পরিধি এতই বিশাল যে, প্রবীরদাকে এখনও পুরোপুরি চিনেছি বলব না। কিন্তু এই ক'বছরে যেটুকু চিনেছি তাতে তাঁকে যে পৃথিবীতে সবার চেয়ে বেশি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি—সেটা একটাই কারণে, তিনি শুধু যুক্তিবাদী নন, মানবতাবাদী। যুক্তিবাদী তো অনেকেই, কিন্তু একজন যুক্তিবাদী মানবতাবাদী না হলে আমি মনে করি, তিনি মানুষের জন্য কিছু দিতে পারবেন না। মানবতাবাদ যুক্তিবাদকে পূর্ণতা দেয়, প্রাণ দান করে। অনেকে 'নাম কে ওয়াস্তে' যুক্তিবাদী। ছাপোষা মানুষগুলোর খেয়েদেয়ে, অফিস করে আর ঘুমিয়ে দিন চলে যায়। দেশের সাধারণ মানুষের কী দুর্দশা তা ভাবার সময় তাদের নেই। প্রবীর ঘোষ সেই সব বঞ্চিত মানুষগুলোর জন্য একজন প্রাতিষ্ঠানিক যুক্তিবাদী।

তাহলে প্রবীর ঘোষ মানুষকে কী দিয়েছেন? প্রশ্নটা সেখানেই। তিনি বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষকে ভালবাসতে পেরেছেন। আর তাঁদের অবস্থা উত্তরণের জন্য এনেছেন এক নতুন তত্ত্ব 'নিও সোশালিজম' বা 'নব্য

সমাজবাদ'। যে তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ শুরু হয়েছে 'কমিউন' বা 'স্বয়ম্ভর গ্রাম' তৈরির মধ্য দিয়ে। আর এই স্বয়ম্ভর গ্রাম তৈরির মধ্য দিয়েই একদিন হয়তো ভারত তথা সারা পৃথিবীর শোষিত, বঞ্চিত মানুষগুলোর উত্তরণ ঘটবে। এ কোনও আশার বাণী নয়, ইতিমধ্যেই প্রয়োগের মধ্য দিয়েই তা প্রমাণিত হয়েছে। নেপালে প্রায় সবটাই এবং ভারতে ৬০০টি জেলার মধ্যে ২০০টিরও বেশি জেলায় এমন স্বয়ম্ভর গ্রাম তেরি হয়েছে। সফলভাবে প্রয়োগ হয়েছে ভেনেজুয়েলায়ও।

মার্কস, লেনিন, মাও-এর পরে পৃথিবীতে সাম্যবাদের যে ক্ষয়িষ্ণু রূপ দেখা দিয়েছে, তথাকথিত সাম্যবাদীরা যখন হাল ছেড়েছুড়ে পুঁজিবাদের সঙ্গে সন্ধিপত্র সই করছে, তখন প্রবীর ঘোষই এনেছেন এই নতুন তত্ত্ব। কিছু সৎ, নির্ভীক, উদ্যমী মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই তত্ত্ব অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করেছে এবং করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ছোবড়া হয়ে যাওয়া মানুষগুলো আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এই তথ্য আমার নয়, বিবিসির মতো বিভিন্ন বিভিন্ন বিদেশি আন্তর্জাতিক মিডিয়াদের। আপনি মানুন আর না মানুন ইতিহাস কিন্তু একদিন এইভাবেই লেখা হবে।

প্রবীর ঘোষ—যুক্তিবাদী আন্দোলনের এক আন্তর্জাতিক 'আইকন'। কারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যখন কোনও মিডিয়া অলৌকিতার নামে কোনও বুজরুকি, ভণ্ডামি বা লোক ঠকানোর কারবারের খবর কভার করতে চায়, বন্ধ করতে চায় বা ব্যাখ্যা করতে চায় কিন্তু ব্যর্থ হয়, তখনই ডাক পড়ে প্রবীর ঘোষের। যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে যখন কোনও অলৌকিক রহস্য ভেদ করা হয়, তখন দেশ-বিদেশের মিডিয়া প্রবীর ঘোষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রবীর ঘোষ কী ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তা জানতে। তা সে গণেশের দুধ খাওয়া হোক, মুম্বই-এর সমুদ্রের জল মিষ্টি হাওয়া হোক বা মাদার টেরেজার অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে 'সেন্ট' উপাধি দেওয়ার ঘোষণাই হোক। এছাড়াও রয়েছে যুক্তিবাদী আন্দোলন ও প্রবীর ঘোষের উপর তথ্যচিত্র।

২০০৪-'০৫ সালে আমি একটি প্রকাশনী সংস্থায় কাজে যোগ দিই। ওইখান থেকে বইমেলার জন্য আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির প্রায় ১৫-১৬টা ছাপার কাজ চলছিল। আমি ছিলাম এই ছাপার কাজকর্ম দেখাশোনার দায়িত্বে। সেই সুবাদে প্রতিদিনিই প্রবীরদার সঙ্গে আমার ফোনে যোগাযোগ করতে হত। একেবারেই নতুন। শেখাবার কেউ নেই। প্রবীরদার থেকে প্রেস লাইনের টিপসগুলি শিখে নিচ্ছিলাম। একদিন প্রবীরদাকে বললাম, অতীশের সাপের বইটার সাপের ছবিগুলো লাগবে। প্রবীরদা বললেন, ছবিগুলো দেওয়া হয়েছে। টোটাল এগারোটা ছবি। বললাম, উহুঁ, ছবি তো নেই। প্রবীরদা চড়া সুরে বললেন, তবে তুই হারিয়েছিস। এখন অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছিস। শোন, মিথ্যা কথা যেই

বলুক, সে আমার ছেলে বললেও আমি পছন্দ করি না। না বোঝাতে পারার অক্ষমতার জন্য নিজেকে অসহায় লাগছিল। প্রবীরদা তখন সপ্তমে। হঠাৎ একটু নরম করে বললাম, প্রবীরদা একটা কথা বলব? সঙ্গে সঙ্গে সপ্তম থেকে নেমে একেবারে প্রথমায়, টেনে সুর করে বললেন, হ্যাঁ...অ্যা...অ্যা... বলো...ও...ও। আমি তো অবাক, আরে একটু আগে এই লোকটাই আমাকে এত বকছিলেন? বললাম, আমি না অতীশের সাপের ছবিগুলো হারিয়ে ফেলেছি। বললেন, বে-এ-এ-শ করেছ। তারপর অবস্থাটা সামাল দিতে উপায়ও বলে দিলেন। এবার কিন্তু বকাবকি করলেন না। প্রবীরদাকে চরম অবস্থায় কখনও রাগতে বা কারও উপর রেগে থাকতে বা রাগের মাথায় কাজের গন্ডগোল করতে দেখিনি।

এই ক'বছরে প্রবীরদার কাছাকাছি থেকে যা শিখেছি।

এক : তিনি মনে করেন যুক্তিবাদী আন্দোলন যাঁরা করতে চায় অর্থাৎ মানুষকে ভালবসে মানুষের জন্য যাঁরা কাজ করতে চায় তাদের কাজ করতে হবে 'কাজের আনন্দে কাজ' করার নীতিতে। 'দেখো, আমি মানুষের জন্য কত ত্যাগ করেছি', বললে চলবে না। কারণ ত্যাগের উল্টো পিঠে থাকে ত্যাগের বিনিময়ে কিছু পাওয়া এক সূক্ষ্ম মনোবাসনা।

দুই : গম্ভীরতা, অতি ভাবুকতা বা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কখনও আন্দোলন বা বিপ্লব হয় না— প্রবীরদাকে দেখেই তো শিখেছি। তিনি সমকালীন প্রবক্তা। যে যুক্তিবাদ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চির আধুনিক থাকবে। এছাড়াও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা, বিশেষ করে 'নিও সোশালিজম'-এর থিওরি আজ সারা পৃথিবীকে নাড়া দিচ্ছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় নেতাদের কপালে ভাঁজ ফেলে দেওয়া মানুষটিকে রাস্তাঘাটে বা গ্রামে-গঞ্জের কোনও প্রোগ্রামে বা সমিতির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মুড়ি খেতে দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না যে লোকটার কত পাণ্ডিত্য। তখন বোঝা মুশকিল যে এই সাদাসিধা লোকটাই পৃথিবী কাঁপানো প্রবীর ঘোষ। বিশ্বাসই হবে না এই ধরনের চুস্তিলা-ফুর্তিলা মানুষটার মাথা থেকে এত গুরুগম্ভীর চিন্তা বেরুতে পারে।

চার : কেউ তোমার আপন নয়, কেউ পরও নয়। কেউ দুর্নীতি করলে তাকে সরিয়ে দাও। কেউ সমিতি বা আন্দোলনে অনিবার্য নয়। প্রত্যেককে তাঁর কাজের জন্য দরকার থাকতে পারে কিন্তু কারও জন্য কোনও কাজ থেমে থাকে না। যেমন ট্রেন থেকে কোনও যাত্রী নেমে গেলে ট্রেন থেমে যায় না, তেমনই। যাত্রীরা বিভিন্ন স্টেশনে ওঠে নামে, ট্রেন লক্ষ্যে চলতেই থাকে।

পাঁচ : 'লোভ', সে অর্থ, নাম বা সেক্স যে কোনও লোভই হতে পারে—এই তিনটি জিনিসের লোভের থেকে নিজেকে অনেক ঊর্ধ্বে ওঠাতে হবে। নেতৃত্ব দিতে গেলে প্রাথমিকভাবে এই বিশেষ গুণের অধিকারী হতেই হবে। একজন যোগ্য নাবিক যেমন ঝড়-ঝাপটা বাঁচিয়ে জাহাজকে তীরে পৌঁছে দেয়, তেমনই

একজন যোগ্য নেতাও কিন্তু একটা গোটা দেশকে পাল্টে দিতে পারে। গভীরভাবে একথা উপলব্ধি করেছি প্রবীরদাকে দেখে।

ছয় : প্রবীরদার সান্নিধ্যে আসার আগে ছিলাম ফুলটাইম মনমরা। তারপর ধীরে ধীরে প্রবীরদাকে দেখে শিখেছি কীভাবে কাজের চাপ, টেনশন কাটিয়েও সবসময় আনন্দ বা ফুর্তিতে থাকা যায়। দেহের বয়স তোমার যাই হোক না কেন, কীভাবে মনের বয়স আঠারোতে আটকে রাখা যায়।

সাত : প্রয়োজনে তোমাকে নরম, আবার প্রয়োজনে তোমাকে কড়া হতেই হবে। সবার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বা ঝগড়া এড়িয়ে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করার একটা সুন্দর টিপস শিখেছি প্রবীরদার থেকে। তা হল কারও উপর রাগ করে থেকো না, পুরনো রাগ মনের মধ্যে পুষে রেখ না। মতবিরোধ থাকলে যদি তার আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানসিকতা থাকে তবে সোজাসুজি বলে দাও তোমার দ্বিমতের কথা, নইলে প্রসঙ্গটি ড্রপ করো ও দরকারে তাকে এড়িয়ে যাও। মতাদর্শগত জায়গা থেকে আপস করতে বলছি না।

আট : বোকার মতো সবাইকে সব কথা বলে বসো না, যেদিন বলবে সেদিনই তোমার ধ্বংসের শুরু হবে। বিপ্লবী দলে কে যে কোন কথায় কাকে বিক্রি করবে তা তো জানো না, কে অত্যাচারে মুখ খুলবে তাও তোমার জানা নেই। অতএব পেট পাতলা হয়ো না।

নয় : প্রবীরদার সবথেকে যে গুণটি আমাকে বেশি অবাক করে এবং প্রবীরদাকে দেখে ঈর্ষাও হয় তা হল প্রবীরদার মানুষ চেনার ক্ষমতা। কোনও একজনকে দেখে মুহূর্তে তার সম্পর্কে পটাপট বলে যাওয়া বোধহয় শুধু প্রবীরদার পক্ষেই সম্ভব। অনেক সময় আমরাই অবাক হয়ে যাই। কাউকে দেখে এত কিছু বলে যেতে পারেন যে আপাতদৃষ্টিতে কোনও কার্যকারণ সম্পর্কের কথা মনেই আসে না। কিন্তু আছে। এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্লু দেখে তিনি একজনের সম্বন্ধে বলে যেতে পারেন যে অপব্যবহার হলে প্রবীরদার অলৌকিক ক্ষমতা আছে প্রতিপন্ন করার জন্য যথেষ্ট। তিনি নিখুঁত ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অসাধারণ। যেমন বলেছিলেন বিজেপি এবার হারবে। কংগ্রেস জিতবে ও মনমোহন সিংই প্রধানমন্ত্রী হবেন, সোনিয়া নন। তাও মনমোহন গদিতে বসার দেড় বছর আগে। রাজনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি কতটা ওয়াকিবহাল এ তারই প্রমাণ। তিনি কেন এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তাও বিশ্লেষণ করে আমাদের বুঝিয়েছিলেন। বলে দিতে পারেন কোন সদস্য অন্তর্ঘাত চালাবে তাও এবং যথেষ্ট আগে। একবার রবিবারের এক স্টাডি ক্লাসে একটি মেয়েকে প্রথম দেখেই বলেছিলেন যে তার সঙ্গে তার বরের বয়সের পার্থক্য অন্তত ২০-২২ বছর, গৃহশিক্ষকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, মেয়েটি যথেষ্ট মদ্যপান করে।

দশ : প্রবীরদার কাজের সময়? বলছি। যতটুকু সময় ঘুমোন ততটুকু সময়ই অবসর।

পিনাকী ঘোষের কথায় :

আজ থেকে বছর বত্রিশ আগে কলকাতা চিড়িয়াখানায় এক রোগাপাতলা বাঙালি ভদ্রলোক খুব বিপাকে পড়েছিলেন। তাঁর হাতে ধরে রাখা বছর দুয়েকের শিশুটি এমন চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছিল যে, ছোটখাটো একটা জটলা জমে গিয়েছিল, যারা ভদ্রলোককে ছেলেধরা বলে মারে আর কী।

—ছেলেটা কে?

—আমার ছেলে।

—তাহলে অত চেঁচাচ্ছে কেন?

—ওর মা জল আনতে গেছে। মা'কে না দেখে চেঁচাচ্ছে।

—সব বাজে কথা। কেউ সঙ্গে নেই। বাচ্চা নিয়ে পালাচ্ছিল... ধরা পড়ে বলছে, নিজের ছেলে... মা'কে না দেখে চেঁচাচ্ছে, বলল একজন। ভিড় বাড়ছিল। কেউ কেউ যখন পুলিশ ডাকার কথা ভাবছেন, তখন ভদ্রলোকের স্ত্রী ওয়াটার বট্‌লে জল ভরে ফিরলেন, এবং শিশুটিও শান্ত হল। ভিড় তখন হাওয়া। শিশুটি আমি। এবং এই ভদ্রলোক আর কেউ না, আমার বাবা প্রবীর ঘোষ।

বাবাকে ছোটবেলায় রোগাপাতলা দেখেছি...শ্যামবর্ণ। ঝকঝকে দাঁত, এক মাথা চুল। ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। কার্টুন আঁকতেন। বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় লিখতেন। বাবা ও গণেশ জেঠু (হালুই) 'দমদম আর্ট ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'প্রান্তিক' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা করেছিলেন। সেই সময়ে অনেকগুলো ভাল গল্পের বই সম্পাদনা করেছিলেন। বড় হয়ে সে সব বই পড়েছি।

১৯৭৭ সালে দমদম পার্ক ছেড়ে আমরা চলে আসি দেবীনিবাসে, যেখানে আমার বড় হয়ে ওঠা। তখন বাবার খুব কাছের বন্ধুরা ছিলেন তপনকাকু, গোরাকাকু। আমাদের বাড়িতে সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, খেলোয়াড়, রাজনীতিকরা আসতেন। আড্ডা দিতেন। মাঝে-মধ্যেই সাহিত্যের আসরে যেতেন। সাহিত্য পাঠ চলত। আমি বোর হতাম।

আমার জন্মের আগে থেকেই বাবা বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সুবাদে বাবা প্রায়ই বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। সঙ্গে মা-ও যেতেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে মাকে সঙ্গে নিতেন। দেওঘরে পুলিশ ধরতে বাবা বলেছিলেন, কম টাকায় হনিমুন সারতেই এখানে আসা। সঙ্গে বিয়ের সার্টিফিকেট নিয়ে ঘুরতেন। আমি জন্মাবার আগে পুলিশ দমদম পার্কের বাড়িতে রেইড করেছিল।

বাবার সঙ্গে প্রথম কলকাতা বইমেলা দেখা সম্ভবত ১৯৭১ সালে। এখন বুঝি, সেই বইমেলা ছিল অনেক ছোট, যদিও আমার কাছে তখন বড়ই মনে হয়েছিল, কারণ আমিই ছিলাম মাত্র পাঁচ বছরের। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ছাউনিতে ঢুকলে বাবা বেরোতে চাইতেন না। আমি সাদা সাদা ম্যাগাজিনগুলো দেখে ভাবতাম, এর মধ্যে কী আছে এত ইন্টারেস্টিং?

একবার 'পরিবর্তন' পত্রিকার সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সল্টলেকের বাড়িতে সাহিত্যসভা হল। সেখানেই আমি প্রথম নারায়ণ সান্যালকে দেখি। 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকা তখন ব্যাপক চলত। বাবা পরিবর্তনে ধারাবাহিক লিখতেন 'লৌকিক অলৌকিক'। তখন থেকেই দেখতাম, অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার ও জ্যোতিষীদের ভিজিট করতেন।

বাবা একসময় সাহিত্যধর্মী লেখা থেকে 'লৌকিক অলৌকিক' লেখার দিকে সরে এলেন। যদিও খাঁটি সাহিত্যে থাকলে তাতেও নাম করতেন।

বছরে একবার করে বেড়াতে যেতাম আমরা। বম্বে, অজন্তা, ইলোরা, গোয়া, দার্জিলিং, গ্যাংটক, হলং—কমসেকম দিঘা... বেড়াতে যেতামই। ছোটবেলায় পুরী গিয়ে আমি সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিলাম। বাবা আমাকে কীভাবে যেন ডুবসাঁতার দিয়ে খুঁজে পেয়েছিলেন। জোর বেঁচে গিয়েছিলাম। সেটা ১৯৭৮ সাল। এরপর বাবার পুরীর প্রতি আকর্ষণই চলে যায়, সেই ভয়ানক স্মৃতি—পেটে জল ঢুকে আমি বেহুঁশ, বাবার পা মচকে গিয়েছিল, সবাই ভেবেছিল আমি আর বাঁচব না।

বাবা মাঝে-মাঝে বুজরুকদের ধরতে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতেন। তাঁর উপর আক্রমণও হয়েছে কয়েকবার। আমার মনের জোর বাড়াতে ক্যারাটে ক্লাসে ভর্তি করেন।

হুল্লোড় করতে ভালবাসতেন, এখনও বাসেন। মাঝে-মাঝে 'মেভরিক' কাজ করে ফেলতেন। যেমন একবার দেওয়ালির দিন আমরা (অর্থাৎ ছোটরা) ঠিক করলাম আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির বাদল রায়ের (আমরা ছোটরা বলতাম বাঁদর রায়) লেটারবক্সটা চকলেট বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেব। তার কারণ কিছুই নয়, আমাদের ক্রিকেট বলগুলি উনি ফেরত দিতেন না। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? ছোটরা মিলে ধরলাম বাবাকে। তিনি লেটারবক্সে চকলেট বোম রেখে আগুন দেওয়ার মিনিট খানেকের মধ্যেই লেটারবক্স হাওয়া। হাততালি দিয়ে উঠলাম আমরা।

এরকম 'মেভ্‌রিক' আচরণ এখনও আছে, তাঁর মধ্যে। এখন সেটা কথায় বেশি প্রকাশ পায়। যেমন একবার আইসক্রিমের দোকানে সবাই মিলে গিয়ে দেখলাম আইসক্রিম নেই। গেলাম ঠান্ডা পানীয়ের দোকানে। সেখানেও দোকানি বলল—ঠান্ডা পানীয় নেই। অগত্যা গেলাম কচুরির দোকানে। বাবা বললেন,

—কচুরি নেই তো?

—আছে। বলল দোকানি।

—সে আবার কী? এই ছিল বাবার উত্তর।

দোকানি হতভম্ব।

এরকম উদাহরণ আরও আছে।

লোকাল ট্রেনে সমিতির সবার সঙ্গে ট্রাভেল করছেন। ট্রেনে একটি সিট খালি। কিন্তু সামনের ভদ্রলোক বসছেন না। দেখে বাবা তাঁকে বললেন,

—ব্যথাটা খুব কষ্ট দেয়, না?

—কোন ব্যথা? ভদ্রলোক একজন অচেনা ব্যক্তির থেকে এমন মন্তব্য শুনে কিছুটা অবাক।

—আপনার পাইলসের (অর্শ) ব্যথাটা। বসতে পারছেন না দেখছি।

সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের সঙ্গে এমন রসিকতা করতে পিছপা হন না। আর এই রসিকতাগুলি করেন একদম গম্ভীরভাবে।

কেউ যদি ফোন করে বলে, প্রবীরদা, রোববার সকালে আসছি। উনি হয়তো উত্তর দেন, আয়। আবার কড়াপাকের সন্দেশ আনিস না যেন। সমঝদারকে লিয়ে ইশারা হি কাফি হ্যায়। বুঝে নিতে হবে ওনার সন্দেশ খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে।

হিসেবনিকেশও তিনি 'মেভরিক'। ছোট ছোট ব্যাপারে খুব হিসেবি... পাই পয়সার হিসেব রাখেন, কিন্তু বড় বড় ব্যাপারে একেবারেই বেহিসেবির মতো খরচা করেন। আর সেই কারণেই ১৯৮৫ সাল থেকে বেস্টসেলার লেখক হয়ে থেকেও তিনি আজ একটি ৬০০ স্কোয়ারফিট ভাড়া বাড়িতে থাকেন। বেহিসেবি খরচের একটি বড় অংশই যায় সমিতির পেছনে।

বাবার সঙ্গে সমিতির অনেক অনুষ্ঠানে গিয়েছি। অনেক ঘুরেছি। প্রথম দিকে আমিই ছিলাম একমাত্র অ্যাসিসট্যান্ট। পরে অগণিত মানুষ এগিয়ে এলেন। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান করেছি। তাঁর সঙ্গে বই লেখারও সুযোগ হয়েছে। সমিতির প্রথম মুখপত্র 'কিশোর যুক্তিবাদী' সম্পাদনা করার সুযোগ হয়েছে। পরে কেরিয়ার তৈরির বছরগুলোতে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি পড়াশুনো ও কেরিয়ার নিয়ে। আবার ফিরে আসা সমিতির ও বাবার ওয়েবসাইট তৈরির মাধ্যমে।

অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপারের ফিরিস্তি আরও আছে। কারও কারও ওপর হঠাৎ চটে যান। খুব চটে যান। কিন্তু খুব বেশি হলে মিনিট পাঁচেকের জন্য। পাঁচ মিনিট পরেই আবার তার সঙ্গে হেসে কথা বলতে দেখা যায়।

একবার আমি জাল-জাল মতো অনেক পকেটওয়ালা একটি জ্যাকেট কিনলাম। আমি যখন ইতস্তত করছি ওটা পরলে আমাকে হাস্যকর লাগবে কি না বাবা ওটা নিয়ে নিলেন এবং নির্দ্বিধায় আপন করে নিলেন। টুপিটি কবে থেকে শুরু

হয়েছিল মনে নেই। সম্ভবত ১৯৯৩-তে। কিন্তু 'BE RATIONAL' লেখা বাবার টুপি—অনেকটা হিমেশ রেশমাইরার টুপির মতোই আর একটা আইকন। প্রথম টুপিটি বাবাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন বিবিসির ডিরেক্টর রবার্ট ইগল। আমার সেই জ্যাকেটটিও বাবাকে ছাড়েনি।

আরও আগে আমি যখন ফোরে পড়ি তখন আমার একটা সাইকেল ছিল লাল রঙের। লম্বা সিটের পিছনে ছিল হাতখানেক লম্বা স্টিলের একটা উল্টো ইউ....ছোটদের সাইকেল শেখাতে বড়রা ওটা ধরে থাকেন। বাবা সেটা চালিয়ে বাজারে বা এপাড়া-ওপাড়া চলে যেতেন। বলা বাহুল্য, রাস্তার লোকেরা মাঝবয়সি একজনকে ছোটদের সাইকেল চালাতে দেখে বিস্মিত হতেন...এমনকী কেউ কেউ চটুল মন্তব্য করতেন। কিন্তু তিনি পাত্তা দিতেন না।

একবার স্কুল থেকে ফিরে (ক্লাস নাইনে পড়ি তখন) দেখি বাবা একজনকে আমাদের বাড়ির বৈঠকখানায় কান ধরে ওঠবস করাচ্ছেন। যিনি ওঠবস করছেন, তিনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক দাড়ি-গোঁফওয়ালা ব্যক্তি। পরে জানলাম তার নাম রূপরাজ, এবং সে এসেছিল বাবাকে চ্যালেঞ্জ করতে। জলের নিচে বিনা অক্সিজেনে সে নাকি চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে পারে। বাবা তার নাকমুখ চেপে ধরতেই সে দু-মিনিট হাঁসফাঁস করে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল। বিরক্ত করতে আসার জন্যেই এই শাস্তি।

বাবার সঙ্গে আমার ছেলে ঋজুর খুব বন্ধুত্ব। সে জানে যে তার দাদু 'ভূত তাড়ায়'। এই সেদিন ঋজু তার দাদুকে প্রশ্ন করল, দাদান, তুমি এত্ত বই লিখেছ শুধু ভূত তাড়ানো নিয়ে? আর লোকে এগুলো পড়ে?

বোঝো!

অঞ্জন চক্রবর্তীর কথায় :

ভারতে যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্ব প্রবীর ঘোষ, আপনাকে এই খোলা চিঠি লিখছি। আপনাকে যাঁরা অনেকদিন ধরে চেনেন, জানেন, আপনার দীর্ঘ দিনের কর্মকাণ্ডের সাথী তারা হয়তো আরও ভাল করে আপনাকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন। আমি সংগঠনের নেহাতই এক সাধারণ কর্মী হিসেবে মাত্র কয়েক বছরের জন্য কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। সেই অনুভূতি বলার জন্য একটা তাড়না বোধ করছি।

আপনার সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা দরকার। ভারতীয় দর্শনে সেই বৈদিক যুগ থেকেই ঈশ্বর, অলৌকিক শক্তি, আত্মা, পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতি ভাববাদী দর্শনের পাশাপাশি বস্তুবাদী চিন্তা বা নাস্তিক্যবাদী দর্শন সমান্তরালভাবে প্রবাহমান ছিল, যা আমরা বুদ্ধ বা মহাবীরের চিন্তাধারায়, চার্বাক

বা লোকায়ত দর্শন, কপিলের সাংখ্য দর্শনের মধ্যে দেখতে পাই। কাশ্যপ, জয়ন্ত ভট্ট, গুণরত্ন, মাধবাচার্য, অজিত কেশকম্বলি প্রমুখ পণ্ডিতেরা বিভিন্ন সময়ে লোকায়ত দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। ওই সময় বিজ্ঞান ছিল অনুন্নত, তাই তাদের সাধ্যমতো অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে সেই ব্যাখ্যাগুলিতে অনেক সীমাবদ্ধতা অবশ্যই ছিল। কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় আস্তিক্যবাদী দর্শনের পণ্ডিতদের ছল-বল-কৌশলের কাছে সেই প্রবাহ বা চর্চা ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপর বেশ কয়েকশো বছর পরে ইউরোপের রেনেসাঁসের কল্যাণে এদেশেই কিছু প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রবেশ করতে থাকে। তারই প্রভাবে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের কিছু মানুষ অন্ধ-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়েছিলেন। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, জাতিভেদ, ধর্মভেদ প্রভৃতি বিষয়গুলি ছিল তাদের অন্যতম। সেগুলি অবশ্যই সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল। সেই রেনেসাঁস যুগের দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ মনীষীর অবদানকে সম্মান করেও বলতে পারি তাঁরা তাদের সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরিয়ে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য কোনও ব্যাপক সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেননি।

গত শতকের ৬-এর দশকের শেষ ও ৭-এর দশকের প্রথমদিক পর্যন্ত সংগঠিত নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর তার কারণ অনুসন্ধানে আপনি উপলব্ধি করলেন, এইসব শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য প্রধানত দরকার ব্যাপকতর গুণগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। শোষণের শক্তিশালীতম হাতিয়ার কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ, পূর্বজন্মের কর্মফল, ধর্ম, জাতিভেদ, ঈশ্বর তথা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস প্রভৃতি যতদিন সমাজে বিরাজমান থাকবে, ততদিন সাধারণ মানুষের চেতনা ও শোষণ মুক্তি সম্ভব নয়। তাই এই ভ্রান্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে সাধারণ মানুষকে বের করে আনতে প্রয়োজন বলিষ্ঠ যুক্তি সমন্বিত নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি করা। প্রয়োজন সমাজকে সাংস্কৃতিক দূষণ মুক্ত করা। কলম হাতেই জনমত তৈরি করতে লেগে পড়লেন। ব্যক্ত করলেন নতুন চিন্তাধারা—পুঁজিবাদী কৌশলের সার্থক মোকাবিলা করতে হলে যুক্তিবাদকেও নতুনভাবে সাজাতে হবে, পাল্টাতে হবে। লিখলেন যুক্তিবাদ, 'নব্য যুক্তিবাদ' যা চিরকালই সমকালীন থাকবে। এ এমন একটি স্ববিরোধিতাহীন, বিশ্ব-নিরীক্ষণ পদ্ধতি, একটি সামগ্রিক জীবন দর্শন যার সাহায্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি জগতের সমস্ত কিছুকে ব্যাখ্যা করা যায়, বিশ্লেষণ করা যায়। যার একপিঠে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-সাহিত্য, অন্যপিঠে নীতি ও মূল্যবোধ। এই দুয়ের সাহায্যেই নিজেকে পাল্টাতে পাল্টাতে বুঝতে হয়, আর বুঝতে বুঝতে পাল্টাতে।

কিন্তু এর অনেক আগে থেকেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে-শহরে, বিভিন্ন কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। শুনেছি প্রথমদিকের অনুষ্ঠানগুলিতে আপনার সঙ্গী ছিলেন মাত্র দু'জন—বউদি ও পিনাকী, আপনার ছ-সাত বছরের ছেলে। আম জনতা যে সময়ে ঘোর সংসারী হন, অনেক আগুন-খোর বিপ্লবীকে জানি যারা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ত্যাগ করে চরম ভোগী ও সংসারী হয়ে গেছেন, তখন জীবন-জীবিকার ঝুঁকি নিয়ে আপনি ঘরের খেয়ে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে, তাকে বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ফলে আলোড়িত হতে শুরু হল মানুষের এতদিনের অবরুদ্ধ চেতনা।

খ্রিস্টান ধর্মগুরু মরিস সেরুলো, ফিলিপাইনের ফেইথ হিলার গ্যালার্ড, রেইকি সম্রাট ক্লাইভ হ্যারিস, বাংলাদেশের হুজুর সাইদাবাদী, ডাইনি সম্রাজ্ঞী ইন্সিতা থেকে হাজারের উপর জ্যোতিষ, তান্ত্রিকদের বুজরুকি ফাঁস করেছেন। করে যাচ্ছেন এখনও, জীবনের অসম্ভব ঝুঁকি নিয়েও।

কয়েকবার হামলাও হয়েছে আপনার ওপর। ব্যক্তিগত কুৎসা, পুলিশের হুমকি, অর্থলোভে সংগঠন ভাঙার চক্রান্ত, কিছুই বাদ যায়নি আপনাকে দমিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু না, আপনাকে দমানো যায়নি। নিজ কৃত সংকল্পে অটল থেকেছেন প্রতিবারই।

খ্রিস্টধর্মের প্রধান ধর্মগুরু পোপ-এর নির্দেশে ভাটিকান সিটি থেকে ঘোষণা করা হল মাদার টেরেজাকে 'সেন্ট' উপাধিতে ভূষিত করা হবে। ক্যাথলিক খ্রিস্ট ধর্মমতে কোনও মৃত ব্যক্তিকে কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ পালন করার পরেই 'সেন্ট' ঘোষণা করা হয়। তার মধ্যে সেই মৃত ব্যক্তির আত্মার কোনও অলৌকিক শক্তির প্রমাণ পাওয়া একটি আবশ্যিক শর্ত। সেই শর্ত পালন করতে মাদারের সংগঠন 'মিশনারিজ অফ্ চ্যারিটি' খুঁজে বার করে এক গরিব সাঁওতাল গৃহবধূকে। নাম মণিকা বেস্‌রা। তার নাকি পেটে টিউমার থেকে ক্যান্সার হয়েছিল। প্রার্থনা করার সময়ে মাদারের লকেট থেকে একটা জ্যোতি এসে সেই ক্যান্সার সারিয়ে দেয়। এক ডাক্তারও নাকি একথা স্বীকার করেছেন। আপনি সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে সেই ডাক্তারকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। খুঁজে পেলেন সেই ডাক্তারদের, যাঁরা মণিকাকে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসা করেছিলেন। তাঁরা বললেন, মণিকার হয়েছিল যক্ষ্মা। তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে হয়েছিল টিউমার। এবং সেটি দীর্ঘদিন চিকিৎসা করেই সেরেছে, কোনও অলৌকিক শক্তিতে নয়। এ বুজরুকি ফাঁস করে আন্দোলন শুরু করলেন এরকম প্রতারণার বিরুদ্ধে। সমিতির তরফ থেকে স্পষ্ট বক্তব্য রাখলেন যে, মাদার নিজে কোনও দিন অলৌকিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন না। খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রচার বা আর্তের প্রতি সেবার কারণে তাকে খ্রিস্টগুরুর তরফ থেকে সেন্ট করা হোক, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু কোনও অলৌকিক শক্তি আছে বলে প্রতারণা করা হলে আমরা তার বিরোধিতা করব। কেননা শিক্ষার

সুযোগ লাভে বঞ্চিত, গরিব, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ এই ধরনের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিবর্তে 'মিরাকেল' চিকিৎসার দিকে ঝুঁকবে। আমরা তা কিছুতেই হতে দিতে পারি না।

পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, সমগ্র খ্রিস্টান দুনিয়ার বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে আপনার নেতৃত্বে জয় ছিনিয়ে আনল যুক্তিবাদী সমিতি। হার মানলেন, পোপ। মাদারকে 'সেন্ট' নয়', 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্যা' উপাধি দিয়ে মুখ রক্ষা করল ভাটিকান সিটি। না, এ খবর বাংলার প্রচার মাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়নি কোনও এক অজ্ঞাত কারণে। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম বিবিসি, এ এফ পি, রয়টার নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রভৃতি মহাশক্তিধর নিউজ মিডিয়া কিন্তু গুরুত্ব দিয়েই এ খবর প্রকাশ করেছিল।

যুক্তিবাদী সমিতি আজ মহীরুহ হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রভাব ফেলেছে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে আন্তর্জাতিক সীমানায়। প্রতিবেশী দেশ.ুলতে যুক্তিবাদী আন্দোলন, বিজ্ঞান আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র অনুকরণেই।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, মানবাধিকার লঙ্ঘন যেখানে ঘটেছে, গর্জে উঠেছে আপনার কলম, আন্দোলিত হয়েছে সমাজ, যুক্তিবাদী সমিতি ও তার সহযোগী সংগঠন 'Humanists' Association' এর আন্দোলনে। ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, একটি বহুতল বাড়ির নিরাপত্তা কর্মী। সেখানেই একদিন এক নির্জন ঘরে হেতাল পারেখ নামে এক স্কুল ছাত্রীকে প্রথমে খুন, পরে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। গ্রেপ্তার হয় সে। 'বিরলের মধ্যে বিরলতর' অপরাধ হিসেবে নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত থেকে সুপ্রিম কোর্ট, সব জায়গাতেই তার ফাঁসির সাজা হয়। দশ বছর ধরে তার শুনানি চলে। সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চও তার ফাঁসির সাজা বহাল রাখে। রাষ্ট্রপতি প্রথমবার সাজা মকুবের আবেদন নামঞ্জুর করেন। দ্বিতীয়বার ফাঁসির সাজা মকুবের আবেদন করে ধনঞ্জয়। এমতাবস্থায় কিছু মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি ও কিছু বুদ্ধিজীবীও তার শাস্তি মকুবের জন্য জনমত তৈরি করতে সচেষ্ট হন। 'Humanists' Association' এ বিষয়ে জরুরি সভা ডাকল তার কর্তব্য স্থির করার লক্ষ্যে। সভাপতি হিসেবে আপনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন, দেশের সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ আদালত যখন 'বিরলের মধ্যে বিরলতম' হিসেবে তাকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে তখন অবশ্যই তার ফাঁসি হওয়া উচিত। এবং একই সঙ্গে হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুমিত্রা পদ্মনাভন তীব্র ভাষায় ফাঁসির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। ফাঁসি বন্ধ করতে হলে আগে দেশের আইন থেকে ফাঁসির সাজা বন্ধ করা হোক। সভ্য দেশে ফাঁসি নেই। আমাদের মতো অসভ্য দেশে ফাঁসির শাস্তি আছে—কারণ ফাঁসির প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা সব

ফাঁসির সাজাকে নিশ্চয়ই একচোখে দেখব না। কোনও কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ নিজের অধিকার লড়াইয়ে, কোনও নারীর আত্মসম্ভ্রম বাঁচানোর লড়াইয়ে খুন করার শাস্তি হিসেবে ফাঁসি আর ধনঞ্জয়ের অপরাধের শাস্তি হিসেবে ফাঁসি এক দাঁড়িপাল্লাতে ওজন করা উচিত নয়। সর্বসম্মতিক্রমে ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মিছিল মিটিং, সই সংগ্রহ, বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমাদের বক্তব্য জানিয়ে সমর্থন আদায়—এসবের ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ল। দ্বিতীয়বারের আবেদনও নাকচ করলেন রাষ্ট্রপতি। ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হল। মানবতার জয় হল। আপনি প্রায় বলতেন, সমাজ যেমন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে তেমনই ব্যক্তি বা কোনও সংগঠনও সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে, সঙ্গে থাকতে হবে সততা, নিষ্ঠা, মূল্যবোধ, যুক্তিবোধ, আদর্শ ও মানবতা।

'সংস্কৃতি' শব্দটি বলতে অনেকদিন ধরে যা বুঝতাম তা ছিল অসম্পূর্ণ। আপনার কাছে জেনেছি, 'সংস্কৃতি' বলতে বোঝায় একটি মানবগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনধারা। এবং সেটি প্রধানত দুটি উপাদানে বিভক্ত—একটি বস্তুগত উপাদান, অপরটি অবস্তুগত উপাদান। এই উপাদানগুলি নিয়েই চলতে থাকে একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা-চেতনা পরিবর্তিত হতেই থাকে, আর পাল্টে যেতে থাকে সংস্কৃতি। এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। না, এভাবে সংস্কৃতির সংজ্ঞা কারও লেখাতে পাইনি। আপনার কাছেই জেনেছি, 'দেশপ্রেম' মানে কখনও শুধু দেশের মাটিকে ভালবাসা নয়। 'দেশপ্রেম' মানে দেশবাসীর প্রতি প্রেম। আর দেশবাসীর প্রতি প্রেম থাকলে তো একসঙ্গে সংখ্যালঘু শোষক ও সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিতদের প্রেম করা যায় না। সুতরাং দেশপ্রেম হল সংখ্যাগুরু শোষিত মানুষের প্রতি প্রেম। আপনি স্পর্ধার সঙ্গে কাশ্মীরের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। যুক্তি দিয়েই কাশ্মীর আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করলেন। আপনি মুখোশ খুলে দিয়েছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে রাষ্ট্রের ধর্মতোষণকারী চরিত্রকে। বললেন, 'ধর্মনিরপেক্ষ' মানে কোনও ধর্মের পক্ষে নয়, অর্থাৎ সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। বেআব্রু করলেন রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, পুলিশ, প্রশাসন, সাহিত্যিক, গায়ক-বুদ্ধিজীবীদের দুর্নীতি, দ্বিচারিতা, ধান্দাবাজি, অনাচারের সাতকাহন। যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার করতে গেলে ভাববাদী দর্শনকে আঘাত করতে হবে, আঘাত করতে হবে ধর্মকে, অধ্যাত্মবাদকে। কারণ এগুলি শোষক ও শাসকদের স্বার্থরক্ষা করে, স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কে পেরেছে এমন করে ভাবতে, লিখতে, খোলাখুলি বলতে?

আপনি বলেছিলেন, মানুষ সাধারণভাবে যুক্তিপ্রিয়। ভাল যুক্তির সঙ্গে পরিচিত হলেই খারাপ যুক্তিকে ফেলে দিয়ে ভালটাকে গ্রহণ করে। তাই তো ধর্মের নতুন সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচিত হলাম। লিখলেন, ধর্ম মানে Religion নয়, ধর্ম মানে

'Property'। লোহার ধর্ম যেমন কাঠিন্য, আগুনের ধর্ম যেমন দহন করা, জলের ধর্ম যেমন তার প্লবতা, তেমন মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত তার মনুষ্যত্ব, মানবতা। এরকম যুক্তির সঙ্গে তো আগে কোনও দিন পরিচিত হইনি। দেশের আইন পর্যন্ত আপনারা হাজির করা ধর্মের এই সংজ্ঞাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, আর মানুষ পেয়েছে 'ধর্ম' হিসেবে 'মানবতা'কে ব্যবহার করার অধিকার।

আমিও অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো ভাবতাম বয়সে বড় স্বজনকে গুরুজন হিসেবে প্রণাম করতে হয়। আমিও তাই করতাম। আপনি লিখলেন, প্রণাম করা মানে কোনও মানুষকে শ্রদ্ধা জানানো। প্রবীণ মানুষটি যদি অসৎ হন, দুর্নীতিগ্রস্ত হন, অনাচারী হন তাহলে তিনি কিছুতেই শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারেন না। প্রণাম পেতে পারেন না, এইভাবে তো আগে আমাকে কেউ ভাবায়নি।

বিবাহিত দম্পত্তিকে আমরা স্বামী-স্ত্রী বলি। আপনি বললেন বিবাহিত সম্পর্ক মানে বন্ধুত্বের সম্পর্ক, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। 'স্বামী' কথাটির অর্থ প্রভু বা মালিক। যদি একজন মালিক বা প্রভু হন সেখানে তার সঙ্গে দাসীর কখনও বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকতে পারে না। থাকতে পারে না পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

কৈশোর থেকে বড়দের কাছে শুনে আসছি, যে পুরুষ শ্বশুরবাড়িতে থাকে সে ব্যক্তিত্বহীন, মেরুদণ্ডহীন লোভী, 'ঘর জামাই', হিসেবে সে সমাজের কাছে ঘৃণ্য প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু আপনি যুক্তি দিলেন একজন নারী যখন বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে পারে তাহলে একই যুক্তিতে একজন পুরুষের শ্বশুরবাড়িতে থাকা ও তার পরিবারের পক্ষে অসম্মান হবে কেন? এরকম অজস্র যুক্তিহীন মূল্যবোধ—যা যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে প্রবহমান, সেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আমার বড় হয়ে ওঠা। আমার বোকা বোকা ভাবনাগুলোর জঞ্জাল পেরিয়ে যুক্তির সোপান বেয়ে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। সারা জীবন ধরে চেষ্টা করতে হবে। আপনি শিখিয়েছেন, যুক্তিবাদী সাজা যায় না। নিরন্তর জীবনচর্চার মাধ্যমে যুক্তিবাদী হয়ে উঠতে হয়।

কত ব্যক্তিগত স্মৃতির কথা মনে পড়ছে। সালটা ২০০৩। সমিতির কাজে আপনার সঙ্গে আমরা কয়েকজন বোলপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে শান্তিনিকেতন ঘোরার জন্য বরাদ্দ ছিল একদিন। বিকেল বেলায় শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে ঠিক হল আশ্রমের ঐতিহ্য মেনে আমরাও কোনও এক গাছের তলায় স্টাডি ক্লাস করব। অবশ্যই মধ্যমণি আপনি শিক্ষকের ভূমিকায় আর আমরা জিজ্ঞাসু কয়েকজন। আলোচনা গভীর থেকে গভীরতর হতে হতে কখন যে সন্ধে পেরিয়ে রাত্রি নেমেছে খেয়াল করিনি। আলোচনা অসমাপ্ত থেকেছে। প্রশ্ন-উত্তর-বিতর্ক, আলোচনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে।

আমার এই চিঠির মাধ্যমে এমন একজন মানুষকে আমি শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছি

যে আমার প্রথম যৌবনের নায়ক। সে সলমন খানের মতো পেশীসুলভ নয়, অনেকটা সত্যজিৎ রায়ের 'ফেলুদা'র ন্যায় অসম্ভব মেধা, ক্ষুরধার উপস্থিত বুদ্ধি, অসীম সাহস ও বরফশীতল মস্তিষ্ক দিয়ে একের পর এক সমাজের শত্রুদের ঘায়েল করছে। আর এই যৌবন সায়াহ্নে এসে উপলব্ধি করি যে, তিনি বর্তমান সময়ের চেয়ে কয়েকশো বছর এগিয়ে থাকা একজন। আমার এ চিঠিতে কোনও তত্ত্ব ও তথ্যে ভুল হয়ে থাকলে বা কোনও বিষয়ে সহমত না হলে মার্জনা করবেন, ভুল শুধরে দেবেন। Byron বলেছিলেন, 'My grammer may be wrong, but I am not wrong in my passion!'

বিপত্তারণ পরামানিকের কথায় :

প্রবীর ঘোষ সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। তাঁর লেখা আঠাশ বছর পুরনো বই আজও বেস্ট সেলার লিস্ট-এ আসে। তিনি যুক্তিবাদী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, নব্য সমাজতন্ত্রের চিন্তা তারই হাত ধরে ছড়িয়েছে বস্তার থেকে ভেনেজুয়েলা—একথা সকলেই জানেন। যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী সমিতিকে কেন্দ্র করে অলৌকিক রহস্য ফাঁস, জ্যোতিষীদের জেলে পাঠানো, শর্মিলা চানু থেকে কাশ্মীরবাসীদের পাশে দাঁড়ানো ইস্পাতকঠিন প্রবীর ঘোষের পক্ষেই সম্ভব। আরও বহু ঘটনা তাঁর বইয়ে পড়েছি। কিন্তু বইয়ে যা নেই, তা হল, তাঁর মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মধ্যেও লুকিয়ে আছে এক মজাদার কিশোর। আসলে প্রবীব ঘোষ মানেই একটা ভীষণ বর্ণময় মানুষ। বর্ণময় জীবনকাহিনি। বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই কিশোরের যুক্তিবাদী সমিতিকে ঘিরে আনন্দ ফুর্তি, ভয়, দুঃখ, রাগ, ভালবাসা, দুষ্টুমি বারবার প্রকাশ পায়। অনমনীয় লৌহমানব প্রবীর ঘোষের মতোই সেই কিশোর প্রবীর ঘোষও বোধহয় সমান প্রাসঙ্গিক।

প্রচুর আন্দোলনের নেপথ্য নায়ক তিনি, যা কোনও বইয়ে লিখে যাননি, আর যাবেনও না। যাদের নেতৃত্বে দিয়েছেন, তারা ছাড়া হাতে গোনা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই জানে ঘটনাগুলো। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান পাবলিশার্স Wilelly-Blackwell, পৃথিবীর মাত্র ৫০ জনের লেখা নিয়ে একটা বই ছেপেছে '50 voices of disbelief'। এই ৫০ জনের মধ্যে ভারতের মাত্র ২ জনের লেখা আছে, প্রবীরদা ও সুমিত্রাদির। এটা একটা বেস্ট সেলার বই। এটা নিঃসন্দেহে বিশাল অ্যাচিভমেন্ট। তবুও এই কথাগুলো এখনো প্রবীরদা তাঁর Biography-তে লেখেননি। এখন এও জানি শুধু BBC নয়; জার্মান টিভি, আলজারিয়া আরও অনেক বিদেশি মিডিয়া প্রবীরদা বা যুক্তিবাদী সমিতির উপর ডকুমেন্টারি বানিয়েছে। দেশি মিডিয়াদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব আর বিদেশিদের শুধুই ট্যালেন্ট।

৩-৪ মার্চ ২০১০, মৌলালি কনফারেন্সে প্রবীরদার সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। তবে বাড়তি পাওনা এক ঝাঁক প্রায় সমবয়সি বন্ধু। দারুণ লেগেছিল প্রথম

কনফারেন্স। দুই দিন ব্যাপী কনফারেন্সের একটা বিশাল সময় কেটেছিল স্বয়ম্ভর গ্রাম নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায়। আলোচক প্রবীর ঘোষ, আর প্রশ্নকর্তা উপস্থিত সকলে। প্রথমদিন মধ্যাহ্নের আগে স্বয়ম্ভর গ্রাম নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। প্রচুর প্রশ্ন সমেত এতই টানটান ছিল আলোচনা যে লাঞ্চের সময় পিছিয়ে দিতে হয়েছিল। আলোচনা, বিতর্ক তাও থামেনি। দ্বিতীয় দিন লাঞ্চের পরে কিছু সময় স্বয়ম্ভর গ্রাম নিয়ে আলোচনার জন্য রাখতে বাধ্য হয়েছিল আয়োজকরা। আলোচনা এত দীর্ঘায়িত করার বড় কারণ, প্রবীরদা কোনও প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাননি; আজ পর্যন্ত কোনও প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে দেখিওনি। স্বয়ম্ভর গ্রাম নিয়ে সমস্ত আলোচনা আমি বুঝেছিলাম এমন নয়, তবে আমারও কিছু প্রশ্ন ছিল। আর সেইজন্যেই বোধহয় প্রবীরদা বা যুক্তিবাদী সমিতির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলাম।

৩ জুলাই ২০১০ আই আই টি-র পড়াশুনা শেষ করে কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স-এ গবেষণার জন্য স্কলারশিপ নিয়ে কলকাতায় এলাম। পড়াশুনার জন্য খড়্গপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে এলাম। সেই থেকে যুক্তিবাদী সমিতির স্টাডি ক্লাসে যাতায়াত ও প্রবীরদাকে আরও ভাল করে দেবার সুযোগ। স্টাডি ক্লাসে প্রচণ্ড সিরিয়াস আলোচনার মধ্যেও মজা করা এবং আলোচনায় ফিরে আসার একটা নিজস্ব স্টাইল প্রবীরদার ছিল। ধরুন আজ ক্লাসে কেউ 'শিঙাড়া' খাওয়াবে বলেছে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার মাঝেই হঠাৎ প্রবীরদা বলে উঠলেন শিঙাড়া না খাওয়ালে আর কথা বেরোচ্ছে না, যা শিঙাড়া নিয়ে আয়। শিঙাড়া আনতে আনতে সকলে যে যার মতো অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে গল্প করতে লাগল। খাওয়া শেষ হতেই আবার প্রবীরদার জমজমাট আলোচনা করা শুরু হল। অমনোযোগীদেরও প্রবীরদা খুব দ্রুত আলোচনায় মনোযোগী করতে একটা কৌশল অবলম্বন করতেন। ধরুন গাবলু আলোচনায় অমনোযোগী হয়ে পেন নিয়ে খেলা করবে আর আমাদের রাজ্যের দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতির অবসান ঘটাবে। স্টাডি ক্লাসে উপস্থিত সকলে গাবলুর দিকে তাকাতেই লজ্জিত গাবলু পেনটা রেখে আলোচনায় মন দিল।

সমিতির প্রতিটি সদস্যের প্রতি প্রবীরদার শিকারির মতো সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কারণ লোভ বারবার সদস্যদের গ্রাস করেছে। এই লোভীদের দিয়েই যুক্তিবাদী সমিতির ভাঙন ধরানোর চেষ্টা হয়েছে। আবার অনেকে যুক্তিবাদী সমিতিকে বিপথগামী করতে সরাসরি প্রবীরদাকেই টাকার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে শুধু আমি কেন কেউই প্রবীরদাকে টাকা নিয়ে রফা করতে দেখিনি। একটা ঘটনা না উল্লেখ করলেই নয়। পার্কসার্কাস মসজিদ থেকে দু'জন—আলি ও তার বন্ধু একদিন ক্রিক রোডের স্টাডি ক্লাসে হাজির। স্মার্ট ছেলে দুটি যুক্তিবাদ নিয়ে জানতে চায় ও প্রবীরদার কিছু উত্তর রেকর্ড করতে চায়। তাই সঙ্গে ডিজিটাল ক্যামেরা নিয়ে এসেছে। তারা অবশ্য যুক্তিবাদ নিয়ে জানার পরিবর্তে ইসলাম ধর্মের অভ্রান্ততা

ও ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর অবদান নিয়ে তর্ক করে গিয়েছিল। কিন্তু স্টাডি ক্লাসে ঈশ্বর বা আল্লাহ্ ছাড়া প্রচুর জরুরি আলোচ্য বিষয় থাকে। প্রবীরদা আলি ও তার বন্ধুকে 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' বইটা পড়ে আসতে বললেন। ছেলে দুটো অবশ্য আলোচনা শুনতে চায় বলে থেকে গেল। ওরা প্রবীরদাকে ইসলাম ধর্মের পক্ষে প্রচারের জন্য বই লেখার প্রস্তাব জানাল ও আরও বলল, যুক্তিবাদী সমিতির বা প্রবীরদার টাকা নিয়ে কোনও দিন ভাবতে হবে না। ইসলাম ট্রাস্টের প্রচুর টাকা। বুঝুন যিনি বহু পূর্বেই কোটি টাকার অফার ত্যাগ করেছেন তাঁকে টাকার লোভ দেখিয়ে কেনা যেতে পারে কি? প্রবীরদা আলি ও তার বন্ধুকে কী উত্তর দিয়েছিলেন জানি না, তবে ওদের আর স্টাডি ক্লাসে কোনও দিন দেখিনি বা প্রবীরদার ইসলাম ধর্মের পক্ষে প্রচার নিয়ে কোনও বই এখনও তো চোখে পড়িনি।

নিজ জীবনেও তিনি অর্থের প্রতি উদাসীন ছিলেন। প্রচণ্ড অর্থকষ্ট হলেও তিনি কখনও কারুর কাছে প্রকাশ করেননি। ২০১১ সালে চিকিৎসার জন্য হঠাৎ অনেক অর্থের প্রয়োজন ঘটে। বহু কষ্টে তিনি শেষ পর্যন্ত টাকা জোগাড় করেছিলেন। না, প্রবীরদা কোনও দিন ঘটনাটা আমাদের বলেননি, পাছে, সমিতির সদস্যরা অর্থ সাহায্যের কথা ভাবে। সুস্থ হওয়ার বহুদিন পর ঘটনাটা আমরা জানতে পেরেছিলাম বউদির কাছ থেকে। সমিতির সদস্যদের লোভমুক্ত থাকার কথা বলেছেন। সংযম নিয়ে একবার দারুণ ক্লাসও নিয়েছিলেন। সেই ক্লাসে তিনি লোভমুক্ত থাকার উপায়ও বলেছিলেন। কিন্তু এত শেখানো সত্ত্বেও খুব একটা কাজ হয়েছিল বলে মনে হয় না। নইলে Guest House থেকে মাঝে-মাঝেই বই অদৃশ্য হয় কী করে? মোদ্দা কথা হল যখন লোভ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন সামলানো খুব মুশকিল হয়। আমার মধ্যেই একবার ভয়ঙ্কর লোভ জেগে উঠেছিল।

দিনটা আজও মনে আছে, ৩১ আগস্ট, ২০১০। সকালে প্রবীরদার বাড়ি গেছি একটা দরকারি কাগজ পৌঁছে দিতে। কিছুক্ষণ চা সহযোগে আড্ডা দেওয়ার পর এবার ফিরব, এমন সময় প্রবীরদা বলে উঠলেন, 'প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ' বইটা পড়েছ? পড়ে দেখো আমাদের সমিতি ও সমিতির তরুণ লেখকদের সম্পর্কে অনেক নতুন কিছু জানতে পারবে। প্রবীরদা বইটা এনে লালকালি দিয়ে সই করে বললেন, পঞ্চাশ টাকা দাম। আমি টাকাটা মানিব্যাগ থেকে বার করতেই প্রবীরদা বইটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিজেই বলে উঠলেন, টাকার দরকার নেই। বইটা রাখো, মনে করো তোমাকে উপহার। টাকাটা রেখে দিয়ে আমি প্রবীরদার হাত থেকে বইটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। একবারের জন্যও মনে হয়নি ইনি সমিতির সবাইকে বই উপহার দিলে সমিতি চলবে কী করে। পঞ্চাশ টাকার জন্য নয়, সমিতিতে তখন নবাগত আমি, প্রবীরদার কাছ থেকে উপহার পাওয়ার বিরল লোভটা সেদিন সামলাতে পারিনি। আর সেদিন লোভ সংবরণের চেষ্ট করলে

হয়তো জীবনের অন্যতম বড় একটা ভুল হত।

সমিতির সদস্যরা ঠিকমতো বাড়ি ফিরল? সকলের শরীর সুস্থ আছে তো? এসব নিয়ে মাঝে-মাঝেই প্রবীরদা খুব চিন্তিত হতেন। দুটো ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

প্রতি বছর বইমেলায় দুটো জিনিস প্রবীরদা করতেনই। নতুন বই বার করা আর নতুন বই বার করার তাড়ায় বইমেলার সময় ভীষণ শরীর খারাপ করা। ২০১২-র বইমেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিডনি ও স্নায়ুর সমস্যার জন্য পা খুব ফুলে যেত। হাঁটতে পারতেন না। বেশি ঘুম ও বিশ্রামই তখন একমাত্র জরুরি পথ। তবুও প্রবীরদা প্রতিদিন বইমেলায় আসতেন। বইমেলার শেষদিন প্রবীরদা ও সুমিত্রাদি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন ও আমাদেরকে শেষ অনুষ্ঠান দেখে ফিরতে বললেন। কাজেই আমি, অনিন্দ্য, অনিমা ও অভিজিৎ থেকে গেলাম। শেষ অনুষ্ঠান দেখে যখন বইমেলা থেকে বেরোলাম তখন রাত্রি ১০টা ২৫। ভিড়ের মধ্যে এবার বাস বা ট্যাক্সি ধরার হাঙ্গামা শুরু। ১০টা ৩০ নাগাদ প্রবীরদার ফোন, তোরা কোথায়? কখন ফিরবি?

আমি জানালাম, ফাঁকা ট্যাক্সি পাওয়া যাচ্ছে না আর ভিড় বাসে এই ব্যাগ ভর্তি বই নিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তা কী ব্যাপার, আপনার তো ১০টা ৩০-এ ঘুমোনোর কথা, ঘুমোননি?

প্রবীরদার উত্তর, কাল থেকে প্রচুর অবসর সময়, চিন্তা করিস না, তোরা ট্যাক্সি পেলে ফোন করিস।

আরো ১৫-২০ মিনিট পর ট্যাক্সি থেকে প্রবীরদাকে ফোন করতেই তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন, এত রাত্রে খাবার পাবি না তো। দাঁড়া আমি খাবার নিয়ে আসছি। অভিজিৎ ও অনিমার অনেক চেষ্টায় প্রবীরদা হোটেল থেকে খাবার আনা থেকে বিরত হয়েছিলেন। তবে শর্ত দিয়েছিলেন, যেন খাবার নিয়ে তাঁর বাড়িতে দেখা করে যাই। অবশেষে প্রায় ১১টা ৪৫ নাগাদ আমরা রুটি তড়কা নিয়ে প্রবীরদার সঙ্গে দেখা করার পর তিনি ঘুমোতে গিয়েছিলেন। সন্দেহ করেছিলেন হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে আর আমরা সমস্ত রাত্রি না খেয়ে কাটাব। তাই প্রচণ্ড শরীর খারাপ নিয়ে ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করে ১১টা ৪৫ পর্যন্ত জেগে ছিলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যাঁর টেনশন হয় না, সমিতির সদস্যদের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড চিন্তা হয়। সমিতির সদস্যদের প্রতি অগাধ স্নেহ ও ভালবাসাই প্রবীরদাকে চিন্তিত করে।

দ্বিতীয় ঘটনা আগস্ট ২০১২-র। এমনিতে ছোটখাটো অসুখের জন্য আমার ডাক্তার ছিলেন প্রবীরদা। সর্দি-জ্বর, মাথাব্যথা, অ্যাসিডিটি এসবের জন্য প্রবীরদার কাছেই পরামর্শ নিতাম। অবশ্য শুধু আমি কেন আরো অনেকেই ওষুধের জন্য প্রবীরদার পরামর্শ নিত। যাই হোক সেবার বেশ বড় জ্বরে পড়েছিলাম। ডেঙ্গু।

বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তারের নির্দেশমতো রক্ত পরীক্ষা করিয়ে বাড়ি চলে গেলাম। অবশ্য প্রবীরদা বলেছিলেন কোনও নার্সিংহোম বা হাসপাতালে অ্যাডমিশন নিতে, কিন্তু আমি তা করিনি। একদিন পরেই বিপ্লবদা ফোন করে বলল বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তার দেখাতে। সব ব্যবস্থা বিপ্লবদা করে রাখছে আর আমি না গেলে বাবাকে বলে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবে। যাই হোক, বাঁকুড়ার ডাক্তারও বলেছিলেন বাড়িতে বিশ্রাম নিতে, আর কলকাতার ডাক্তারের ওষুধ খাওয়া চালিয়ে যেতে। সেদিন রাত্রে প্রবীরদাকে ফোন করে বিপ্লবদার বেয়াদপির কথা শুনিয়েছিলাম। প্রবীরদা কোনও উত্তর দেননি, শুধু হুঁ-না করে ফোন রেখে দিয়েছিলেন। সুস্থ হবার পর জেনেছিলাম আসলে বিপ্লবদাকে প্রবীরদাই পাঠিয়েছিলেন। ডেঙ্গু বেশ ভয়াবহ তাই বিপ্লবদাকে দিয়ে আমার শরীরের প্রকৃত অবস্থাটা যাচাই করে নিয়েছিলেন। আসলে যুক্তিবাদী সমিতিকে কেন্দ্র করে প্রবীরদা ও আমরা একটা পরিবার হয়ে উঠেছি। আর প্রবীরদা আমাদের সুখ, দুঃখে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন।

যুক্তিবাদী সমিতির স্টাডি ক্লাস ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে আলোচনা, আড্ডার এক দারুণ জায়গা। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রাজনৈতিক ঘটনা, সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়গুলো ছাড়াও স্টাডি ক্লাসের আরেক আকর্ষণ ছিল কেস স্টাডি। যে সমস্ত কেস স্টাডির ঘটনা লিখেছেন তার চেয়েও ১০ গুণ বেশি অব্যক্ত ঘটনা বোধহয় প্রবীরদার ঝুলিতে আছে। আর সেই কেস স্টাডিগুলো দিয়েই প্রবীরদা আমাদের অ্যানালাইসিস করা, চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা ও সাইকোলজি শেখাতেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তির প্রকৃত নাম পরিচয় গোপন রাখতেন। কারণ তিনি বলতেন মানুষ দেখে তার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে নির্ভুল আন্দাজ করাটা শেখানোই কেস স্টাডির উদ্দেশ্য, গসিপ নয়। ভাল ফিল্ম বা নাটক বেরোলে, তার রিভিউও আমাদের স্টাডি ক্লাসের আলোচ্য বিষয় হিসেবে রাখা হত। অটোগ্রাফ, মনের মানুষ, থ্রি-ইডিয়টস, কাহানি ইত্যাদি কত কিছু নিয়ে আলোচনা হয়েছে স্টাডি ক্লাসে। আর এই সবের মধ্যেই আমার সিনেমা রিভিউ-এর হাতে-খড়ি হয়। বিশ্লেষণ রিভিউ শিখিয়েছিলেন প্রবীরদা। আগে পত্রপত্রিকায় সিনেমার রেটিং দেখে চেঁচাতাম, এটা দারুণ সিনেমা নইলে এত রেটিং পাবে কেন। এখন বুঝি রেটিং দেখে ভাল বা খারাপ ফিল্ম বিচার করাটা ঠিক নয়।

তবে অচেনা মানুষ দেখেই তার সম্পর্কে অনেক কথা বলার এক অদ্ভুত আর্ট প্রবীরদার মধ্যে আছে। একদিন স্টাডি ক্লাসের শেষে তার পরিচয় পাই। শনিবারের ক্লাস শেষ। আমি প্রবীরদা, সুমিত্রাদি ও সুমন চা খাচ্ছি ক্রিক রোতে। সুমিত্রাদি চা-ওয়ালাকে দেখামাত্রই বলে উঠলেন এই তুমি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী না? তুমি যেভাবে সোজা হয়ে বসে আছ তাতে মনে হচ্ছে বৌদ্ধ, তাছাড়া এখানে তো প্রচুর বৌদ্ধ রয়েছে।

লোকটি জানাল সে বৌদ্ধ। আমরা সুযোগ পেয়ে প্রবীরদাকে খোঁচা দিলাম,

ধুর কোথায় আপনি, সুমিত্রাদি আপনার থেকেও ভাল অ্যানালাইসিস করেন।

প্রবীরদা নিচু স্বরে উত্তর দিলেন, বড়ুয়ারা বৌদ্ধই হয়।

আমাদের পাল্টা প্রশ্ন, আপনি জানেন লোকটির পদবি বড়ুয়া? প্রবীরদা বললেন জানি না তবে মনে হচ্ছে। লোকটি জানাল তার পদবি বড়ুয়া।

তারপর প্রবীরদা এক নিশ্বাসে বলে চললেন, লোকটির বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে সম্ভবত চট্টগ্রামে। আর ওর পূর্বপুরুষরা জমিদার বা জমিদারের পদস্থ কর্মচারী ছিল। ওরা মারপিটে পটু। আশ্চর্যভাবে যখন প্রবীরদার সমস্ত কথাই মিলে গেল ছেলেটির স্বীকারোক্তিতে, তখন অবাক না হয়ে উপায় ছিল না। স্বীকার করে নিলাম আপনিই অ্যানালাইসিসের গুরু।

ক্লাসে আর একটা দারুণ জিনিস শিখেছিলাম, সম্মোহন। অনেক বার তিনি সম্মোহন করে দেখিয়েছেন, বুঝিয়ে দিয়েছেন। সম্মোহন নিয়ে তাঁর বিশাল জ্ঞান 'সম্মোহনের এ টু জেড' পড়লেই বোঝা যায়। তিনি যে সম্মোহনের মাস্টার তা এখন প্রায় সকলেই জানেন। তাতে আবার কেউ কেউ খুব অসুবিধায়ও পড়েন। সোনারপুর কনফারেন্স ২০১১, কয়েকজন বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান আমাদের অতিথি। অতিথিদের সামনেই প্রবীরদা সম্মোহন দেখাবেন তার পরেই অতিথিরা ম্যাজিক দেখিয়ে দর্শকদের আনন্দ দেবেন। উপস্থিত নামী ম্যাজিশিয়ানদের মধ্যে একজনকে এবং আরও ৪-৫ জন দর্শককে সম্মোহিত করলেন প্রবীরদা। সম্মোহিত অবস্থায় প্রত্যেকের দেহে সুচ ফোটানো হল। কেউই কিছু বুঝতে পারলেন না। ম্যাজিশিয়ান থেকে দর্শক সকলে অবাক। ব্যাস। সম্মোহন শেষ, এবার শুরু হবে ম্যাজিক। যে ম্যাজিশিয়ানদের সম্মোহিত করা হয়নি, তাদের মধ্যে একজন ম্যাজিক দেখাতে স্টেজে আসলেন। তাঁর দেশব্যাপী নাম আছে। জাতীয় টিভি স্টার। কিন্তু তার প্রথম ম্যাজিকটাই ভেস্তে গেল। তিনি ভাবলেন বন্ধুর সঙ্গে প্রবীরদা তাকেও সম্মোহিত করে ফেলেছেন, তাই তিনি তাসের রং ভুল দেখেছেন। ম্যাজিশিয়ানদের দেখানো সম্মোহন তো পুরোটাই অভিনয়, তাই সত্যিকারের সম্মোহন দেখে ম্যাজিশিয়ানটি ঘাবড়ে গেছিলেন। আবার অনেককে সম্মোহন করব বললে খুব ভয় পায়। ভাবে এই বুঝি আমার সমস্ত গোপন কথা সম্মোহিত অবস্থায় প্রবীরদা জেনে ফেলবেন। না, রোগ সারানো ছাড়া অন্য কোনও কাজে প্রবীরদা কখনও কাউকে সম্মোহন করেননি। মার্জিত নীতিবোধই তাঁর সবথেকে বড় শৃঙ্খলা।

নীতিবোধ আর নিরপেক্ষতা প্রকট হয়েও উঠত আরও এক জায়গায়। আমাদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'আমরা যুক্তিবাদী'-তে লেখা চয়নের ব্যাপারে। কেউ কেউ অনুরোধ করত—'এটা আমার বন্ধুর আত্মীয়ের লেখা' বলে, কেউ বা নিজের লেখা ছাপাবার জন্য অনুরোধ করত। না, কোনও রকম পক্ষপাতিত্ব তিনি করতেন না, ম্যাগাজিনের জন্য সংগৃহীত প্রতিটি লেখা স্টাডি ক্লাসে পড়া হত। ক্লাসে

উপস্থিত সবাই সম্মতি দিলে তবেই লেখাটা ম্যাগাজিনে ছাপতে যেত। এই নিয়মের সময়ও বন্ধুত্ব, ভালবাসাকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। এতে অবশ্য কোনও কোনও সদস্য অসন্তুষ্ট হত বা প্রবীরদাকে নিষ্ঠুর বলত। প্রবীরদা কিন্তু ওসব কথা গায়ে মাখতেন না। বলতেন করুণা দেখিয়ে খোঁড়াদের নিয়ে যেমন ভাল ফুটবল টিম বানানো যায় না, তেমনই লোক চয়নে পক্ষপাতিত্ব করলে আর যাই হোক পত্রিকার গুণমান ঠিক থাকে না।

ম্যানেজমেন্টের ম্যাজিক জানতেন প্রবীরদা। ১ মার্চ ২০১০, যুক্তিবাদী সমিতি ২৫ বছরে পা দিয়েছে। আর সেই উপলক্ষে ৬-৭ মার্চ কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে মৌলালি কেন্দ্রে। ৫ মার্চ বিকেলে আয়োজকরা জানাল, এবার কনফারেন্স বন্ধ করে দিতে হবে। ডেলিগেটদের মৌলালি যুবকেন্দ্রে রাখা যাবে না, কারণ জলের পাইপ ভেঙে গেছে। জল আসছে না। সকলের মাথায় হাত, কী হবে! প্রবীরদা বললেন, আমি ম্যাজিক জানি। সব ঠিক হয়ে যাবে। পরে জেনেছিলাম, আমাদের কনফারেন্স বন্ধ করার জন্য এক বাম মন্ত্রীর নির্দেশে মৌলালি যুবকেন্দ্রে জলের পাইপ ভেঙে ফেলা হয়েছিল। যাই হোক, ৬ মার্চ প্রবীরদার ম্যাজিক কাজ করেছিল। আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল এক দারুণ জায়গায়, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। তবে কীভাবে তিনি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ম্যানেজ করেছিলেন জানি না। জিজ্ঞেসও করিনি। অহেতুক কৌতূহল যুক্তিবাদীদের কাম্য নয় যে।

আরও একটা ঘটনা মনে পড়ল। তবে তা বেশ দুঃখজনক। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমিতির স্টাডি ক্লাস হত অরুণদার বাড়িতে। চাকরি জীবন থেকেই প্রবীরদা ও অরুণদা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অরুণদার যে কোনও সাহায্যে প্রবীরদা এগিয়ে আসেন আর অরুণদা শনিবারের ক্লাস জমিয়ে রাখেন। দারুণ চলছিল হঠাৎ একদিন অরুণদা প্রবীরদাকে জানালেন—আমি নতুন ফ্ল্যাট কিনছি, এই বাড়িটা অর্ধেক আমি সমিতিকে দিয়ে যাবো। কাগজপত্র সব ঠিক করার দায়িত্ব তোমার।

এর কয়েকমাসের মধ্যেই অরুণদার দেহান্ত ঘটল। সেদিন বোধহয় এই কয়েক বছরের মধ্যে প্রবীরদাকে সব থেকে বেশি শোকাহত মনে হল। অরুণদা মারা যাওয়ার ৪-৫ দিন পরেও প্রবীরদা আমাকে বলেছেন, এই ক'দিন একটা লাইনও লিখিনি রে। শুধু অরুণদার কথা মনে পড়ছে।

দুঃখের অন্ত এখানেই হয়নি। আরও ১৫-২০ দিন পর অরুণদার বোন জানিয়ে দেন স্টাডি ক্লাস বন্ধ করতে হবে। অরুণদার বাড়িতে আর বসা চলবে না। হতাশ হয়ে আমরা উঠে গেলাম।

প্রবীরদা কিন্তু হতাশ হননি, কয়েকমাস সময় লেগেছিল মাত্র। প্রবীরদার চেষ্টায়

কলকাতার দর্জিপাড়ায় আমাদের সদস্য শঙ্করদার বাড়িতে একটা ঘর ঠিক ম্যানেজ হয়ে গিয়েছিল। দারুণ। নতুন জায়গায় আবার পুরনো বন্ধুদের নিয়ে স্টাডি ক্লাস।

যুক্তিবাদী সমিতিতে এসে কিছু ঘটনা প্রবীরদার সঙ্গে সকলেরই ঘটতে পারে। আগে থেকে জানা থাকলে সদস্যদের কাজে লাগতে পারে।

১ম : যুক্তিবাদী সমিতিতে এসে আপনি প্রবীরদার রাগ বা অভিমানের প্রকোপে পড়বেনই, সবাই পড়ে। যদি না পড়েন তাহলে বুঝবেন প্রবীরদার ঘনিষ্ঠ হতে পারেননি। তবে ফোন করে আপনাকে বকাবকি করবেন বুঝলে ফোন রিসিভ করবেন না বা কল ব্যাক করবেন না। ৩-৪ দিন কথা বন্ধ করার পর একদিন স্টাডি ক্লাসে এসে দেখা করে যান। আপনার সঙ্গে দেখা হলেই প্রবীরদার রাগ গলে জল। কিন্তু কখনও বাজে অজুহাত দেবেন না। প্রবীরদার মাথায় লাই ডিটেকটর লাগানো আছে।

২য় : একটু সাহস নিয়ে প্রবীরদার সঙ্গে দুষ্টুমি করুন। আমি ও সুমন একবার স্টাডি ক্লাস শেষে প্রবীরদার বাড়ি গেলাম, দরকার ছিল। গিয়ে দেখি প্রবীরদার ঘরে রাখা নতুন একটা দামি মোবাইল, আবার পাশের ঘরে নতুন LED টিভি। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার বলুন তো—দামি নতুন টিভি, দামি মোবাইল। প্রবীরদা বললেন, এই কিনলাম, ভাল হয়েছে কি না বল। সুমনের দুষ্টুবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং বলল নতুন টিভি, মোবাইল কিনেছেন আজ বিরিয়ানি খাওয়াতে হবে। উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। আসলে দুষ্টুমি করলে প্রবীরদা রাগারাগি করেন না বরং প্রশ্রয় দেন।

৩য় : ভুল করেও প্রবীরদার বিরুদ্ধে বাজি ধরবেন না। ১০০ শতাংশ নিশ্চিত না হলে প্রবীরদা বাজি ধরেন না। ক্রিস গেইল গোটা IPL-এ একটাও ছয় মারতে পারবে না—এই বাজিও আপনি জিতে যেতে পারেন তবে প্রবীরদার বিরুদ্ধে বাজি জেতা কখনও সম্ভব নয়।

একটা মজাদার ঘটনা। ঘটনাটা বলেছিল জয়দীপদা। আর ঘটনাটাকে মজাদার করেছিল জয়দীপদা নিজেই। আমাদের স্টাডি ক্লাসে তখন এক WBCS অফিসার আসতেন। প্রবুদ্ধ বাগচী। তিনি ইমেল করে সুমিত্রাদিকে জানান, 'রাজনীতির ম্যানেজমেন্ট' বইয়ে প্রবীরদা ভুল লিখেছেন। মন্ত্রীরা পাবলিক সারভেন্ট কথাটি ভুল, তারা ইলেক্টেড মেম্বার।

প্রবীরদা বলেন, আপনি বাজি ধরবেন, মন্ত্রীরা পাবলিক সারভেন্টই। আমি পক্ষে আপনি বিপক্ষে।

প্রবুদ্ধ বাগচী রাজি হয়ে যান। বোধহয় প্রবীরদাকে কুপোকাত করার এমন সুযোগ ছাড়তে চাননি। প্রবীরদা বলেন, প্রবুদ্ধ আপনি আপনার বক্তব্যটা লিখে

দিন যুক্তিবাদী পত্রিকার সম্পাদকের কাছে, পত্রিকাতে ছাপব, ওখানে উত্তরও দিয়ে দেব। আমি যদি ভুল করে থাকি তবে আপনার বক্তব্যের তলায় আমার ভুল স্বীকারোক্তি থাকবে।

ম্যাগাজিন বেরোতেই জয়দীপদা গেছে প্রবুদ্ধ বাগচীকে ম্যাগাজিনের সৌজন্য সংখ্যা দিতে। যুক্তিবাদী ২০০৯ বইমেলা সংখ্যা। প্রবুদ্ধ বাগচী খুব উৎসাহিতভাবে ম্যাগাজিনটা হাতে নিতেই জয়দীপদা তাঁকে বলে—পরের পৃষ্ঠায় অবশ্য প্রবীরদার উত্তরও বেরিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের কেসের একটা কপি তুলে দিয়েছেন। তাতে উল্লেখ আছে, প্রতিটি ইলেক্টেড মেম্বারই পাবলিক সারভেন্ট। বাগচীবাবু আপনার বোধহয় প্রবীরদার চ্যালেঞ্জ না নেওয়াই উচিত ছিল।

যাইহোক জয়দীপদা এতটা দুষ্টুমি না করলেও পারতো, তবে এই ঘটনাটা রটে যাওয়ার পর থেকে প্রবীরদার বিরুদ্ধে কেউ বাজি ধরার সাহস পান না।

৪র্থ : প্রবীরদা নিজেকে নিয়ে ভীষণ ভাল মজা করতে পারেন। ওনার সব কথা বিশ্বাস করলেই ঠকবেন। তবে প্রবীরদার সঙ্গে ২-৪ দিন থাকলেই সত্যি আর সূক্ষ্ম জোকের পার্থক্য বোঝা যায়। তবে সত্যিই যদি প্রবীরদার সরল সাহিত্যচর্চার অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পেতে চান—অনুরোধ, 'শরৎচন্দ্রের মজলিসি গল্প' বইটা একবার অন্তত পড়ুন।

প্রবীরদা সমস্ত সদস্যদের সঙ্গে মজা করতেন, সকলকে হাসিখুশি রাখতেন। তবে প্রবীরদাকে ঠকানো বোধহয় সোজা। তিনি কত সদস্যদের কাছে ঠকেছেন গুনে বলা মুশকিল। দীর্ঘদিন ধরেই বহু লোক স্বার্থের জন্য সমিতিতে, প্রবীরদার কাছে এসেছে। কিছু দিনের জন্য প্রবীরদা ও সমিতিকে ভালবাসার অভিনয় করেছে। তারপর প্রবীরদার কাছ থেকে চাকরি, ক্ষমতা, আইনি সাহায্য নিয়েছে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র কেটে পড়েছে। বারবার একই ভুল কেন করেন বুঝি না। প্রবীরদা বলেন, ভালবাসার মানুষরা, বন্ধুদের কেউ কেউ ঠকিয়ে যায়। কিন্তু আবার অন্য বন্ধু পেলে ঠিক বোকা হয়ে যাই। আসলে উনি এই রকমই। মানবতাবাদীরা একটু বোকাই হয়। অনেক মানুষকে ভালবাসলে কিছু মানুষের কাছে তো ঠকতেই হয়।

---

9 788129 523242